নানাকথা.....

নানা কথা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

রথযাত্রা

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
পাঁচ টাকা

● নানা কথা প্রকাশ করার কারণ

গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন মনে-প্রাণে সাহিত্যিক-কবি। তাই কলকাতার ঝামেলা এড়িয়ে বছরের বেশির ভাগ সময় তিনি থাকতেন জসিডিতে।

যেখানে তিনি থাকতেন সেই বাড়ির সামনে দিয়ে সুদূরপ্রসারী ছিল রাজপথ। তার পেছনে জঙ্গলে ঘেরা এক পাহাড় দেখা যেতো।

বাড়ির পূর্বদিকেও দূরে একটা পাহাড় ধোঁয়ার মত চোখে পড়তো।

সকাল বেলায় ফটকের সামনে রাজপথের পাশে বাঁধানো বসবার জায়গায় বসে তিনি স্বপ্নালু চোখে চেয়ে থাকতেন প্রকৃতির দিকে।

কোন্ সাহিত্যের উপাদান তিনি সেখান থেকে সংগ্রহ করতেন তা তিনিই বলতে পারতেন।

একবার সেই জায়গায় বসে আমার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—নব কল্লোলের প্রবন্ধগুলি এবার প্রকাশ করার ইচ্ছা হয়েছে।

আমি প্রশ্ন করি—ওর নাম "নানা কথা" দিলেন কেন?

উত্তরে তিনি বললেন—নানা বিষয়ে আলোচনা করব বলেই ওর নাম রেখেছি "নানা কথা"। কার্টুন ছবি দিয়ে প্রকাশ করতে পারলে বড় ভাল হয়।

আমি বলি—বেশ, সে চেষ্টা করব।

তাঁর জীবিতকালে তাঁর এ ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি নি। আজ এক বছর পরে তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে।

তাঁর মনের শেষ ইচ্ছা যে আমরা পূর্ণ করতে পেরেছি সেজন্য আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

তাঁর এই অনন্যসাধারণ পুস্তকটি তুলে দিলাম জনসাধারণের হাতে।

ঊর্ধ্বলোকে তাঁর আত্মা যেন শান্তি পায়। ভগবানের চরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

প্রকাশক

সূচীপত্র

না না-ক থা

আড্ডা

ব্যাসের মহাভারতের একেবারে আরম্ভে আছে,—

"কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে মহর্ষিরা দৈনন্দিন কর্ম সমাধান করতঃ সকলে সমবেত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে সুখে" আড্ডা দিচ্ছিলেন···

এমন সময় সেই আড্ডায় ঋষি লোমহর্ষণের ছেলে সৌতি ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন এবং যা হয়ে থাকে, সৌতি আড্ডায় জমে গেলেন।

কোথা থেকে আসছেন, সেখানে কি দেখেছেন, কি শুনেছেন, এই সব জমিয়ে বলতে বলতে দেখা গেল, সৌতি যখন আড্ডা থেকে আবার বেরুলেন তখন অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত সবটাই গাওয়া হয়ে গিয়েছে।

এ থেকে স্পস্ট বোঝা যায়,—

(১) আড্ডার একটা সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে,

(২) মুনিঋষিরাও আড্ডা দিতেন,

(৩) এবং আড্ডা শুধু আলস্যের জায়গা নয়, সেখান থেকে মহাভারতও সৃষ্ট হ'তে পারে।

পুরাণের নজীর তুলতে হলো, কারণ, আজকের শিক্ষিত বাঙালী আড্ডা দিতে ভয় পায় এবং কালক্রমে আড্ডার সঙ্গে একটা বদনামও জুড়ে গিয়েছে। আজকের কলকাতার একটা বনেদী আড্ডার যিনি আড্ডাধারী-বিশেষ ছিলেন, সেই রাজশেখর বসু তাঁর অভিধানে আড্ডার মানে লিখতে গিয়ে লিখলেন, "কু-লোকের মিলন-স্থান!"

আমার বিশ্বাস, এই অভিধান যদি পরশুরাম লিখতেন, তিনি আড্ডার এই মানেটিকে কখনই এমনভাবে প্রকাশ করতেন না।

তার ওপর আজকের শিক্ষিত বাঙালী ছেলেরা মার্কস্ লিখিত উপনিষদ্ "কোট্" করে বলেন, আড্ডা হলো ফিউড্যাল যুগের অলস বড়লোকদের সময় ধ্বংস করবার একটা বিকৃত প্রতিষ্ঠান, আজকের কর্মমুখর ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগের প্রোগ্রেসিভ সমাজে তার স্থান নেই।

সেইজন্যে আজকের শিক্ষিত সমাজ আড্ডাকে হুঁকো-কলকে সমেত ঘর থেকে বার করে রাস্তার ধারে 'রকে' ফেলে দিয়েছে।

...ঠিক এমনিভাবে একসময় মার্গ-সংগীত আর নাচকে তাঁরা ঘুঙুর-তবলা সমেত ঘর থেকে বার করে বাঈজীপাড়ার রাতের অন্ধকারে ফেলে দিয়েছিলেন...বাঈজীরা সযত্নে সেই সম্পদ্‌কে তাঁদের কণ্ঠে ও দেহে ধরে রেখেছিলেন বলে আজ আবার রাস্তায় খবরের কাগজ পেতে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা সেই মার্গ-সংগীতের আর নাচের ধ্বনি-তরঙ্গ শুনছেন !...

কিন্তু "রক" থেকে আড্ডাকে উদ্ধার করে আবার ঘরে তোলা বোধহয় সম্ভব হবে না।

আড্ডার যেটুকু প্রাণরস এখনও অবশিষ্ট আছে, 'রকের' সিমেণ্টে তা শুকিয়ে মরে যাবে...হয়তো ইতিমধ্যেই তা শুকিয়ে মরে গিয়েছে ...আমি এসেছি তার ধূমায়মান চিতাশয্যার পাশে আমার বহুদিনের বহু ঋণের শেষ কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে।

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর !

অথচ সারা জগৎ জুড়ে বাঙালীর একটা প্রচণ্ড খ্যাতি—আমরা পৃথিবীর সেরা আড্ডাবাজ জাত। আড্ডার মতন সর্ব প্রয়োজন অতীত এমন প্রতিষ্ঠান আর কোন জাত গড়ে তুলতে পারেনি। আড্ডা দেওয়া একটা আদিম ও অনাদি জীবধর্ম, বাঙালীর মতন এ সত্যকে কেউ আর জীবনে স্বীকার করতে পারেনি।

বিশ্ববিখ্যাত শিল্প-কলারসিক শাহেদ সুরাবর্দী যখন জার্মানিতে ছিলেন, তখন একদিন তাঁর কয়েকজন রুশ ও জার্মান বান্ধবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের বাঙালীর বৈশিষ্ট্য কি ?

শাহেদ দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, মাদাম, যা আর কারও নেই, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য হলো তাই, আড্ডা !

দিলীপকুমারের লেখায় এই কাহিনীটি পড়ে শাহেদ সাহেবের অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।

আজকের শিক্ষিত বাঙালী এই সহজ সত্যটি স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করবেন, তার কারণ, আড্ডা দিতে আমরা আজ ভুলে গিয়েছি। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের যে অধঃপতন ঘটছে, এ থেকে তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে।

বাঙালী তার জাতীয় চরিত্রের ছাঁচ বদলাচ্ছে। ছাঁচ-বদলানো আশঙ্কার কথা।

আজকের যান্ত্রিক সভ্যতা প্রত্যেক মানুষকে গড়পড়তা এক ছাঁচে গড়ে তুলতে চাইছে। জাতীয় বৈচিত্র্য হারিয়ে এই গড়পড়তা এক ছাঁচের বিশ্বনাগরিক হওয়া সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রেত নয়।

বুদ্ধিমান জাত তাই সহজে ছাঁচ বদলায় না। যেমন ইংরেজ। সব ত্রুটি সত্ত্বেও তাই জগতের সেরা জাত।

বাঙালী নির্বুদ্ধির মত দ্রুত তার জাতীয় চরিত্রের ছাঁচ বদলে চলেছে।

বাঙালীর চণ্ডীমণ্ডপ খালি। সে জায়গায় দোকানঘর করা হয়েছে, ভাড়া পাওয়া যায়। বাঙালী তাঁবু খাটিয়ে সার্বজনীন পুজো করছে। রেডিওতে টেপ-রেকর্ডে চণ্ডীপাঠ শুনছে।

বাঙালীর আড্ডার বৈঠক খালি।

কিন্তু বাঙলার জল-হাওয়ার সঙ্গে আড্ডার এমন আত্মিক যোগ যে, একজায়গা থেকে স্থানচ্যুত হয়ে সে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে,—করপোরেশনে, অফিসে, রাষ্ট্রসভায়, রকে, চায়ের দোকানে, খেলার

তাঁবুতে, রাজনৈতিক দলের প্রত্যেক জেলা-সমিতিতে, স্কুলে, কলেজে —সর্বত্র সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা ছদ্মবেশে আড্ডাই বিরাজ করছে!

কলকাতা শহরের আড্ডার ইতিহাস কোনদিন লেখা হবে কি না তা জানি না,—

যদি হতো, তাহলে এই বাঙালী জাতের মনের আসল চেহারার অনেক খবর পাওয়া যেতো, এই বিচিত্র জাতের মনস্তত্ত্বের অনেক দামী খবর পাওয়া যেতো, বাঙালীকে বোঝা অনেক সহজ হতো।

জনসনের বিখ্যাত আড্ডার ইতিহাসের সঙ্গে সে-যুগের ইংলণ্ডের কালচার ও বিদগ্ধতার কাহিনী জড়িয়ে আছে। বাঙলাদেশেও এই-রকম কয়েকটি আড্ডা ছিল যাদের আবহাওয়া থেকে বাঙলা কালচারের মৌসুমী হাওয়ার খবরাখবর মিলতো।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতা শহরে এইরকম অনেকগুলি জমাট আড্ডা ছিল এবং এইসব আড্ডায় সেই সময়কার বাঙলাদেশের বহু জ্ঞানী-গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়মিত আড্ডাবাজ ছিলেন। বাইরে সারাদিন এইসব গুরুগম্ভীর বিশিষ্ট লোকেরা যে যাঁর কাজের মুখোশ পরে যে চেহারায় ঘুরে বেড়াতেন, যখন আড্ডায় ঢুকতেন তখন মুখোশ বাড়িতে রেখে আসতেন; আড্ডায় তাঁদের দিকে চাইলে তাঁদের সত্যিকারের মুখ দেখা যেতো; তখন সে-মুখ দিয়ে যা বেরুতো তার আলাদা স্বাদ, আলাদা দাম। আড্ডায় না দেখলে, মানুষের সবটা দেখা যায় না। বাইরে যে রায়বাহাদুর, আড্ডায় সে উপাধিহীন; বাইরে যাকে দেখলে ভয় করে, আড্ডায় তাকে দেখলে হাসি পায়; বাইরে যে কর্তা বা কর্মচারী, আড্ডায় সে শুধু সহজ মানুষ।

আড্ডা খুঁজে বার করা খুব কঠিন; কারণ, বাইরে তার কোন নিশানা নেই। ক্লাবের একটা নাম আছে, ঠিকানা আছে, টেলিফোন

আছে ; আড্ডার কোন নাম-ঠিকানা নেই। তার কারণ, আড্ডা কেউ তৈরি করে না, আড্ডা আপনা থেকে গড়ে ওঠে। ক্লাব কাউকে গড়তে হয়, তার একটা উদ্দেশ্য দরকার হয় ; আড্ডা প্রাণের তাগিদে আপনি গড়ে ওঠে, তার কোন উদ্দেশ্য নেই, সে সকল উদ্দেশ্যের অতীত, প্রাণারাম !

বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায় এটা মানসী মাসিক পত্রিকার অফিস, দরজার ওপর পুরোনো একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে, ভেতর থেকে ছাপাখানার শব্দ আসছে, প্রেসের কালিমাখা একটা ছেলে একঝুড়ি পরিত্যক্ত ছেড়া ময়লা প্রুফের কাগজ সামনে রাস্তার ধারে ফেলে গেল···কিন্তু এই পুরোনো রঙ-চটা বাড়ির ভেতরেই বসেছে জোর আড্ডা, সেই সময়কার বাঙলার একটা সেরা আড্ডা, আড্ডাধারী স্বয়ং নাটোরের মহারাজা জগদানন্দ রায়···এবং যদি কোনরকমে আড্ডাঘরে যেতে পারেন আর দুটি বিরাটদেহ গম্ভীরমূর্তি দেখতে পাবেনই, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এই আড্ডার দুই মৌতাত-জোগানদার। প্রত্যেক আড্ডার যেমন একজন কেন্দ্রপুরুষ থাকে, যাকে বলে আড্ডাধারী, তেমনি প্রত্যেক আড্ডার দু'একজন প্রধান মৌতাত-জোগানদার থাকে, এই জোগানদার না এলে আড্ডা জমে না।

ঐতিহাসিক গবেষকের রীতিমত পাথুরে গাম্ভীর্যের আড়ালে কি দুরন্ত প্রাণ-উচ্ছলতা আর সরসতা রাখালদাসের ছিল, তা এই আড্ডায় তাঁকে না দেখলে বোঝা যেতো না। মহারাজ-কবির সঙ্গে তাঁর কবির লড়াই হতো, এ কবির লড়াই-এ বোঝা যেতো বাঙলার মেঠো ভাষার কি ভীষণ ধার। সাধারণতঃ বাইরে লোক-সমাজে প্রভাত-কুমার একান্ত স্বল্পভাষী ছিলেন, এবং কোন আলোচনায় তাঁকে সহজে আকৃষ্ট করা যেতো না, কিন্তু এই আড্ডায় তাঁর মনের বাঁধন খুলে যেতো। রবীন্দ্রনাথের যেমন একটা নিজস্ব বাচনভঙ্গী ছিল, তাঁর কথা বলার যেমন একটা আলাদা ছন্দ ও সুর ছিল, প্রভাতকুমারের

কথাবার্তাতেও তেমনি একটা স্বতন্ত্র মধুর ভঙ্গী ছিল, খুব আস্তে মিষ্টি করে তিনি কথা বলতেন, এবং কখনো তার ছন্দ ভাঙতো না। অথচ সেটা কৃত্রিম বলে মনে হতো না। কথা বলাও যে একটা আর্ট, তা তাঁর কথা শুনলে বোঝা যেতো। এই আড্ডার একটা দ্বিতীয় অধিবেশন বসতো, নাটোর-প্রাসাদে···সে অধিবেশন থেকে আড্ডাধারীরা যখন ফিরতেন তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শহর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যেতো···

এই রকম সেই সময়কার গুটিকতক বিশেষ আড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হবার সুযোগ আমার ঘটে। আজ সে-সব আড্ডার চিহ্নমাত্র নেই···আড্ডাধারীরাও সব চলে গিয়েছেন···বাঙলা দেশ থেকে সে মনও হয়ত মরে গিয়েছে···

কলেজ স্কোয়ারের ঠিক পেছন দিকে, মস্ত বড় একটা বই-এর দোকান, বুক-কোম্পানি।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি এই ধরনের দু'চারটি নতুন বই-এর দোকানের পত্তন হয়···কলকাতা শহরের সেই সময়কার কালচারের বিস্তারে এই বই-এর দোকান-গুলো বিশেষ সাহায্য করে···ইওরোপ আর আমেরিকার তাজা তাজা কাব্য-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই এরা আনতে শুরু করে ···এদের এই উদ্যমের জন্যেই সে সময়কার তরুণেরা, সাহিত্যিকেরা বিশ্ব-সাহিত্য ও বিশ্ব-চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। কলকাতা শহরের পড়ুয়াদের মধ্যে পড়বার একটা নেশা জেগে ওঠে এই সময়। আজ বুক-কোম্পানির কি অবস্থা জানি না, কিন্তু সেদিন এই বই-বেচার দোকান হয়ে ওঠে বই-পাগলাদের বৈঠকখানা।···

সামনেই পালিশ-করা ঝকঝকে কাঠের বিরাট কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক···কাঁধে ময়লা একটা ছোট তোয়ালে ···ট্যাক থেকে নস্যির ডিবে বার করে ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছেন,···

আর খরিদ্দারদের সঙ্গে কথা বলছেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আছে দোকানের দরজার বাইরে রাস্তার ওপর···হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, এই হাঁদা প্রফেসার!

সামনের খরিদ্দার চমকে ওঠেন, কারণ তিনিও প্রফেসার!

অবাক্ হয়ে সেই বিচিত্র দোকানদারের দিকে চেয়ে তিনি বলেন, কি বলছেন গিরীনবাবু?

নাকে আর এক টিপ নস্যি গুঁজে গিরীনদা তেমনি চেঁচিয়ে বলেন, আপনাকে বলিনি স্যার, আপনি কেন অমন করে চাইছেন··· এই যে ইনি···প্রফেসার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়···রাস্তা দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে পালাচ্ছিলেন!

ততক্ষণ ধূর্জটিপ্রসাদ কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন!

তোয়ালে দিয়ে গায়ের ওপর ছড়িয়ে-পড়া নস্যির গুঁড়ো মুছতে মুছতে গিরীনদা বলেন, যাও একবার ভেতরে যাও···নাড়ু খুঁজছিল!

সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে ডেকে তেমনি চিৎকার করে আদেশ দেন, প্রফেসার এসেছে রে! চা দে!

কাউন্টারের দরজা খুলে হাসিমুখে প্রফেসার ঢোকেন···বই-এর আলমারির অলি-গলি পেরিয়ে 'ভেতরে'র দিকে অগ্রসর হন···

এই 'ভেতরে' রোজ বসে একটা ছোটোখাটো আড্ডা···কলকাতা শহরের বাছাই-করা বই-পাগলাদের আড্ডা···

পেছনদিকে বই-এর গুদাম ঘর···চারদিকে নতুন সব বই আর সদ্য জাহাজ থেকে নামানো বিরাট সব বই-এর কাঠের বাক্স ···মেঝেতে ছড়ানো বই-বাঁধা মোটা মোটা সব কাগজ···বসবার আসন···ঘরেতে নতুন বই-এর বিচিত্র গন্ধ···

নাড়ুবাবু একটা সদ্য-আসা কাঠের বাক্সের ডালা খুলছেন··· দুজন আড্ডাধারী সতৃষ্ণ নয়নে সেই কাঠের বাক্সের দিকে চেয়ে, সুরা-রসিক যেমন চেয়ে থাকে শ্যামপেনের বোতল খোলার দিকে···

দুজন আড্ডাধারীর মধ্যে একজনের বয়স খুব অল্প···বোধহয়

কলেজের ছাত্র···আধময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে পুরোনো একজোড়া স্লিপার···উসকোখুসকো এক মাথা চুল···দ্বিতীয় জন মধ্যবয়সী, পা থেকে মাথা পর্যন্ত অভিজাত, বকের পালকের মতন সাদা নিখুঁত বাঙালী পোশাক, হাতের দু' আঙুলে সোনায়-বাঁধা একটা সরু সিগারেটের পাইপ, সিগারেট নেই, অভ্যাসবশতঃ পাইপটা ধরে আছেন, আঙুলের দিকে চাইলে দেখা যায়, আঙুল দুটো কাঁপছে···প্রমথ চৌধুরী!

তরুণের দিকে চেয়ে বলেন, বুয়েছ (বুঝেছ), এই যে নতুন কবিতা এখন ইংলণ্ড আর ফ্রান্সে লেখা হচ্ছে···ওর ওই এলোমেলো ছন্দ-হীনতার আড়ালে আছে একটা মস্ত বড় ট্রাজেডি···মহাযুদ্ধ এসে ওদের দেশের তরুণদের মনে পুরোনো জগতের সব বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গিয়েছে···অস্থির মন খুঁজছে নতুন আশ্রয়···বইটা যদি এ মেলে এসে থাকে তোমাকে দেখাচ্ছি···এই যে ধূর্জটি, এসো এসো!

প্রবেশ করলেন অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়!

সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য চায়ের কেটলি আর কাপ নিয়ে এলো।

বই-এর দোকানের আড়ালে বিচিত্র এক আড্ডা···এবং অন্য সব আড্ডার মতনই এই আড্ডা বেঁচে ছিল আড্ডাধারীর জন্যে।

কলকাতা শহরে যাঁরা নিয়মিত পড়াশোনা করতেন, এখানে এলেই তাঁদের দেখতে পাওয়া যেতো···এবং সারাদিন তাঁরা যেখানেই ঘুরুন না কেন, একবার দিনান্তে এখানে তাঁদের আসতেই হতো, নেশার খোরাকের জন্যে! বইতে যাঁর নেশা ধরেনি, এ আড্ডায় তাঁর জায়গা ছিল না। প্রত্যেক আড্ডাধারীর মতন নাড়ু-বাবু প্রত্যেক আড্ডাবাজের মনের চাহিদার খবর রাখতেন, কে কোন্ জাতীয় বই খুঁজছেন, রাত জেগে বিলিতী ক্যাটালগ ঘেঁটে ঘেঁটে সেই সব বই-এর পাত্তা বার করতেন, নতুন কোন বই-এর খবর পেলে আড্ডায় জানাতেন, প্রার্থিত বইটি নেশাখোরের হাতে

যখন তুলে দিতেন আনন্দে তাঁর মুখ ভরে উঠতো, যেন বহুবাঞ্ছিত প্রিয়-সম্মেলন ঘটিয়ে দিলেন। নাদুবাবুর অকালমৃত্যুতে এই বই-এর দোকানের আড্ডা ভেঙে যায়। শূন্য আড্ডার বেদনা আড্ডাবাজ ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

এই বুক-কোম্পানির ভেতর আর একটি আড্ডা ছিল, দোকানের পেছনে গিরীনদার ছোট্ট ঘরে…এই আড্ডার কেন্দ্রপুরুষ ছিলেন মালিক স্বয়ং গিরীনদা এবং এই আড্ডায় একটি মুখকে প্রায়ই দেখা যেতো, সে-মুখ হলো আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদারের। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সংগ্রামের দিন, বড় দুর্দিন। সে দুর্দিনের কাহিনী লেখা থাকতো সুরেশচন্দ্রের চোখে, মুখে, পোশাকে, ভাঙা গলায়। এই আড্ডার এক কাপ চা সুরেশচন্দ্রের অনেক দিনের অনেক ক্লান্তি দূর করেছে।

সেই সময়কার বই-এর দোকানের মধ্যে আর একটি বই-এর দোকানে জোর আড্ডা বসতো, সে হলো এম, সি, সরকারের বই-এর দোকান। এই আড্ডার আড্ডাধারী ছিলেন দোকানের মালিক সুধীরচন্দ্র সরকার এবং আড্ডাবাজেরা ছিলেন অধিকাংশই সাহিত্যিক ও শিল্পী। তাঁরা অনেকেই 'ভারতী'র মূল আড্ডার লোক। 'ভারতী'র আড্ডা থেকে মুখ বদলাতে তারা এখানে আসতেন। এই আড্ডার প্রধান আকর্ষণ ছিল আড্ডাধারী সুধীরচন্দ্রের অনাড়ম্বর অথচ সুগভীর বন্ধুপ্রীতি ও সহজ অনায়িকতা। সুখের বিষয়, সুধীরচন্দ্রকে কেন্দ্র করে এখনো একটা ছোটখাটো আড্ডা আছে, সে আড্ডায় এখনো 'প্রবাসী' সম্পাদক কেদার চট্টোপাধ্যায়কে নিয়মিত দেখা যায়।

বাঙলাদেশে আঙুলে গোনা যায় এমন গুটিকতক লোক আছেন যাঁরা একসঙ্গে পণ্ডিত ও রসিক। তাঁদের বিশেষত্ব হলো, তাঁরা একান্তভাবেই আড়ালের লোক। বাইরে মানুষের ভিড়ে তাঁদের কোথাও দেখা যায় না। সুধীরচন্দ্রের আড্ডা এই রকম একটি

অপূর্ব পণ্ডিত ও রসিক লোককে আকর্ষণ করে, তাঁর নাম হিতেন বোস, বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক নীতিন বোসের দাদা। এ জাতীয় লোক ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে আসছে দেশে। একজাতীয় ফুল আছে রাত্রির অন্ধকার নইলে যাদের সৌরভ বেরোয় না; তেমনি এক-জাতীয় রসিক আছেন আড্ডার স্বতন্ত্র আবহাওয়া ছাড়া যাঁদের প্রতিভা খোলে না. তাঁরা কুলীন আড্ডাবাজ। তাঁরা লেখেন না, বক্তৃতা দেন না, মাস্টারি বা অধ্যাপনা করেন না, তাঁরা পারেন জমাট আড্ডা দিতে। হিতেন বোস হলেন সেই কুলীন আড্ডাবাজ।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে শহরে আর একটি জমাট আড্ডা ছিল, সে আড্ডার দৈনন্দিন কথাবার্তায় যদি কেউ করচা রাখতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে বাঙলা ভাষায় এক অপরূপ গ্রন্থের সৃষ্টি হতো, যে-গ্রন্থের ভেতর সমসাময়িক বাঙলার মনকে জ্যান্ত দেখা যেতো···সে আড্ডা বসতো থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের আড়ালে, সে থিয়েটার হলো শিশিরকুমারের নাট্যমন্দির এবং সে আড্ডার কেন্দ্রপুরুষ ছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার।

বাঙলাদেশের কালচারের ইতিহাসে এই আড্ডার ইতিহাস অলিখিতই থাকবে, কিন্তু এরকম একটা আড্ডার সন্ধান পেলে বিক্রমা-দিত্য চন্দ্রগুপ্ত নবরত্নের সভা ফেলে ছুটে আসতেন। তাঁর প্রতিভার জাগরণ-লগ্নে শিশিরকুমার যেভাবে বাঙলাদেশের সর্বশ্রেণীর কৃতী লোকদের আকর্ষণ করেছিলেন, ব্যক্তিত্বের ইতিহাসে সে এক বিস্ময়-কর ব্যাপার। তাঁর আড্ডায় অ-কৃতী কেউ ছিলেন না। এই আড্ডায় আসন পাওয়া সেদিন ছিল বেসরকারী জাতীয় সম্মান। এই আড্ডার আকর্ষণে দেখেছি, খ্যাতির দুর্লভ শিখর থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পাণিত্রাসের নির্জনবাস ফেলে ছুটে আসতে নাট্য-মন্দিরে; দেখেছি পাথুরে-মুখ ঝুনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের, বিচারক-দের, পুলিসের বড়কর্তাদের, বড় বড় ডাক্তারদের এই আড্ডার গহনে দু'দণ্ডের জন্যে অবগাহন করে বাঁচতে! রঙ্গমঞ্চে যাঁরা শিশির-

কুমারকে দেখেছেন, তাঁরা দেখেছেন অভিনেতা শিশিরকুমারকে; কিন্তু এই আড্ডায় যাঁরা দেখেছেন শিশিরকুমারকে, তাঁরা দেখেছেন বাঙলার এক বিস্ময়কর প্রতিভাকে। এই আড্ডার আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, আড্ডাধারীদের কাছে তিনি সুধাদা নামেই পরিচিত, বাঙলাদেশে এই রকম আর একটি মানুষ আর দেখিনি। শিশিরকুমারের আবৃত্তিতে বাঙলাদেশ মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু এই আড্ডার লোকেরা জানে, শিশিরকুমার নিজেও জানতেন, সুধাদার আবৃত্তি তারও ওপরে··· সুধাদার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ না শুনলে, রবীন্দ্রনাথকে বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যায়! আড্ডার আড়ালে একটা দুর্লভ চরিত্র আর বিস্ময়কর বিচিত্র ব্যক্তিত্ব পরিচয়হীন রয়ে গেল। শরৎচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সুধাদার চরিত্রকে সাহিত্যে রূপ দিতে, কিন্তু সে-আকাঙ্ক্ষা তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেল। আড়ালের মানুষ আড়ালেই রয়ে গেল···

সুন্দরী নারীর মতন প্রত্যেক আড্ডার একটা আলাদা স্বাদ থাকে, আলাদা গন্ধ থাকে, আলাদা আকর্ষণ ও আবেদন থাকে এবং যাঁর যেরকম মনের চাহিদা, তিনি সেই রকম আড্ডা খুঁজে নেন। এই আড্ডা খুঁজে-নেওয়া-এবং-পাওয়া রীতিমত একটা মিস্টিক (mystic) ব্যাপার; অনেকটা অন্তরের সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার মতন। খুঁজলে পাওয়া যায় না, যখন পাওয়া যায় তখন মনে হয় যেন এক অদৃশ্য মহাশক্তি জুগিয়ে দিল এবং প্রথম দর্শনে প্রেমের মতন একদিন সেই আড্ডায় গিয়ে বসলেই মন ভেতর থেকে বলে ওঠে, এই তো আমার আড্ডা! সারা জগতের মধ্যে আমার জন্যে বিধি-নির্দিষ্ট এই একমাত্র জায়গা, যেখানে সহজ মানুষ হিসেবে আমার কোন লজ্জা-সংকোচ বা দ্বিধার কারণ নেই, যেখানে ভুল করলে কেউ বেত নিয়ে তেড়ে আসবে না। রসিক

চীনেরা যা বলে, যদি আমার কোন গোপন দাদ থাকে, সেখানে নিঃসংকোচে চুলকোতে পারি, আঁটসাঁট ভব্যতার পোশাক খুলে যেখানে দেহ-মন নিঃসংকোচে হালকা হতে পারে, যদি হঠাৎ মনে জেগে ওঠে গান গাইবার বাসনা, সুর-তাল-হীন রাসভকণ্ঠে যেখানে আনন্দে গেয়ে উঠতে পারি নিধুবাবুর টপ্পা বা রবিঠাকুরের গানের একটা লাইন এবং সে-লাইনটার মধ্যে নিজস্ব সুর ছাড়া যদি নিজস্ব দু'একটা শব্দও ঢুকে যায় 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের ভয়ে বা বিশ্বভারতীর কর্তৃমণ্ডলের ভয়ে আঁতকে উঠতে হবে না! প্রত্যেক কাজের মানুষের এইরকম একটা জায়গা দরকার, নইলে কাজের ভারে জীবন শুকিয়ে যায়। এই হলো আড্ডার পরম সার্থকতা।

কলকাতা শহরে আরও গুটিকতক বিশিষ্ট আড্ডা লেখকের জানা ছিল। একটা আড্ডা ছিল, যার ছোট্ট ঘর থেকে আজকের বাঙলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্বনামখ্যাত লেখক বেরিয়ে এসেছেন, সে হলো 'কল্লোলে'র আড্ডা। ঠিক সেই সময় শহরের আর এক পাড়ায় গড়ে ওঠে আর একদল সাহিত্যিকদের আড্ডা, 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা।

এই দুই আড্ডার রেষারেষি একদিন এমন সুতীব্র হয়ে ওঠে যে এই দুই দলকে ডেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সাহিত্যের প্রথম Summit meeting-এর ব্যবস্থা করেন। এই দুই আড্ডার নিভৃত অন্তরালে আছে রবীন্দ্র পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যিকদের সংগ্রামী জীবনের বহু হাসি-কান্নার অলিখিত ইতিহাস। কল্লোলের আড্ডা বহুদিন হলো ভেঙে গিয়েছে, তার কিছু কাহিনী অচিন্ত্যকুমার তাঁর অপূর্ব লেখায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। শনিবারের চিঠির সে আড্ডাও ভেঙে গিয়েছে, যদিও তার দরজা এখনো বন্ধ হয়নি। যে * সজনীকান্ত দাসকে কেন্দ্র করে সেই আড্ডা গড়ে উঠেছিল, অরণ্যচারী সে সিংহ আজ বিবরবাসী, শান্ত, হয়ত ক্লান্ত।

* এই রচনা নব কল্লোলে প্রকাশিত হবার কিছুকাল পরে সজনীকান্ত দাস দেহ রাখেন।

আড্ডাকে জোর করে বাঁচিয়ে রাখা যায় না, রাখা উচিত নয়। প্রাণের তাগিদে আড্ডা আপনা থেকে গড়ে ওঠে, প্রাণের তাগিদ শুকিয়ে এলে আড্ডাও আপনা থেকে শুকিয়ে যায়। আড্ডা হলো ওষধি-বৃক্ষ, একবার ফল দিয়েই শুকিয়ে মরে যায়। তার আয়ুর এই অনিশ্চয়তাই হলো তার মাধুর্যের প্রধান উপকরণ।

অধিকাংশ আড্ডাই একজন আড্ডাধারীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এবং যে-সে আড্ডাধারী হতে পারে না। একটা আড্ডাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, কথা ছাড়া বহু জিনিসের দরকার হয়। একজন মানুষকে নিঃশব্দে অনেকখানি দিতে হয়, তবে একটা আড্ডা বেঁচে থাকে।

শুধু চাষ করলেই শস্য পাওয়া যায় না। প্রত্যেক শস্যের এক-জাতীয় শত্রু আছে, তাদের হাত থেকে শস্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সর্বদাই সজাগ থাকতে হয়। আড্ডারও তেমনি একজাতীয় শত্রু আছে, তাদের নানারকমের আকৃতি ও প্রকৃতি। তারা হলো আড্ডার উইপোকা। একবার আড্ডায় ঢুকলে আড্ডা ঝাঁজরা করে তবে বেরোবে।

তাই শুনতে যত সহজ, আড্ডা দেওয়া কিন্তু .ত সহজ নয়। নিজের বাইরে অপর মানুষকে যে অন্তর থেকে সহজভাবে শ্রদ্ধা করতে না শিখেছে, সে কখনো আড্ডা দিতে পারে না। আড্ডায় মানুষকে দেখলে, তার কথাবার্তা শুনলে স্পষ্ট বলে দেওয়া যায় তার শিক্ষা কালচারে পরিণত হয়েছে কিনা।

এ ছাড়া, আড্ডার সবচেয়ে বড় স্বাভাবিক শত্রু হলো, নারী!

কিন্তু এ সম্বন্ধে, 'আরো আড্ডায়'···

আরো আড্ডা

বর এবং কনে, দুটো মানুষ না থাকলে যেমন বিয়ে হয় না, তেমনি আড্ডা বললেই দুটো বিশেষ মানুষের দরকার, আর সবাই বরযাত্রী।

আড্ডার এই দুটি বিশেষ মানুষের মধ্যে একজন হলেন—স্বয়ং আড্ডাধারী। আড্ডার সৌরজগতে তিনি হলেন সূর্য, তাঁকে কেন্দ্র করেই আড্ডার চক্র ঘোরে।

চঞ্চল জগতে এই আড্ডাধারী হলেন স্থির-বিন্দু। তাঁর অফিস নেই, আত্মীয় নেই, বিয়ের নেমন্তন্ন নেই, সভায় বক্তৃতা দেওয়া নেই, সিনেমা দেখার বাতিক নেই, শালীর পাকাদেখা নেই, শালার ছেলের অন্নপ্রাশন নেই, দার্জিলিঙ নেই, পুরী নেই, তাঁর একমাত্র কাজ হলো অচল বিগ্রহের মতন আড্ডা আলো করে বসে থাকা। কলকাতার রাস্তা জলে ডুবে যাক, সূর্যের তাপে রাস্তা গলে যাক, জাপানীরা এসে ওপর থেকে বোমা ফেলুক, প্রত্যেক আড্ডাবাজ জানে আড্ডায় গেলে অন্ততঃ একজনকে দেখতে পাওয়া যাবে, সেই একটি লোক হলো আড্ডাধারী।

আড্ডার দ্বিতীয় বিশেষ লোকটি হলেন, নাপিতের ক্ষুর শাণ দেবার জন্যে যে পাথর থাকে, সেই শাণ-পাথর।

এক-এক আড্ডায় তাঁর এক-এক রকম উপাধি, কিন্তু তাঁর প্রয়োজনীয়তা একই রকমের। হাসির ক্ষুর ভোঁতা হলেই তাঁর ওপর শাণ দিয়ে নেওয়া হয়। কোন আড্ডায় তিনি মামা, কোন আড্ডায় খুড়ো। আড্ডাধারীর মতন তিনিও আড্ডার অপরিহার্য অঙ্গ।

এ ছাড়া প্রত্যেক আড্ডায় একজন কি দুজন এমন লোক থাকেন কথামৃতের ভাষায় যাঁদের বলা যায়, রসদ-যোগানদার—আড্ডার মধ্যমণি। যে আঠায় আড্ডা জোড়া বেঁধে থাকে, তাঁর মুখের কথায় থাকে সেই আঠা। ফুটবল খেলায় তিনি হলেন সামাদ, সবাই চেষ্টা করে তাঁকে বল দিতে, কারণ বল তাঁর কাছে গেলেই খেলা জমে। আড্ডায় সবাই চেষ্টা করে তাঁকে কথা বলাতে, সব কথাই তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং তাঁর নিজস্ব কায়দা থাকে কথা লুফে নেবার এবং তিনি জানেন কোন্ সময়ে কোন্ কথা কাকে 'পাস্' করতে হবে!

ছাপানো কাগজে হয়তো এইসব কথাবার্তার সবখানি ছাপা না হতে পারে কিন্তু আড্ডার এই সেন্সর-হীন স্বাধীন জগতে বাঙলা ভাষার নিজস্ব যে স্বাভাবিক জলুস ফুটে ওঠে, ছাপানো ভাষা তার কাছে মনে হয় কৃত্রিম, প্রাণহীন, ন্যাবা রুগীর চোখের মতন ফ্যাকাশে!

বিগত যুগের কলকাতার বিভিন্ন আড্ডায় এইজা[illegible] যে ক'জন রসদ-যোগানদারকে দেখেছি, তার মধ্যে পাঁচজনের তুলনা নেই, দাঠাকুর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (বুড়োদা), নলিনীকান্ত সরকার (এখন পণ্ডিচারী আশ্রমবাসী), কাজী নজরুল ইসলাম (এখন নিস্তব্ধ) এবং বিশ্বপতি চৌধুরী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। তিথি-নক্ষত্রের যোগাযোগে যখন এরা তিনজন কি চারজন একই আড্ডায় এসে পড়তেন, আমার বিশ্বাস, স্বর্গের একঘেয়েমি থেকে বাঁচবার জন্যে তখন নন্দনকানন ছেড়ে দেবতারা অ[illegible]ক্ষ্য এসে দাঁড়াতেন এঁদের কথাবার্তা শোনবার জন্যে! এবং আড্ডা ভাঙার পর যখন আবার তাঁরা স্বর্গে ফিরে যেতে বাধ্য হতেন, আমার স্থির বিশ্বাস, হাসি-কান্না-ভরা মাটির পৃথিবীর জন্যে নিশ্চয়ই তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন!

নলিনীকান্ত দাঠাকুরের অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও রসিকতা সম্বন্ধে একখানি সুন্দর বই লিখেছেন কিন্তু সিংহকে অরণ্যে না দেখলে যেমন সিংহের পুরো রূপ দেখা যায় না, তেমনি আড্ডায় প্রত্যক্ষভাবে যিনি দাঠাকুরকে কথা বলতে না শুনেছেন, তিনি জীবনের একটা মধুরতম আনন্দের স্বাদ থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন।

বাইরের সামাজিক জীবনে মানুষের মুখে অধিকাংশ সময়ই মুখোশ পরা থাকে, রাজনৈতিকের মুখোশ, অধ্যাপকের মুখোশ, সমাজ-নেতার মুখোশ, ব্যবসায়ীর মুখোশ—কিন্তু আড্ডার অন্তরঙ্গতায় সে-মুখোশ আপনা থেকে খসে পড়ে, একেবারে গামছা-পরা খালি-গা ভেতরের মানুষটি তখন ফুটে ওঠে…আড্ডায় দেখলে বোঝা যায়, কে কোন্ জাতের মানুষ! বিদ্রোহী নজরুলকে, গায়ক নজরুলকে, কবি নজরুলকে যাঁরা বাইরে থেকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁর এক চেহারা দেখেছেন……সেই নজরুল যখন আড্ডায় বসে কড়িকাঠ ফাটানো হাসি হাসতেন, সে আর এক নজরুল।

আমার অনেক সময় মনে হয়, আজকের অনেক বাঙালী সাহিত্যিক বাঙলা ভাষা জানেন না…তাঁরা একরকম বই-লেখার মতন পুঁথিগত বাঙলা ভাষা জানেন, এইসব সাহিত্যিক আড্ডায় নজরুলকে যাঁরা কথা বলতে শুনেছেন, তাঁরা জানেন পোশাকী রূপের বাইরে বাঙলা ভাষার একটা মাটিমাখা রূপ আছে, প্রতিদিনের জীবনে মানুষের মুখে মুখে এই ভাষা ঘুরে বেড়ায়, জেলায় জেলায় এর স্বতন্ত্র জলুস আছে, স্বতন্ত্র রূপ আছে…প্রতিদিনের জীবনের হাসি-কান্না-ঠাট্টার অন্তরঙ্গতার ভেতর এই ভাষার ইডিয়ম ভাঙে গড়ে…

জেলায় জেলায় বিভিন্ন এই মুখের কথার ভাষা হলো বাঙলা ভাষার খনি…এই ভাষার প্রচণ্ড ভবিষ্যৎ আছে এবং যাঁরা ভাষা নিয়ে কারবার করেন তাঁদের এই খনির সন্ধান নেওয়া দরকার। এই খনি থেকেই বাঙলার বাউল গানের ভাষা এসেছে, শ্যামাসংগীতের ভাষা এসেছে…কথাসাহিত্যে এই ভাষার প্রচণ্ড সার্থকতা সম্বন্ধে বাঙলার

আদি কথা-সাহিত্যিক আলালের ঘরে আর হুতোম প্যাঁচার নকশায় প্রত্যক্ষভাবে তার সম্ভাবনার ইঙ্গিত জানিয়ে গিয়েছেন। সত্যিকারের খেলোয়াড়ের হাতে পড়লে এই ভাষা শাণিত তলোয়ারের মতন কাজ করে। আগের যুগের কোন কোন বাঙালী সাংবাদিক এই ভাষাকে গণ-চিত্ত-প্রভাবের প্রধান বাহন করেন···স্বদেশী যুগে 'সন্ধ্যা' এই ভাষায় অতিসাধারণ লোকের মনেও আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। চাটগাঁ থেকে চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত এই ভাষা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রূপ-ভঙ্গিমায় ভাদ্রের ভরা নদার মতন বয়ে চলেছে···নজরুল এই বিচিত্র-রূপা বাঙলা ভাষাকে অনায়াসে আয়ত্ত করেছিলেন, যে-কোন জেলার ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ছিলেন এবং অনর্গল বলতে পারতেন।

তখন 'নায়কে'র স্বনামখ্যাত সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে "পেঁচো" জীবিত। তিনিও বাঙলার এই কথ্যভাষার একজন ওস্তাদ ছিলেন। নজরুল তখন 'ধূমকেতু' বার করেছেন। পাঁচকড়ির সঙ্গে লাগলো নজরুলের ঝগড়া। পাঁচকড়ি 'নায়কে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে নজরুলকে গালাগালি দিতে লাগলেন, নজরুল 'ধূমকেতু'তে তার জবাব দিতেন। এ কলমের লড়াইয়ে নজরুল গোড়া থেকেই মেঠো বাঙলা ভাষার তলোয়ার চালাতে থাকেন, পাঁচকড়ি বাধ্য হয়ে সাধু ভাষার ছড়ি ছেড়ে দিয়ে মেঠো ভাষার কুড়ুল ধরলেন। ইস্পাতে ইস্পাতে সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ঝরে পড়তে লাগলো। পাঁচকড়ি তখন পাকা প্রবীণ লেখক, নজরুল নবাগত তরুণ। কিন্তু তরুণ নজরুলের ভাষার তোড়ে পাঁচকড়ির কুড়ুল হাত থেকে পড়ে যায়। পাঁচকড়ি স্বীকার করেছিলেন, এই 'মুসলমান' ছেলেটি বাঙলা ভাষা জানে!

সে-যুগের সাহিত্যিক আড্ডার আর একজন বিশেষ রসদ-যোগানদার ছিলেন মহাস্থবির জাতকের অমর স্রষ্টা প্রেমাঙ্কুর আতর্থী···বুড়োদা নামে তিনি আড্ডার জগতে সুপরিচিত। জীবনের প্রান্তলগ্নে এসে

আজ তিনি রোগশয্যার নির্জনতায় একা বসে হয়তো আড্ডার স্বপ্ন দেখছেন, একদিন তাঁর মুখের কথায়, তাঁর আনন্দ-উজ্জ্বল অপরূপ ব্যক্তিত্বে, বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর সরস আলাপে এই দুঃখ-বেদনা-সমস্যাক্লিষ্ট জীবনের ফাঁকে ফাঁকে খণ্ড খণ্ড বহু আনন্দের স্বর্গলোক রচিত হয়েছিল···দুঃখের বিষয়, এই সব অপরূপ আনন্দের মুহূর্তের কোনও স্মৃতিচিহ্ন কোথাও থাকবে না !

মানুষ যত সব শিল্পকাজ করে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শিল্প যেটা, সেটা অবজ্ঞাত হয়েই থাকে···সে-শিল্পের নাম হলো, বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকাই হলো সবচেয়ে বড় আর্ট। বেঁচে সবাই থাকে, কিন্তু বেঁচে থাকার আর্ট শতকরা একজনও জানে না।

যাঁরা এই আর্টে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁরা একটা জিনিস পেয়েছেন, সেটা হলো অস্তিত্বের আনন্দ। আড্ডায় বুড়োদাকে দেখলে জানা যায় এই অস্তিত্বের আনন্দ কি জিনিস। প্রদীপের আলো যেমন এক নিমেষে অন্ধকার ঘরকে আলোয় ভরিয়ে তোলে, তেমনি আড্ডায় এলেই এই লোকটির আনন্দে সবাই আনন্দে ভরে উঠতো। বাঙালীর একটা দুর্নাম, সে বড্ড বেশী কথা বলে। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে একজাতের কথা-বলিয়ে লোক ছিলেন, যাঁরা কথা বলাকে আর্ট করে তুলেছিলেন, তাঁরা ছিলেন রসিক, তাঁরা ছিলেন আলাপচারী শিল্পী, তাঁদের আলাপের মধ্যে ছিল সম্মোহন। বুড়োদা ছিলেন আলাপচারী শিল্পীদের রাজা। অনেকেই হয়তো জানেন না, যে-জাদু আছে শরৎচন্দ্রের লেখায়, সেই জাদু ছিল তাঁর কথা বলায়, এবং মুভিং ম্যাজিস্ট্রেটের মতন তিনি ছিলেন মুভিং আড্ডা···যেখানে গিয়ে বসতেন, সেইখানেই আড্ডা জমে উঠতো। একসময়ে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ির আড্ডায় এবং নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারের আড্ডায় শরৎচন্দ্র আড্ডা দেবার তাগিদে বাজেশিবপুর থেকে ছুটে আসতেন ; গাড়ি না পেলে ট্রামে আসতেন।

পটুয়াটোলা লেনের গলিতে রাস্তার ওপর একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি। রাস্তা থেকে তিনটে ধাপ সিঁড়ি ওপরে উঠলে, একফালি একটা ছোট্ট রক, রকের সামনে একটা ছোট্ট ঘর…ঘর থেকে রকে আসতে গেলে একটা দরজা আছে, এই দরজা দিয়েই সাধারণতঃ এই ঘরে ঢুকতে হয়…কিন্তু পেছন দিকে অপর একটা দরজা আছে, সেই দরজা দিয়ে বাড়ির লোকেরা যাতায়াত করেন। দরকার হলে, পেছনের সেই দরজা দিয়েও এই ঘরে ঢোকা যায়…

এই ঘরে কল্লোলের জন্ম হয় এবং কল্লোলের সেইটেই আড্ডা-ঘর।

প্রথমেই ঘরে ঢোকবার দুটো দরজার বিবরণ দিতে হলো, তার এক উদ্দেশ্য আছে…

কল্লোলের ঘরে একটা ছোট্ট টেবিল, টেবিলের সামনে একটা চেয়ার, সেটা হলো সম্পাদক ও আড্ডাধারীর চেয়ার। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে একটা ছোট তক্তাপোশ, আর একটা ছোট্ট ডেক-চেয়ার। এই ডেক-চেয়ারটির কি গুণ ছিল, সব আড্ডাধারীই এই চেয়ারটিতে বসতে চাইতো…তাই বাইরে থেকে যিনই আড্ডায় আসতেন, রাস্তা থেকে দেখে নিতেন এই ইজিচেয়ারে কেউ বসে আছেন কিনা! যদি দেখতেন যে, চেয়ার দখল করে, ধরুন পবিত্র গাঙ্গুলী আগে থাকতে বসে আছে, অচিন্ত্যকুমার সামনের দরজা দিয়ে না ঢুকে গম্ভীরভাবে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পবিত্রকে বলতো, এই, শৈলজা বাইরে তোকে একবার ডাকছে…

পবিত্র তাড়াতাড়ি বাইরে শৈলজার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তো…উঠতেই হতো, কারণ "বাইরে তোকে একবার ডাকছে" কল্লোলের আড্ডায় একথাটার একটা গোপন তাৎপর্য ছিল!

বাইরে বেরিয়ে শৈলজাকে না দেখেই পবিত্র বুঝতে পারতো, ইজিচেয়ার দখল করে অচিন্ত্য বসে আছে···সেই সময় হঠাৎ যদি পবিত্রর নাক ফুলে উঠতো, তাহলে সেইখান থেকেই রেগে সে চলে যেতো, ঘরে আর ঢুকতো না! নাক ফুললে পবিত্র আর রাগ সামলাতে পারতো না!

কিন্তু মিনিট দশেক পরেই ফিরে আসতো···আড্ডায় ফিরে আসতেই হবে···ইতিমধ্যে কারুর কাছ থেকে খানিকটা শুখো খইনি যোগাড় করে গালে ফেলে আবার সেই ঘরে ঢুকতো···ইজিচেয়ারে অচিন্ত্যের দিকে চেয়ে বলতো, এই যে, কখন এলি রে!

যেন এই প্রথম দেখা হলো! চেয়ার হারানোর দুঃখ সগৌরবে চাপা দিতে হতো!

মিনিট দুই পরে হঠাৎ বাড়ির ভেতর দিক থেকে এই ঘরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হতো···

পবিত্র উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখে···তারপর অচিন্ত্যের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলে, বউদি ডাকছে।

বউদির ডাক কল্লোলের আড্ডাধারীদের কাছে irresistible! এই ভবঘুরে ভিখিরীদের কাছে তিনি ছিলেন অন্নপূর্ণা!

অচিন্ত্য ইজিচেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাড়ির ভেতর ঢোকে!

পবিত্র সগৌরবে আবার ইজিচেয়ারে এসে বসে!

সেই দশমিনিটের ফাঁকে পবিত্র বউদির সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছিল, অচিন্ত্যকে চেয়ারচ্যুত করার কৌশল!

সারাদিন এইভাবে সেই ছোট্ট ডেক-চেয়ারটিকে নিয়ে স্ট্যালিন-গ্রাদের যুদ্ধ।

সেদিন সেই জীবনের স্বপ্ন-জাগর-লগ্নে সামান্য সেই ইজিচেয়ার দখল করে বসার মধ্যে যে আনন্দ ছিল, আজ আর সে আনন্দের চিহ্ন কোথাও নেই!

কল্লোলের সেই আড্ডায় অদৃশ্য চুম্বকের আকর্ষণে সেদিন যাঁরা এসে জড় হয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই চোখে ছিল স্বপ্ন, মনে ছিল যৌবনের খেলা-রস, প্রাণে ছিল দুর্বার দুরাকাঙ্ক্ষা! এই আড্ডাঘর দেখেছে বাঙলার শেষ রোমান্টিক রিভাইভাল, এই আড্ডাঘরই দেখেছে রোমান্টিসিজমের সমাধি···

সে সমাধির দ্বার বন্ধই থাক···

আড্ডাকে বাঁচিয়ে রাখা রীতিমত একটা সাধনার বস্তু।

প্রত্যেক আড্ডার একটা বিশেষ চরিত্র আছে, বিশেষ স্বাদ আছে, বিশেষ আবহাওয়া আছে। আড্ডাধারীর কাজ হলো আড্ডার সেই বিশেষ আবহাওয়াটিকে বাঁচিয়ে রাখা। সেটা খুব শক্ত কাজ। পাঁচজন লোক যেখানেই জড়ো হয়, বিশেষ করে পাঁচজন বাঙালী যেখানে জড়ো হয়, সেখানে পাঁচমুখে পাঁচরকম কথা হবেই। আড্ডা-ধারীর সেই জন্যে সব সময় সজাগ হয়ে থাকতে হয়, যাতে এই পাঁচকথা এক মোড়ে এসে আবার মেশে।

যাঁরা আড্ডায় আসেন, তাঁরাই রসিক নন। সকলের মাত্রাজ্ঞান সমান নয়। কারুর হয়ত কলিক্ পেন আছে, আড্ডায় এসে চেয়ারে বসতে না বসতেই তিনি শুরু করলেন সেই কলিক্ পেনের গল্প··· তাঁকে গ্রহণ করতে হলে তাঁর এই কলিক্ পেনের গল্পকেও গ্রহণ করতে হবে···প্রতিদিন আড্ডাধারীকে সহৃদয় অন্তরে শুনতে হবে সেই কলিক্ পেনের কাহিনী···আড্ডাধারীকে হতে হবে আদর্শ-শ্রোতা।

কোন কোন বাঙালীর একটা জন্মগত ধারণা আছে, পৃথিবীর আর সব লোকের শ্রবণেন্দ্রিয় আছে শুধু তাঁর কথা শোনবার জন্যেই। আড্ডায় তাই তিনি অন্য কাউকে কথা বলতে দেন না, এমন কি

পাশের লোক কথা বললে তিনি জোর করে তাঁর মুখে হাত-চাপা দিয়ে নিজে বলতে 'আরম্ভ করেন। সুকৌশলী সেনাপতির মতন আড্ডাধারীকে তখন মধ্যস্থ হয়ে কথার মোড় ফেরাতে হয়।

সব চেয়ে বিপদ হয়, স্পেশালিস্টদের নিয়ে। বড় বড় ডাক্তাররা যেমন এক এক বিষয়ে স্পেশালিস্ট, তেমনি সাধারণ মানুষদের মধ্যেও স্পেশালিস্ট আছেন। আড্ডায় যদি আমের কথা উঠলো, আর রক্ষে নেই, আড্ডায় যদি কোন আম-স্পেশালিস্ট থাকেন তিনি তখন চিৎকার করে উঠবেন, আম দেখেছেন? আম কি করে খেতে হয় জানেন? কলকাতার লোকেরা আম চেনে?

সাধারণতঃ মুর্শিদাবাদের লোকেরা আম-স্পেশালিস্ট হন…তাঁদের সামনে আমের কথা উঠলে আর রক্ষে নেই! তখনই শুরু হবে আমায়ণ! আড্ডাধারীকে বিব্রত হয়ে দেখতে হয়, আমের খোসায় আড্ডা পিছলে না পড়ে যায়।

এমনি আছেন মাছধরা স্পেশালিস্ট। মাছধরার কথা উঠলেই তাঁরা পকেট থেকে পচা 'চার' বার করবেনই…এবং শুধু তাঁর মাছধরার কাহিনী নয়, তাঁর জ্যাঠামশাইএর মাছধরার কাহিনীও শুনতে হবে। কারণ ছেলেবেলায় এই জ্যাঠামশাইএর কাছ থেকেই তিনি মাছধরা শিখেছিলেন…জ্যাঠামশাইএর ছিপটা উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়েছেন…এই ছিপে সামান্য কেঁচোর চার দিয়ে জ্যাঠামশাই একবার পনেরো সের একটা কাতলা…ইত্যাদি…ইত্যাদি…

তেমনি আছে অসুখ-স্পেশালিস্ট…আড্ডায় কেউ যদি কোন অসুখের কথা তুললো, অসুখ-স্পেশালিস্ট তাকে ধমকে থামিয়ে দেবেন, কারণ তার দশগুণ বেশী অসুখ তাঁর হয়েছিল…তাঁর গৌরব, পৃথিবীর যাবতীয় বড় অসুখের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর আছে।…এবং হেন বড় ডাক্তার নেই, যাঁর প্রেসক্রিপশন তাঁর মুখস্থ নেই!…

এঁরাই হলেন আড্ডার উইপোকা…ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা হয়তো খুব ভাল মানুষ…হয়তো সত্যিকারের একজন গুণী লোক…কিন্তু বহু-

ক্ষেত্রে দেখেছি, উইপোকার মতন নীরবে এঁরাই আড্ডাকে ভেতর থেকে ঝাঁজরা করে দেন।

আমার বিশ্বাস, শনিবারের চিঠির আড্ডার ভাঙনের সূত্রপাত হয় এমন একজন আড্ডাধারীর জন্যেই। আড্ডায় তিনি থাকলে আর কাউকে কোন কথা বলতে হতো না, কারণ সব কথাই তিনি বলবেন এবং তাঁর মতই একমাত্র ঠিক মত, তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু বললে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে আরও জোরে, আরও বেশী কথা বলতেন!

কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতা-আবৃত্তি আমাদের শুনতে হয়েছে! অথচ তিনি ছিলেন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছন্দ-তাল-রসিক কবি!

প্রকৃত আড্ডাধারীর একমাত্র বিশেষণ হলো সে রসিক, সে ভদ্র ···সে শিখেছে কি করে নিজেকে আড়াল রেখেও নিজের ব্যক্তিত্বকে সুন্দর ও অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

আড্ডার জগতে কোন বাঁধন নেই, কোন নিয়ম নেই, কোন এটিকেটের বালাই নেই···

শুধু একটি নিষেধ আছে, যে চেয়ারে বসে আছ, নিজেকে তার চেয়ে বড় দেখাতে চেষ্টা করো না!

চাঁদে গেলে শুনেছি মানুষ হালকা হয়ে যায়···

আড্ডা হলো সেই চাঁদের দেশ···

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ আধঘণ্টাও যদি নিজেকে হালকা করতে পারা যায়, জীবনের তেতো স্বাদ অনেকখানি কেটে যায়···

আড্ডার একটা মস্তবড় স্বাভাবিক ত্রুটি হলো, আড্ডা পুরুষের একান্ত জগৎ···

ত্রুটি হলেও, সেইটেই আবার আড্ডার রক্ষাকবচ···

আড্ডার দশ হাতের মধ্যে স্ত্রীলোক থাকলে, আড্ডা ভেঙে যায়···

রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে চিরকুমার সভা লেখেন···

প্রত্যেক বিবাহিতা স্ত্রী আড্ডাকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখেন···

আড্ডাধারী-স্বামীর জন্য তাঁকেই নিশীথ-নিস্তব্ধতায় একা জেগে বসে থাকতে হয়···

আড্ডা ভাঙার পর প্রত্যেক স্বামী যখন বাড়ির দিকে ফেরেন, তখন মনে মনে একটি প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত হয়েই তাঁকে ফিরতে হয়, —আড্ডা ভাঙ্‌লো ?

শয্যাপ্রান্তে দুটি তন্দ্রাক্লান্ত ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে প্রতিদিন একই শয্যায় ফিরে আসার অবসাদ অনেকখানি কেটে যায়···

কর্ণেজপন

কথাটা নতুন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে জন্মায়নি। তৈরি করতে হয়েছে।

আজকে ইওরোপে আর আমেরিকায় অর্থাৎ সভ্য জগতে একটা নতুন কথা জন্মেছে, তার নাম Indoctrination.

যে মাটিতে স্বাভাবিকভাবে ওই কথাটি জন্মেছে, আমাদের দেশের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে তা জন্মায় না।

তবু কাজ কারবার চালাবার জন্যে একটা প্রতিশব্দ দরকার। শ্রদ্ধেয় চিন্তাহরণ চক্রবর্তী Indoctrination-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'কর্ণেজপন' কথাটি তৈরি করেছেন। কিন্তু দুটো কথার চেহারার দিক থেকে একটু-আধটু মিল থাকলেও চরিত্রের দিক থেকে আকাশ-পাতাল তফাত। বনের নেকড়ে আর ঘর-পোষা কুকুরে যা তফাত।

কর্ণেজপন কথাটির মানে খুব সহজ—কানে জপা, অর্থাৎ রাতদিন একটা কথাকে কানের কাছে জপা।

Indoctrination কথাটির মানেও খুব সহজ—তোমার যা মত তার বিপরীত মতে তোমাকে নিয়ে আসা। তুমি বিশ্বাস কর ভগবান আছেন কিন্তু আমার দরকার তোমাকে দিয়ে বলানো—না, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না! যে-কৌশলে বা যে-বিজ্ঞানের সাহায্যে দুর্বিনীত মনকে বিনীত করা হয়, তাকেই বলে Indoctrination.

এর মূল কথা হলো, সময়। দীর্ঘদিন ধরে তোমার মত হয়তো স্বাভাবিক নিয়মে বদলাতে পারে কিন্তু অত সময় তোমাকে দিতে আমি রাজী নই···তাড়াতাড়ি তোমার মনের চেহারার পরিবর্তন আমার দরকার। তাই এই নিরীহ কথাটির পেছনে আছে ক্ষমাহীন এক প্রচণ্ড শক্তি, যে শক্তি সেই প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে তোমাকে বাধ্য করবে তোমার মত বদলাতে।

এ পারে একমাত্র সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র···যা বিশ্বাস করে জীবধর্মে নিষ্ঠুরতা ও হত্যার প্রয়োজন আছে। দশ লক্ষ লোককে বাঁচাতে যদি দুশো লোককে হত্যা করতে হয়, সে-হত্যা করা প্রয়োজনীয়। Indoctrination-এর পেছনে আছে এই ক্ষমাহীন রুদ্রতা।

বার্নার্ড শ তাঁর বিখ্যাত নাটক মেজর বারবারা-তে Undershaft-এর মুখ দিয়ে এই তত্ত্বকেই প্রকাশ করেছেন। পিতার সেই ক্রূর যুক্তি শুনে ধর্মপ্রাণা কন্যা বারবারা সভয়ে জিজ্ঞাসা করে,—Killing. Is that your remedy for everything ?

—তুমি কি মনে কর, এইভাবে হত্যায় তুমি সব সমস্যার সমাধান করবে ?

Undershaft উত্তর দিচ্ছে,

—It is the final test of conviction, the only lever strong enough to overturn a social system, the only way of saying Must···when you vote, you only change the names of the cabinet, when you shoot, you pull down governments, inaugurate new epochs, abolish old orders and set up new. Is that historically true or is it not ?

—যদি তুমি দারিদ্র্য দূর করতে চাও, মানুষের কল্যাণ সত্যিকারের চাও, এই হলো তোমার প্রত্যয়ের চরম প্রমাণ···যে-সমাজ-ব্যবস্থায় বিশ্বাস কর না, তাকে যদি পরিবর্তিত করতে চাও, এই

হলো একমাত্র শক্ত যন্ত্র, যে-যন্ত্র ভেঙে যাবে না…'করতে হবে' বলবার এই হলো একমাত্র ভাষা…তোমার (গণতান্ত্রিক) ভোটের ভেতর দিয়ে তুমি যে পরিবর্তন আন, সে হলো মন্ত্রী-সভার পরিবর্তন …একদল মন্ত্রীর বদলে আর একদল মন্ত্রী…কিন্তু যদি তুমি পুরোনো জীর্ণ শাসন-তন্ত্রকে ভেঙে নতুন শাসন-তন্ত্র আনতে চাও, জীর্ণ পুরাতনকে উচ্ছেদ করে যদি নতুন যুগ, আর নতুন ব্যবস্থাকে আনতে চাও, তোমাকে গুলি ছুঁড়তে হবে…ইতিহাসের দিকে চেয়ে বল, আমার কথা সত্যি, না মিথ্যে ?

Indoctrination-কে যারা বিজ্ঞান করে তুলেছে, এই হলো তাদের মানসিক গঠন।

এখানে বলা দরকার, এসব কথা উত্থাপন করছি কেন ? কিছুদিন আগে আনন্দবাজারের এক দোল-সংখ্যায় স্বর্গীয় রাজশেখর বসু একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমাদের দেশে যেভাবে স্বেচ্ছাচারিতা আর জাতীয় চরিত্রহীনতা বেড়ে চলেছে, কিভাবে তা প্রতিরুদ্ধ হতে পারে, তিনি তার কথা তুলেছেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যিক ও লেখকদের কাছে 'কর্ণেজপন' প্রেসক্রিপ্‌শন করেছেন। সেই সূত্রেই এই আলোচনা।

আজ এমন একটা সময় এসেছে, যখন রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়, Silence is criminal. আজ চুপ করে থাকা পাপ ; বিশেষ করে, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও লেখকের পক্ষে। এই জাতীয় সংকটের সময়, রোলাঁ বলেছেন, Silence is action…অর্থাৎ যাঁরা ভাবছেন চুপ করে থেকে অন্যায়কে এড়িয়ে আছেন, তাঁরা ভুল করছেন, কারণ তাঁদের নীরবতা হলো অন্যায়েরই সমর্থন।

ভারতবর্ষ, তথা বাঙলার আজ চরম দুর্ভাগ্য যে, জাতির প্রজ্ঞা আজ নিস্তব্ধ।

এই শূন্যতায় আজ সাহিত্যিকদের দায়িত্ব শতগুণ বেড়ে গিয়েছে।

যুগে যুগে দেশে দেশে যখনই এমন মানসিক-সংকট এসেছে, গতির আবর্তে সৃষ্টি হয়েছে গতির ছলনা, এসেছেন সংকট-ত্রাণ-মন্ত্র নিয়ে সাহিত্যিকেরা, কবিরা। তাঁদের রুদ্রবাণীতে জ্বলে উঠেছে পাবক-শিখা। সর্ব-লোভের ঊর্ধ্বে, সর্ব-দলের ঊর্ধ্বে, স্বার্থের সিদ্ধি প্রত্যাখ্যানে তাঁরাই নিজেদের দহন করে দিয়ে গিয়েছেন অগ্নিমন্ত্র··· পাবক-মন্ত্র···গতির মন্ত্র···

আজ সেই অগ্নিমন্ত্র-উদ্গাতা সাহিত্যিকদেরই পথ চেয়ে বসে আছে দেশ।

চল্লিশ বছর আগে রুশ আর ভারতবর্ষ, এই দুই মহা-দেশেরই বিরাট জনসংখ্যা প্রায় এক রকম অবস্থাতেই পড়ে ছিল।

আজ এই দুই দেশই আত্মকর্তৃত্ব পেয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়া তাদের জনসাধারণকে সভ্য নাগরিকের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, যা আমরা ভারতবর্ষে পারিনি।

রাশিয়া Undershaft-এর আদর্শে তাদের জনতাকে তাদের মনের মতন করে দ্রুত গড়ে তুলেছে, আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শে ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলেছি। এগিয়ে চলেছি মনে করছি।

আমাদের গণতন্ত্রে জাতির বিরুদ্ধে যে মারাত্মক পাপ করে, দু'পয়সা ব্যক্তিগত লাভের জন্যে মানুষের খাদ্যে যে বিষ মেশায়, ভেজাল ওষুধ যে তৈরি করে, সামান্য কিছু অর্থদণ্ড ছাড়া তাকে অন্য কিছু শাস্তি দেবার মতন নাকি আইন তৈরী নেই। যে কোন শিশু বা মুষ্টিমেয় নারীর দল আমাদের রাষ্ট্রে যে কোন রেলের চলা বন্ধ করে দিতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়ায় এরকম ঘটনা একবারই ঘটতে পারে, তার পর আর ঘটা

কোন দলে নায়কত্ব করবে

সম্ভব নয়। ঈশ্বরহীন সোভিয়েট স্কুলের ছাত্রদের কর্তব্যবিধিতে দেখেছি, যদি কোন ছাত্র রাস্তায় শিক্ষককে দেখে আগে সম্ভ্রমসূচক 'নড্' না করে, তাহলে তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এবং সেখানে তাড়িয়ে দেওয়া হবে মানে, তাড়িয়ে দেওয়া হবেই। আমাদের গুরু-পূজার দেশে ছাত্রেরা মাস্টারকে ঠেঙালে মস্তান বা hero হয়। বছর দুয়েক পরেই সে-ছাত্র কোন দলে নায়কত্ব করবে!

গণতন্ত্রের অনেক আবদার, অনেক বায়না।

সুতরাং গণতন্ত্রের দেশে দুর্বিনীত স্বেচ্ছাচারী জনতাকে বিনীত ও সুনিয়ন্ত্রিত করবার কি উপায়?

এইখানেই রাজশেখর বসু কর্ণেজপনের প্রস্তাব করেছেন। পশ্চিমের Indoctrination আমাদের মাটিতে কর্ণেজপন হয়েছে।

Indoctrination-এর পুঁথি ও প্রক্রিয়া এখনও ট্রেড-সিক্রেটের মতন আবিষ্কর্তাদের গোপন দফতরে লুকিয়ে আছে। তার সব খবর আমরা জানি না। যেটুকু খবর মাঝে মধ্যে বেরিয়ে পড়ে, তাতে দুটো জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায়। একটা হলো, এই শাস্ত্রমত কাজ করতে হলে যে নার্ভ দরকার তা নিরামিষভোজী আমাদের ধাতে নেই। দ্বিতীয় হলো, এই শাস্ত্রের প্রয়োগ নির্ভর করে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক উন্নতির ওপর। আজ পশ্চিমে বিস্ময়কর সব ওষুধ আর অতি সূক্ষ্ম সব যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যার প্রভাব মানুষের মনের ওপর শুধু নয়, অবচেতন মনের ওপরও! Indoctrination-এর আদিপর্বের নাম Brain-washing···মস্তিষ্ককে আগে ধুয়ে সাফ করা হয়। এই সব সাইকিক্ ওষুধ ও সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে এই Brain-washing হয়।

সে-পথে যাবার যে প্রস্তুতি দরকার, তা আমাদের আদৌ নেই। সুতরাং আমাদের ভরসা, এই কর্ণেজপন।

কর্ণেজপনে ফল পেতে হলে, তাকেও একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে হবে। ধীরে ধীরে তার একটার পর আর একটা ধাপ গড়ে তুলতে হবে। এবং প্রত্যেক ধাপের মধ্যে একটা সংযোগ থাকা দরকার। নইলে কর্ণেজপন অরণ্যে রোদন হবে। রাখালের মাসী রাখালের কানে রাতদিনই জপতো ভাল ছেলে হবার জন্যে, কিন্তু একদিন রাখাল সেই মাসীরই কান কামড়ে দিল। রাখালের শাস্তির ভয় থাকা দরকার।

'কর্ণেজপন' নতুন বিদ্যা নয়। আংশিক ভাবে আমরা দিবারাত্র কর্ণেজপন করে চলেছি।

রাত্রিবেলা ঘুমুতে যাচ্ছেন, নিশুতি পাড়া কাঁপিয়ে উঠলো ঘন ঘন রব, 'ভোট দেবে কিসে,...কাস্তে ধানের শিষে'...

প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা আপনার কানে বিভিন্ন দল এই কর্ণেজপন করে চলেছে...

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন, এই কর্ণেজপনেরই রূপভেদ।

উঠতে বসতে নেতারা মহাত্মা গান্ধীর নাম নেন...যে-কোন বিদেশী V. I. P. আসেন, তাঁকে রাজঘাটে মহাত্মাজীর সমাধি-স্থলে আগে নিয়ে যাওয়া হয়...এ সবই কর্ণেজপনের রকমফের।

কর্ণেজপনের সাহায্যে জাতির এই দুর্বিনীত এলোমেলো চেহারার পরিবর্তন ঘটাতে হলে, তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে হবে। নব নব পরীক্ষা করতে হবে।

কর্ণেজপনকে সার্থক করতে হলে, দুটি ব্যবস্থা সর্বপ্রথম দরকার। একটি হলো, আমাদের দেশের স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্যে জাতীয়-চরিত্রগঠনের উপযোগী নতুন ধরনের বই সত্যিকারের সাহিত্যিকদের দিয়ে লেখাতে হবে এবং একেবারে নীচুর ক্লাস থেকে সব চেয়ে উঁচু ক্লাস পর্যন্ত এই ধরনের বই ছাত্রদের মানসিক গঠনের ক্রম হিসেবে অবশ্যপাঠ্য করতে হবে। এইভাবে ছেলে-বেলা থেকে জীবনধর্মের যে-সব স্থায়ী values, তার কথা অবিচ্ছেদ ভাবে ছেলেদের কানে জপতে হবে। শুধু শুষ্ক নীতিকথা বা উপদেশ-লহরী নয়, সত্যিকারের সাহিত্য-স্রষ্টার লেখা প্রাণ-বাণী, যে বাণীর বিদ্যুতের ভেতর দিয়ে নিজের দেশের ও মানব-সভ্যতার মর্মকথা জীবন্ত হয়ে উঠবে। এইভাবে ছেলেবেলা থেকে মহৎ জীবনের সংস্পর্শে তাদের আনতে হবে।

দ্বিতীয় অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হলো, জনমতকে দৃঢ় ও সক্রিয়

করে গড়ে তোলা। মানুষ যে সমাজে বাস করে, তার ভেতর বসে অন্যায় করতে সে ভীত ও লজ্জিত হবে, এমনভাবে জনমতকে দৃঢ় করে তুলতে হবে। এইখানেই কর্ণেজপন-ব্যবস্থায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা প্রচণ্ড সাহায্য করতে পারেন।

যে চোর, যে অন্যায়কারী আইনের চোখে ধরা পড়ে না, তাকে বড়লোক বলে আমরা সম্মান করি। তাই আদালতের বাইরে এমন একটা শাস্তিদাতা শক্তিকে গড়ে তুলতে হবে, অন্যায়কারী যাকে সমীহ করতে বাধ্য হবে। এই শাস্তি হলো মানসিক শাস্তি, সে মানসিক শাস্তি দিতে পারে জাগ্রত জনমত বা জাগ্রত সমাজ।

একদিন আমাদের সমাজের এই শাস্তি দেবার ক্ষমতা ছিল। বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি এসে সমাজের এই শক্তিকে ভেঙে দিল। সব চেয়ে ক্ষতি করলো সমাজ নিজে। কালের সঙ্গে সে চলতে ভুলে গেল, তাই তার বিচারে ভুল হতে লাগলো, সেই ভুলের দরুন তার ক্ষমতাও শিথিল হয়ে গেল।

আজ নতুন করে সেই সামাজিক শক্তিকে জাগাতে হবে, জনমতকে শাস্তিদাতা ও বিচারক করে গড়ে তুলতে হবে।

কি করে তা সম্ভব হবে?

কাজ করতে আরম্ভ করলেই, পথ দেখা দেবে। বহু উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

দুটি উপায় আমাদের সামনেই আছে। একটি হলো সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলি যদি এই বিষয়ে কর্ণেজপন করেন। রাজশেখর বসু সেই প্রস্তাব করেছেন। কাগজের চেহারা একটু বদলাতে হবে। প্রত্যেক কাগজে একটা নির্দিষ্ট পাতা বা কলম থাকবে, যেখানে অন্যায়কারীর নাম ও অপকীর্তি ঘোষিত হবে। পুরাকালে আমাদের দেশে কোন কোন রাষ্ট্রে ব্যবস্থা ছিল, রাজদণ্ডে দণ্ডিত লোককে শহরের বড় রাস্তার তেমাথার ওপর সাত দিন দাঁড় করিয়ে রাখা হতো, আর ঘোষকেরা তার নাম আর অপকীর্তির কথা

জনতাকে চিৎকার করে শোনাতো। তারপর তাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হতো। [শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক দ্রষ্টব্য।]

সংবাদপত্রের সেই বিশেষ পাতা বা কলম হবে সেই তেমাথার মোড়…

শাস্তি যে দেবে, তার পুরস্কার দেওয়ারও ক্ষমতা থাকা চাই।

জনমত হয়তো পদ্মশ্রী কি পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে পুরস্কৃত করতে পারবে না, কিন্তু যে সাধারণ লোক প্রতিদিনের কাজে বৃহৎ বাধার বিরুদ্ধে নির্ভীকতা দেখায়, অফিসের যে সামান্য বেয়ারা পাঁচ টাকা ঘুষের মোহ জয় করে, যে সামান্য রেফিউজি তরুণ উপবাস দিয়েও ভিক্ষা নিতে কুণ্ঠা বোধ করে, যে ছাত্র খাতা ছিঁড়ে পরীক্ষার অবমাননা করে না…সংবাদপত্র তাদের নাম গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করে তাদের সামাজিক সম্মানের পুরস্কার দিতে পারেন…নেহরু-পন্থের ছবির সঙ্গে তাদেরও ছবি কাগজে কাগজে বেরোতে পারে। এ পুরস্কারের প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয় উপায় হলো, গণ-উৎসবে "জেলেপাড়ার সং"-এর মতন নতুন ধরনের সং-এর পুনর্গঠন।

একদিন বাঙলাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে সামাজিক শাসন ও তিরস্কারের জন্যে নানারকমের অভিনয়কারী রঙ্গদল ছিল। স্থানীয় লোকের অপকীর্তিকে ব্যঙ্গ-নাটকে ও ব্যঙ্গ-ছড়ায় এইভাবে প্রকাশ্য-ভাবে তিরস্কৃত করা হতো। এইভাবে বীরভূমে ছিল লেটোর দল, মুর্শিদাবাদে ছিল আল্‌কাপের দল, মালদহে ছিল গম্ভীরার দল, কলকাতায় ছিল জেলেপাড়ার সং। স্থানীয় অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কবিরা এইসব দলের জন্যে ছড়া আর নাটক গাঁথতো। শোনা যায়, কলকাতার জেলেপাড়ার সং-এ অনেক পালা নাকি রসরাজ অমৃতলাল বসুর লেখা।

রাস্তায় চলমান এই রঙ্গ-নাটুকের দল প্রতিভাবান ব্যঙ্গ-রচয়িতার সাহায্যে সামাজিক শাসনের প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করতে পারে। প্রত্যেক গণউৎসবে এদের নিয়মিত আবির্ভাব কর্ণেজপনকে শাণিত অস্ত্ররূপে গড়তে পারে। পুরস্কার ও শাস্তিদাতারূপে এইভাবে জনমতকে গড়ে তোলা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।

পুরস্কার ও শাস্তিদাতা না হলে জনমতের কোন মূল্য নেই।

বুড়ো হওয়া আর বুড়িয়ে যাওয়া

সেকালের লোকের কাছে সব চেয়ে বড় আশীর্বাদ ছিল, দীর্ঘজীবী হও!

দীর্ঘজীবী সবাই হতে চায়। এই পৃথিবীর ধুলোতে কি মধুর মোহ মিশিয়ে আছে, কেউ তাকে ছেড়ে যেতে চায় না।

যে আত্মহত্যা করে, যদি তার হত্যা-চেস্টা ব্যর্থ হয়, অচেতন অবস্থা থেকে জাগার সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে, আমাকে বাঁচাও!

কিন্তু দীর্ঘজীবী হওয়া আর বুড়ো হওয়া এক জিনিস নয়।

আজকের জগতের লোক দীর্ঘজীবী হতে চায়, কিন্তু বুড়ো হতে চায় না।

দুস্ট ব্যাধির মতন সে বার্ধক্যকে লুকোতে চায়। বিজ্ঞানের দরজায় সে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আমার বার্ধক্যের চিহ্নগুলোকে ঢেকে দাও।

স্বনামখ্যাত চীনা সাহিত্যিক ও দার্শনিক লিন্ উটাঙ্ আজকের আমেরিকার বড় বড় শহরে ঘুরে বেড়িয়ে হতাশ হয়ে বললেন, চারদিকে চোখ চেয়ে খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু দে-ত পেলাম না, একমুখ সাদা সুপক্ক দাড়ি বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, বার্ধক্যের সে গৌরবময় চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলাম না···সেফ্‌টি রেজরের কৃপায় সাদা দাড়ি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

আধুনিক মানুষ বুড়ো হতে ভয় পায়। লজ্জা পায়।

আজকের ইওরোপ-আমেরিকার দিদিমারা পোশাকের তলায় ভানুমতীর হাড় রেখে নাতনীদের বডি লাইনের সঙ্গে পাল্লা দেন···

আমাদের দেশের দিদিমারাও পেছিয়ে থাকতে চান না··· যে 'বডি' চলে গিয়েছে, তার লাইন বার করবার জন্যে তাঁরাও ব্যস্ত হয়েছেন।

কিন্তু রাত্রিবেলা একলা ঘরে আয়নার সামনে ?

সেদিন এক তরুণ আমেরিকান লেখকের একটা ছোট গল্প পড়ছিলাম···বল-নাচ থেকে গভীর রাত্রিতে বাড়ি ফিরে এসে লেডি বারবারা অর্ধ-অচেতন অবস্থায় চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

বাঁধানো দাঁতের পাটি

সকালে তাঁর পরিচারিকা এসে দেখলো তাঁর মৃতদেহ চেয়ারে পড়ে আছে। মৃতা লেডী বারবারার হাতে তাঁর বাঁধানো দাঁতের পাটি···গতরাতের বল-নাচে নৃত্যসঙ্গী তরুণকে চুম্বন করবার সময়

তাঁর বাঁধানো দাঁতের পাটি স্থানচ্যুত হয়ে বেরিয়ে আসে…সে 'শক্' তিনি সহ্য করতে পারলেন না।

বার্ধক্যকে লুকিয়ে বৃদ্ধত্বকে অপমান করে কি লাভ?

সগৌরবে বুড়ো হওয়া যায়…সেকথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি।

যৌবন আসে রাজ-সমারোহে। বিজয়ীর মতন। দাতা সে।

বার্ধক্য আসে নিশীথ-চোরের মতন—অতর্কিতে, নিঃশব্দে। নিমেষে অপহরণ করে নিয়ে যায় যৌবনের উদ্বৃত্ত সমস্ত সঞ্চয়।

যৌবনের রাতে পাশে জাগে অবগুণ্ঠনবতী সহচরী। জীবন।

বার্ধক্যের রাতে মাথার শিয়রে এসে দাঁড়ায় কালো ছায়ামূর্তি। মৃত্যু।

লুণ্ঠিত-সঞ্চয় রিক্ত মানুষ ভীত হয়ে ওঠে। আর সময় নেই…

পুরাকালে ভাইকিংরা যখন বুঝতে পারতো পেশীতে স্নায়ুতে এসেছে বার্ধক্য…সমুদ্র-তরঙ্গের সঙ্গে যোঝবার শক্তি শিথিল হয়ে এসেছে, তারা আর দেরি করতো না। কোন এক দুরন্ত ঝড়ের রাতে ছোট্ট ভেলা নিয়ে একা সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো…আর ফিরে আসতো না।

ভাইকিংদের প্রতিনিধি আমাদের মধ্যে আর নেই।

আদিম আরণ্যক মানুষের সমাজে বৃদ্ধ হওয়া ছিল চরম অভিশাপ…এই অভিশাপের ছায়া আজও বার্ধক্যকে অনুসরণ করে চলেছে।

সেদিন মানুষ ছিল শিকারী। যেদিন তার সামনে থেকে শিকার অক্ষত চলে যেতো, তার হাতের নিক্ষিপ্ত বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট

হতো, তাকে সরে দাঁড়াতে হতো···শিকারের অধিকার তার চলে যেতো···তার জায়গায় অন্য লোক আসতো···মুড়ির মতন, আবর্জনার মতন তাকে পড়ে থাকতে হতো।

কিপলিঙ তাঁর অমর অরণ্য-কাহিনীতে বার্ধক্যের সেই চেহারাই এঁকেছেন। নেকড়েদের দলপতি একেলা। একদিন তার ভয়ে অরণ্য কাঁপতো, তার দশ হাতের মধ্যে কোন নেকড়ে যুবক আসতে পেতো না। একদিন একেলা হরিণ-বাচ্ছাকে ধরতে গিয়ে পারলো না, তরুণ নেকড়েরা লক্ষ্য করলো। পর পর আরও দুদিন সেই ব্যাপার ঘটলো। অরণ্যে প্রচারিত হয়ে গেল, একেলা বুড়ো হয়ে গিয়েছে। যার ভয়ে অরণ্য কাঁপতো, সেই একেলা ভীত হয়ে তার বিবরে বসে কাঁপে···সে জানে একদিন অতর্কিতে তরুণ নেকড়েরা এসে তাকে মেরে ফেলবে···অরণ্যের অমোঘ নিয়ম, বৃদ্ধকে সরে যেতে হবে!

অরণ্য থেকে মানুষের সমাজ খুব বেশী দূরে নয়।

বার্ধক্য সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মন্‌টেইন্‌ দুটো ছোট গল্প বলেছেন···একান্ত ট্রাজিক।

বুড়ো বাপ অবাক্‌ হয়ে দেখছে, তরুণ পুত্র একটা পরিত্যক্ত কাঠের টুকরো নিয়ে একমনে কি একটা তৈরি করছে। বাপ জিজ্ঞাসা করে, অমন করে একমনে কি তৈরি করছো?

পুত্র কাজ করতে করতে নিস্পৃহভাবে বলে, একটা কাঠের বাটি তৈরি করছি তোমার জন্যে···এবার থেকে এই কাঠের বাটিতেই তোমার খাবার দেওয়া হবে!

দু নম্বর গল্প···

বুড়ো বাপের ওপর রেগে গিয়ে উপযুক্ত ছেলে বাপের চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে চলেছে···

দরজার ওপর এসে পড়তেই বুড়ো বাপ চিৎকার করে ওঠে,

ব্যস! আর নয়! আমার বাবাকে এই পর্যন্তই আমি টেনে এনেছিলাম!

কাল্পনিক গল্প মনে হচ্ছে?

বাস্তব ঘটনা এর চেয়েও ট্রাজিক…এক একটা ঐতিহাসিক রাজবংশের পাতা খুলে দেখুন…আগ্রা দুর্গে বন্দী বৃদ্ধ শাজাহানের কান্না আর প্রতিদিনের জীবনের নামহীন গুঁইরামের বৃদ্ধ বাপের কান্নার কোন তফাত নেই।

বিজ্ঞান বলে, সৃষ্টির আদিতে এই পৃথিবীর কাদামাটিতে আদিম আলো, জল, হাওয়া আর মাটির মিশ্রণে কোন্ এক অজ্ঞেয় বিচিত্র উপায়ে জগতে প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব হয়… অ্যামিবা…চোখে দেখা যায় না এত ছোট, একটি মাত্র যেকা… যোনিহীন…আপনা থেকে নিজের দেহকে দু'টুকরো করে তারা বেড়ে চলে…

একমাত্র তারাই বুড়ো হয় না,…তাছাড়া আর যাতেই প্রাণ আছে, তা কালধর্মে বুড়ো হবেই।

একটি অপরাহ্নের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আলোর পোকা জন্মালো, প্রেয়সীর পেছনে উন্মাদ হয়ে ছুটলো, দিনের আলো নিবতে না নিবতেই ফুরিয়ে গেল তার একটি অপরাহ্নের আয়ু।

অথচ কচ্ছপ বেঁচে আছে দুশো বছর ধরে।

একদিন মানুষের যৌবনের মেয়াদ ছিল গড়পড়তা চল্লিশ বছর পর্যন্ত। বিজ্ঞানের বহু চেষ্টা। ফলে সেখানে মানুষের যৌবনের মেয়াদ গড়পড়তা আরও দশ বছর বেড়েছে।

কিন্তু তারপর?

তারপর থেকেই নিঃশব্দে গোপনে চলতে থাকে ভাঙন। তখন রাত্রির অন্ধকারে ভেঙে ভেঙে পড়ে নদীর পাড়।

পারতপক্ষে আজকের মানুষ স্বীকার করতে চায় না সে বুড়ো হচ্ছে। কঠিন অসুখের ব্যতিক্রম ছাড়া এত নিঃশব্দে এত ছন্দমাফিক এই পরিবর্তন আসে যে নিজের চোখে তা ধরাও পড়ে না। সব হারাবার ভয়ে সে জোর করে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সব কিছুকেই। এক ধরনের বুড়ো আছেন, বুড়ো বললে যাঁরা রেগে যান। আমেরিকায় সিনেমা-মহলে একটা কথা চলিত আছে; প্রত্যেক অভিনেত্রী ঊনত্রিশ বছরে এসে আর বাড়েন না, ক্রমান্বয়ে ন'-দশ বছর ধরে তাঁরা ঊনত্রিশের ঘরেই থাকেন।

তাঁদের আতঙ্ক বোঝা যায়। কেন না, বয়স ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে শিল্পী-জীবনের অকস্মাৎ অপমৃত্যু।

আফ্রিকার কোন কোন বন্য অধিবাসীদের মধ্যে এখনও আছে এই বার্ধক্যের আতঙ্ক, কেন না বার্ধক্যের অপরাধে সেখানে নিতে হয় মৃত্যুদণ্ড। লিভিংস্টোনকে খুঁজতে যে-সব পর্যটক আফ্রিকার বুনোদের মধ্যে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে একজন খ্রীষ্টান মিশনারি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বুনোদের এক বৃদ্ধ দলপতির পরিচয় হয়। রাত্রিতে গোপনে মিশনারির তাঁবুতে এসে সেই বৃদ্ধ দলপতি নতজানু হয়ে ভিক্ষা করে, আমি শুনেছি তোমাদের কাছে এমন তেল আছে, যা চুলে মাখলে সাদা চুল কালো হয়ে যায়। দয়া করে যদি আমাকে খানিকটা সেই তেল দাও!

সামান্য চুলের কলপের জন্যে বৃদ্ধ দলপতির সেই কাতর প্রার্থনার আড়ালে ছিল মৃত্যু আতঙ্ক! তার মাথার চুল সাদা হয়ে গেলেই তার সব যাবে!

তাই অবাঞ্ছিত ভিখারীর মতন বার্ধক্য এসে দাঁড়ালেই মানুষ বলে, এ দরজায় নয়, অন্য দরজায় দেখ!

কিন্তু খালি হাতে ফিরে যাবে এমন ভিখারী বার্ধক্য নয়।

সরকারী অফিসের পেনশনের খাতার মতন পৃথিবী খাতা খুলে বসে আছে, বুড়োদের বাতিল করে দেবার জন্যে···বিনা পেনশনে !

দক্ষিণ সমুদ্রে কোন কোন দ্বীপে বুড়োদের বাতিল করবার একটা বিচিত্র পদ্ধতি আছে। বুড়ো হয়ে গিয়েছে বলে যাদের ওপর সন্দেহ হয়, তাদের একটা পরীক্ষা দিতে হয়। সমুদ্রের ধারে একটা লম্বা নারকেল গাছ ঠিক করা হয়। বুড়ো বলে যাকে সন্দেহ করা হয়, তাকে সেই নারকেল গাছের মাথায় গিয়ে উঠতে হয়। তারপর দশবারোজন জোয়ান মিলে একসঙ্গে নীচে থেকে সেই নারকেল গাছটাকে জোরে নাড়া দিতে থাকে। সেই নাড়া খেয়ে যে গাছ থেকে পড়ে যায় না, সে-ই পরীক্ষায় পাশ করে, তার এখনও বেঁচে থাকবার অধিকার আছে। আর সেই নাড়া খেয়ে গাছের ওপর থেকে যে পড়ে যায়, সে তো চিরকালের মতনই পড়ে যায় !

সভ্য সমাজে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা বর্বরতা, কিন্তু এই নারকেল গাছটি নানা ছদ্মরূপে সভ্য সমাজেও আছে। বার্ধক্যকে যাঁরা অস্বীকার করতে চান, তাঁদের এই রকম এক একটি নারকেল গাছ আছে যার ওপর চড়লে আর তাঁরা নামতে পারেন না। এই নারকেল গাছে চড়া তাঁদের কাল হয়।

• এক ধরনের বৃদ্ধের কাছে তরুণী নারী হলো এই নারকেল গাছ। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' এই নিরীহ কথা কয়টির ভেতরে লুকিয়ে আছে সেই নারকেল গাছ। বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক সাতুব্রিয়াঁ তাই বলেছিলেন, "জীবনে যাঁরা বহু নারীর সঙ্গ উপভোগ করে এসেছেন, বার্ধক্যে এসেও তাঁরা তেমনি নারীসঙ্গ কামনা করবেন, এইটেই হলো তাঁদের শাস্তি।" এ শাস্তি যে কি তীব্র, কি মর্মান্তিক হতে পারে বালজাকের শেষজীবন তার উদাহরণ। যে বালজাক নব নব মানুষের চরিত্র নিয়ে উপন্যাসের ভেতর দিয়ে এ যুগের

মহাভারত রচনা করতে গিয়েছিলেন, তিনি নিজেকেই শুধু বুঝতে পারেননি…তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তরুণী প্রেমিকার চিত্ত জয়ের ব্যর্থ চেষ্টায় নিজের জীবনকে ভেঙে চুরমার করে ফেললেন। এই মর্মান্তিক নিঃশব্দ ট্রাজেডি আজকের ইনডাস্ট্রিয়াল যুগের বহু ধনী বৃদ্ধের আপাত মনোরম জীবনের আড়ালে নিঃশব্দে আগুনের শিখার মতন জ্বলে। দি ব্লু অ্যাঞ্জেল (The Blue Angel) উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন বা যাঁরা ছায়াচিত্রে সেই ছবি দেখেছেন, প্রেমগ্রস্ত বৃদ্ধ অধ্যাপকের শোচনীয় ট্রাজেডি তাঁরা ভুলতে পারেন না, দেশের বরেণ্য অধ্যাপক বৃদ্ধবয়সে অর্ধ-উন্মাদ অবস্থায় থিয়েটারে প্রোগ্রাম বিক্রি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তার কারণ তিনি যাকে ভালবাসেন সেই নারী সেই থিয়েটারে প্রধানা অভিনেত্রী, প্রোগ্রাম বিক্রির ছলে তাকে তো অন্ততঃ দেখতে পাবেন!

বার্ধক্যে যে যৌবন-ধর্মকে আঁকড়ে থাকতে চায়, তাকে নারকেল গাছ থেকে পড়তেই হবে!

ঠিক তেমনি, রাজনীতিক যখন বুড়ো হন, আসনের মোহ তাঁকে এমনি পেয়ে বসে যে আসন ছাড়ার ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পান না, তাঁর নারকেল গাছ আসে জেনারেল ইলেকশনের রূপে। যেমন এসেছিল চার্চিলএর। যে চার্চিল তাঁর দেশের হয়ে অতবড় যুদ্ধ জিতলেন, পরের দিনই ইংলণ্ডের জনমত তাঁকে নারকেল গাছ নাড়া দিয়ে ফেলে দিল।

যে দেশে জনমত এখনও গড়ে ওঠেনি, সেখানে যাঁরা আসন আঁকড়ে পড়ে থাকেন, সেই আসনই হয় তাঁদের সমাধি।

ব্লটিং কাগজ যেমন জল চুষে নেয়, তেমনি সেই আসনই শুষে নেয় তাঁদের অতীত কীর্তির স্মৃতি পর্যন্ত।

নিজের হাতে নিজের কীর্তিকে পুড়িয়ে ছাই করে তবে তাঁরা চিতায় ওঠেন।

স্বেচ্ছায় আসন ছেড়ে সরে দাঁড়ানোর একটা মহত্ত্ব আছে, একটা ঐশ্বর্য আছে, একটা সৌন্দর্য আছে।

সেই হলো বার্ধক্যের সৌন্দর্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষ সেই সৌন্দর্যকে জানতো।

পুত্র আজ উপযুক্ত হয়েছে।

সিংহাসন থেকে স্বেচ্ছায় নেমে আসে পিতা···আনন্দে যৌবনের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে বার্ধক্য বিদায় নেয়।

বীরের মতন সে প্রবেশ করে নতুন জীবনে।

যৌবনের রাজ্যে যেদিন সে প্রবেশ করেছিল, সেদিন ছিল তার অজানার আনন্দ···রোমকূপে রোমকূপে ছিল অবগুণ্ঠনবতীর অবগুণ্ঠন মোচনের আনন্দ।

আজ সে প্রবেশ করতে চলেছে বার্ধক্যের অরণ্যে···আজ তার সহায় তার অভিজ্ঞতা···অবগুণ্ঠন মোচন করে জীবনকে সে দেখেছে···একি কম কথা?

বুড়ো হতে জানলে, বার্ধক্যেরও আছে শোভা···

বার্ধক্যেরও আছে রূপ এবং সে-রূপ আঁকবার জন্যে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ স্থপতির দরকার।

জীবনে যা কিছু সুন্দর জিনিস দেখেছি, রূপের মৃগতৃষ্ণিকায় যা কিছু রূপ দেখেছি, সব ম্লান করে স্মৃতিতে জেগে আছে দুই বৃদ্ধের রূপ!

তখন আলীপুর জু-গার্ডেনের পরিচালক হলেন মিঃ বসু···ডক্টর কালিদাস নাগের মামা···মিঃ বসুর কন্যার বিবাহ···ডাঃ নাগের পেছনে পেছনে আমরা কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকও ঢুকে পড়েছি···

যাকে বলে রীতিমতন ঘটার বিয়ে···কলকাতার বাছাই-করা সম্ভ্রান্ত ঘরের প্রতিনিধিরা এসেছেন···আর এসেছেন বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে বাঙলার দুই বৃদ্ধ···রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃতলাল বসু।

চারদিকে আলো আর রূপ···চারদিকে সুবেশা সুন্দরী নারী

…তার মধ্যে দোতলায় সিড়ির মাথা থেকে পাশাপাশি হাতে হাত ধরে নামছেন দুই অতিবৃদ্ধ…রবীন্দ্রনাথ আর অমৃতলাল।

নীচে থেকে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে আমরা সেই অপরূপ দুই দীর্ঘ শুভ্র মূর্তির দিকে চেয়ে আছি…রবীন্দ্রনাথের অঙ্গে পাতলা ঘি-রঙের পোশাক …অমৃত বোসের অঙ্গে দুগ্ধশুভ্র সাদা পোশাক…নিখুঁত…

সমস্ত আলো নিজেদের শুভ্র কেশে, সুদীর্ঘ দেহে, সমুন্নত ভঙ্গীর সহজ মহিমায় শুষে নিয়ে রূপকথার কল্পলোক থেকে যেন ধীরে নেমে এলো বার্ধক্যহীন ধূম্ররেখাহীন দুই জ্যোতির্শিখা…

সে সৌন্দর্যের জ্যোতিতে ম্লান হয়ে গেল তরুণীদের দেহ-দীপ-শিখা…

যৌবনের রূপ দেহের রূপ…

বার্ধক্যের রূপ জীবনের ভেতরকার রূপ…

একটা প্রসাধনের জিনিস, আর একটা সাধনের জিনিস…

রাত বারোটায় বার-বাড়ির আলো সব নিবে যায়…

তখন ঘরে অন্দরমহলে জ্বলে নীল আলো…

বার্ধক্য সেই নীল আলো।

একটা বয়সের পর দেহের ভেতরকার গ্রন্থিগুলোর রস আপনা থেকে শুকিয়ে আসে…

লালসার কামনা ঠিক থাকে, কিন্তু লালসা উপভোগ করবার যন্ত্রগুলো বিকল হয়ে যায়…

প্রাচীন সভ্যতা তাই মানুষকে শিখিয়েছিল, একটা বয়সের পর লালসাকে সংযত করতে…

আজকের মানুষ তার বৈজ্ঞানিকদের বলছে, পশুদের গ্রন্থি সংযোগ করে আমার শুকিয়ে আসা গ্রন্থিগুলোকে বাঁচাও!

জরাগ্রস্ত যযাতি তার পুত্রের কাছে আবার যৌবন ভিক্ষা করছে।

বৈজ্ঞানিক ভরোনফ আর তাঁর শিষ্যরা এই নিয়ে বহু গবেষণা করছেন। তাঁরা যতটুকু কৃতকার্য হয়েছেন, তাতে কি লাভ ?

সত্তর বছর পর্যন্ত গ্রন্থিরা যে-সহায়তা করেছে, যে জিনিস ভোগ করতে দিয়েছে, যদি আরও সত্তর বছর তারা সেই সহায়তাই করতে পারে, নতুন কিছু জিনিস তারা ভোগ করতে দিতে পারে ? সেই তো একই তরকারি ঘুরে ঘুরে আসবে !

দুঘণ্টা সিনেমা দেখে আমরা খুশী হয়ে চলে আসি। কিন্তু কোথাও যদি সারারাত সিনেমা হয়, আর প্রত্যেক দুঘণ্টা অন্তর সেই একই ছবি যদি ঘুরে ঘুরে আসে, কেউ কি তা দেখবার জন্যে সারারাত বসে থাকতে পারে ?

পুনরাবৃত্তির আতঙ্কে মন তখন চিৎকার করে উঠবে, আমাকে ছেড়ে দাও, একটু বাইরে যেতে দাও !

আজকের সভ্যতা বার্ধক্যকে ভয় করে।

প্রাচীন সভ্যতা বার্ধক্যকে আনন্দে স্বীকার করতো। তাঁরা সগৌরবে বুড়ো হতে জানতেন।

দান্তে তাঁর অমর-কাব্যে যখন দেবদূতের সঙ্গে নরকের দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন, তখন দেখেন নরকের দরজার ওপর জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা, সব আশা মন থেকে নির্মূল করে এই দরজা দিয়ে ঢোকো !

অনেকের বিশ্বাস, বার্ধক্যের প্রবেশদ্বারেও সেই সতর্কবাণী লেখা !

তাই পঞ্চাশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র ভয় আর হতাশা তাকে পেয়ে বসে। জার্মান ভাষায় এই বিচিত্র অনুভূতির একটা প্রতিশব্দ আছে Torschlusspanik. গভীর রাত্রি হয়ে এসেছে, পার্ক থেকে সবাই চলে গিয়েছে, হঠাৎ দেখি অন্ধকারে আমি একা বসে আছি, বেরোবার দরজাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বিখ্যাত ফরাসী রোমান্টিক সাহিত্যিক Stendhal পঞ্চাশ বছরে

পা দেবার মুখে তাঁর ট্রাউজারের বেল্‌টে লিখে রেখেছিলেন, হায়, আর দুদিন বাদেই বুড়ো হয়ে যাবো!

এরা চায়, জীবন হোক অবিচ্ছেদ ভোগের রাত্রি! তাই বার্ধক্যকে এরা ভয় করে।

কিন্তু বার্ধক্যের আর একটা চেহারা আছে। ষাট বছর বয়সে ব্রাউনিঙ্‌ তাঁর প্রিয়তমাকে উদ্দেশ করে লিখলেন,

Oh Love ! Grow old with me,
The best is yet to be !

—ওগো প্রিয়তমা, তুমি আর আমি একসঙ্গে বুড়ো হবো!
সুধার পাত্র এখনও সামনে রয়েছে বাকী!

প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার রসায়ন যে শিখেছে, কোন বার্ধক্য তাকে শুষ্ক করতে পারে না।

যৌবনে প্রেম যতখানি সত্য, যতখানি গভীর হতে পারে, বার্ধক্যও ঠিক ততখানি সত্য, ততখানি গভীর হতে পারে। হয়তো যৌবনের চেয়ে বেশী সত্য হতে পারে। কারণ দেহের প্রচণ্ড ঘুষকে এড়িয়ে তখন সে সব সন্দেহের অতীত হয়।

ম্যাদাম রেকামিয়ে আর সাতুব্রিয়ঁার প্রেম ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তখন তাঁরা দুজনেই অশীতিপর বৃদ্ধ। ম্যাদাম চোখে আর দেখতে পান না, একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন··· আর সাতুব্রিয়ঁা নড়তে চড়তে পর্যন্ত পারেন না, পক্ষাঘাতে সারা শরীর অবশ হয়ে গিয়েছে। সেই সময় একদিন ভিক্টর হুগো তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

হুগো লিখছেন, প্রতিদিন ঠিক ঘড়িতে যখন তিনটে বাজতো, একজন চাকর এসে সাতুব্রিয়ঁাকে চাকাওয়ালা চেয়ারে ম্যাদাম রেকামিয়ের ঘরে তাঁর বিছানার শিয়রে নিয়ে আসতো। চেয়ারের শব্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাদাম ব্যাকুল হয়ে হাত বাড়াতেন··· একজন চোখে দেখতে পান না, আর একজনের নেই স্পর্শের অনুভূতি

…তবু তাঁদের দুজনের হাত যখন এক হয়ে মিলতো, মৃত্যু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো।…

ডিসরেলি তখন অতি-বৃদ্ধ। তখন লেডি ব্রার্ডফোর্ডের সঙ্গে তাঁর বাইরে কোন সম্পর্ক নেই, এমন কি বাক্যালাপও নেই। তবুও প্রতিরাত্রে ডিসরেলি নৈশ ভোজসভায় ক্লান্ত দেহকে টেনে নিয়ে যেতেন, দূর থেকে লেডি ব্রার্ডফোর্ডকে দেখে ফিরে আসতেন।

বার্ধক্যেও এই অনুরাগের তীব্রতা সম্ভব।

তবে ডক্টর ভরোনফের গ্রন্থি-চিকিৎসার ওপর এই অনুরাগের তীব্রতা নির্ভর করে না।

অভিনয়ের শেষে অভিনেতা যেভাবে রঙ্গমঞ্চ থেকে exit নেয়, তার ওপর তার সমগ্র অভিনয়ের কৃতিত্ব নির্ভর করে।

অভিনয়ে এই exit-এর লগ্নটা বড় দামী।

জীবন-মঞ্চের অভিনয়েও exit-এর শেষ লগ্নটা একান্ত দামী… এত দামী যে সেই লগ্নটির পরিচয়ে সমগ্র জীবনের পরিচয় নির্ভর করে।

বার্ধক্য নিষ্ক্রিয় পঙ্গুতার মরুভূমি নয়, বার্ধক্য হলো সেই সুনিশ্চিত শেষ লগ্নের প্রস্তুতি।

জীবন যদি সংগীত হয়। বার্ধক্য হলো সেই সংগীতেরই সুর-সংগত সমাপ্তি। ইওরোপীয় সংগীতে যাকে বলে finale.

এই শেষ অংশে এসে যদি কণ্ঠ বেসুরো হয়ে ফেটে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে সব গানটাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

জীবনের সমস্ত পরাজয়ের মধ্যে সেণ্ট হেলেনার নিষ্করুণ নির্বাসনে নেপোলিয়নের জীবনে যখন এলো অন্তিম মুহূর্ত, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে সেনাপতি তার শেষ আদেশ ঘোষণা করলো, France …army…head of the army!

সমস্ত পরাজয় সত্ত্বেও সেই শেষ উক্তি জীবনকে সম্পূর্ণ করে গেল।

বার্ধক্য হলো জীবনকে সম্পূর্ণ করবার সাধনা।

বার্ধক্যের বহু ত্রুটি আছে কিন্তু যিনি বুড়ো হতে জানেন তিনি সে সব ত্রুটির ওপরে উঠতে পারেন।

বুড়িয়ে যাওয়া আর বুড়ো হওয়া এক জিনিস নয়।

ইংলণ্ডের ছোট্ট একটা গ্রাম। সারা রাত ধরে, সারা দিন ধরে বরফ পড়ছে…

বরফে পথ-ঘাট ঢেকে গিয়েছে…ঢেকে গিয়েছে গাছের পাতা…

পথে জন-প্রাণী নেই…

রুদ্ধ-বাতায়ন ঘরে গ্রামবাসীরা আগুন পোয়াচ্ছে…

লাঠি ঠুকে ঠুকে বরফের ভেতর পথ খুঁজে এক বৃদ্ধ এগিয়ে আসেন…

একমুখ সাদা দাড়ির ওপর গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার এসে জমে গিয়েছে…

বৃদ্ধ এদিক-ওদিক চেয়ে কি যেন খোঁজেন…

তাঁর ভঙ্গী দেখলে বোঝা যায়, পথ-ঘাট তাঁর জানা নেই…

হঠাৎ কিছু দূরে গিয়ে নজরে পড়ে, গাঁয়ের ছোট্ট গির্জা…

বৃদ্ধের চোখ জ্বলে ওঠে, এই গির্জাই তিনি খুঁজছিলেন…

ধীরে গির্জার দিকে এগিয়ে আসেন…

অতি সন্তর্পণে গির্জায় ওঠবার সিঁড়ির কাছে নতজানু হন…

সিঁড়ির প্রত্যেকটি ধাপ চুম্বন করে দরজার সামনে উঠে আসেন…

মাথা হেঁট করে নীরবে প্রার্থনা করেন…বৃদ্ধের নাম রবার্ট ব্রাউনিং…

যৌবনে একদিন এই গির্জায় তাঁর প্রিয়তমার প্রথম দেখা পান…

আজ তিনি সাথীহারা একাকী…

তাই ইংলণ্ডে ফিরে এসে প্রথম এসেছেন এই স্মৃতির তীর্থে…

এই বার্ধক্যের মাথায় মহিমার রাজমুকুট।

একে নিয়ে কাব্য লেখা চলে, কাহিনী লেখা চলে।

———

ভাষার ভূত

বহু শতাব্দী আগে, একদিন গৌড়ের রাজা নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে দূর কাশ্মীরে পরিহাস-কেশবের মন্দির-দর্শনে যখন যান, তখন সম্পূর্ণ অতর্কিতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন—

সেই নিদারুণ সংবাদ যখন গৌড়ে এসে পৌঁছলো, গৌড়ের বীর সন্তানদের অন্তর সেই জঘন্য নৃশংসতায় সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।

কিন্তু কোথায় গৌড় আর কোথায় কাশ্মীর !

সেদিন গৌড় থেকে কাশ্মীর যাওয়া মানে, নিরুদ্দেশ যাত্রা করা···

তার ওপর কাশ্মীর সেদিন সম্পূর্ণ বিদেশী রাষ্ট্র···

কিন্ত এই নৃশংস মানবতার অপমান সেদিনকার বাঙালী বীরদের চঞ্চল করে তুললো···শতাব্দীর পর শতাব্দীর দাসত্বে তখন বাঙালীর মেরুদণ্ড বেঁকে যায়নি···

তার বর্বরতা সম্বন্ধে কাশ্মীরকে সচেতন করবার জন্যে মাত্র দশজন বাঙালী সেদিন তীর্থযাত্রীর বেশে কাশ্মীরের দিকে রওয়ানা হয়···

এবং ইতিহাস বলে, সেই দশজন বাঙালী সেদিন কাশ্মীরে গিয়ে সৈন্যরক্ষিত সেই দূর রাষ্ট্রে নিজেদের রক্ত দিয়ে সেই নৃশংস বর্বরতার যোগ্য প্রত্যুত্তর লিখে আসে···

সে আজ বহু বহু যুগ আগেকার কথা।

সে প্রাচীন যুগ আর নেই যেদিন তুচ্ছতম জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে মানুষ দোষী-নির্দোষ-নির্বিচারে আগুন দিয়ে ঘর পুড়িয়ে দিতো, অবলীলাক্রমে শিশু আর বৃদ্ধদের মেরে ফেলতো, নিরঙ্কুশচিত্তে নারী-ধর্ষণ করতো···

সেদিন এই সব বর্বর আচরণ বীরত্বের নামে অভিনন্দিত হতো···

বহু শতাব্দীর বহু তিক্ত বেদনার ফলে আজকের মানুষের কাছে বীরত্বের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছে।

গৃহদাহ, নারীধর্ষণ, শিশুহত্যা যুদ্ধের সময়েও চরমতম লজ্জার বিষয়···

বহু বেদনায় মানুষ-পশুকে আজ শিখতে হয়েছে, অন্যায়ের প্রতি-বিধান অন্যায়ে হয় না···

আজকের সভ্য মানুষের বীরত্বের চেহারা তাই আলাদা···

প্রতিমুহূর্ত্ত তার হৃদয় আর মস্তিষ্ককে সজাগ রাখতে হয়, যাতে বর্বরতার প্রতিবিধানে সে বর্বর না হয়ে ওঠে···

অরণ্য থেকে সে সত্যি দূরে এসেছে কি না, এইখানেই তার পরিচয়।

শত দুঃখ, শত দৈন্য, শত চারিত্রিক ত্রুটির মধ্যেও আজকের বাঙালী সেদিন নতুন করে তার মজ্জাগত শালীনতার প্রমাণ দিল, যেদিন আসামের অকারণ বর্বরতায় তার চিত্ত সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও প্রত্যুত্তরে সে বর্বর হতে কুণ্ঠিত হয়েছিল···

তার আগের দিন কলকাতা শহরে অন্য প্রদেশের লোকেরা ভীত আতঙ্কিত হয়ে যে সব কাণ্ড করেছেন, চোখের সামনে যখন তার কিছু কিছু দেখলাম, লজ্জায় আর বেদনায় সারারাত ঘুমুতে পারিনি···

পাশের ফ্লাট থেকে যখন প্রতিবাসী গুজরাটী ভদ্রলোক রাত্তিরে স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে চলে গেলেন, আমার হাতে চাবিটা দিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না, ছেলেমেয়েরা বড়ই নার্ভাস হয়ে পড়েছে··· অপরিসীম লজ্জায় চুপ করে রইলাম।

আশঙ্কায় প্রহর গুনেছি, বাঙালী কি ভুল করবে ?

পরের দিন হাসিমুখে যখন ভদ্রলোক স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ফিরে এলেন, তাঁর হাসির মধ্যে দেখলাম বাঙালীর সংস্কৃতির বিজয়-বার্ত্তা···

বাঙলাদেশ সুন্দরবন নয়···

চিকিৎসা-শাস্ত্রে বলে, জ্বর হলে দেহে যে উত্তাপ দেখা দেয়, সেটা দেহীর পক্ষে মহা-সুলক্ষণ !

এই উত্তাপের ভাষায় দেহ জানিয়ে দেয়, ভেতরে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে, দেহী সাবধান!

আসামের এই অমানুষিক উত্তপ্ততা আজ ইতিহাস-পুরুষের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে···ভারত-দেহে মারাত্মক ব্যাধির বীজ প্রবেশ করেছে···

অদূর অনাগতকালে যে বিভীষিকায় বহু বেদনালব্ধ ভারতের এই একত্ব আবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ভারতের ভাগ্য-বিধাতা আজ খণ্ডভাবে আসামের বর্বরতায় তা অগ্নি-অক্ষরে দেখিয়ে দিলেন···

আজ যদি আমরা তাকে স্থানীয় মুষ্টিমেয় লোকের অনাচার বলে চোখ বুজে থাকি, চোখ খুলে সেদিন আবার চেয়ে দেখবো, দেখবো ভারতবর্ষ আবার পরাধীন হয়ে গিয়েছে!

প্রাদেশিকতায় বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ, পরাধীন ভারতবর্ষ!

এই হলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় সত্য।

কিন্তু ভারতের একত্বকে গড়তে গিয়ে, আমরা কথামালার একচক্ষু হরিণের মতন কানা চোখটি যেদিকে রেখেছি, সেই দিক থেকেই আসবে ইতিহাসের মার···

ভারতের একত্বকে গড়বার জন্যে আমরা গদিতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মকে রেখেছি সরিয়ে···

কারণ, আমরা দেখেছি ধর্মের জন্যে যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, বিদ্বেষ···

তাই ধর্মকে সরিয়ে রেখে আমরা সেকিউল্যার স্টেট গড়লাম···

অক্ষুণ্ণ থাক ভারতের একত্ব···

ধর্ম অলক্ষ্যে হাসলেন।

যেদিকে কানা চোখটা রেখে নিশ্চিন্ত ছিলাম, সেই দিক থেকেই যদুবংশ-ধ্বংসকারী মুষলের মতন আজ মাথা তুলে উঠেছে, ভাষা, মাতৃ-ভাষার ম্যানিয়া···

ধর্মের উন্মাদনার চেয়ে প্রচণ্ডতর উন্মাদনা নিয়ে জেগে উঠছে এই মাতৃভাষার ম্যানিয়া।

এর মারাত্মকতা আরও ভয়াবহ। কারণ, এই মাতৃভাষার জন্ম-অধিকারের আড়ালে নির্লজ্জতম প্রাদেশিকতা অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে।

যেদিন আমরা স্বাদেশিকতার মিথ্যা মোহে ইংরেজী ভাষাকে সরিয়ে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার স্থান দিয়েছি, সেইদিনই এই মুষল জন্মগ্রহণ করেছে।

মূল ব্যাসদেবের মহাভারত থেকে এই সময় একবার মুষল-কাহিনীটি পড়ে নেওয়া দরকার।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে···বিজয়ীপক্ষের সহায়ক যদুবংশের বীরেরা দ্বারকায় ফিরে এসেছেন···

অনেকদিন যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক কষ্টে কেটেছে তাই আজ যুদ্ধশেষে তাঁরা অবসর উপভোগ করছেন মধু-পানে, কৌতুক-উৎসবে···

এমন সময় কয়েকজন বিশিষ্ট মুনি কৃষ্ণ-দর্শনে দ্বারকায় এলেন···

যদুবংশের বীরেরা তখন মধু-উৎসব করছিলেন, হঠাৎ একজনের মাথায় দুর্বুদ্ধি জেগে উঠলো, ভ্যাবাগঙ্গারাম মুনিদের সঙ্গে একটু রসিকতা করলে হয় না?

সুরার তড়িৎ-প্রভাবে বাসনা তখুনি বাস্তবে পরিণত হলো···

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব···যাদববীররা তাকে স্ত্রীলোকের পোশাকে সাজিয়ে, অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে, ঋষিদের সামনে নিয়ে এলো···

—প্রভু, এই নারী আমার স্ত্রী···গর্ভবতী···কিন্তু অনেক দিন হলো প্রসবের সময় হয়ে গিয়েছে, অথচ প্রসব-বেদনার কোন লক্ষণই নেই···আপনারা সর্বদর্শী, অনুগ্রহ করে যদি বলেন এই নারীর গর্ভে কি আছে?

সর্বজ্ঞ ঋষি সেই পরিহাসে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোদের পরিহাস সত্য হবে···এই গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করবে লৌহ-মুষল, আর সেই মুষলেই ধ্বংস হবে যদুবংশ!

মধুমত্ত যাদবেরা হেসে ওঠে।

কালক্রমে ঋষির অমোঘ অভিশাপে শাম্ব প্রচণ্ড বেদনায় এক লৌহ-মুষল প্রসব করলো।

এই সময় সমস্ত দ্বারকায় দ্বারকাবাসীরা আতঙ্কে দেখে দীর্ঘকায় কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ কালপুরুষের ছায়ামূর্তি প্রত্যেক গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ তাকে ধরতে গেলেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।···

চারদিকে দুর্লক্ষণ ফুটে উঠলো। নিদ্রিত যাদবেরা ঘুম থেকে উঠে দেখে, ঘুমের অচেতন অবস্থার মধ্যে কে তাদের নখ ও কেশ কেটে নিয়ে যায়···

সারসপাখিরা সহসা পেচকের আচরণ অনুকরণ করে—গৃহ-পালিত ছাগলের দল রাত্রিতে প্রহরে প্রহরে শৃগালের মতন কণ্ঠস্বরে ডেকে ডেকে ওঠে—কুক্কুরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে মার্জার-শাবক!

ব্রাহ্মণেরা সভয়ে দেখেন, ত্রয়োদশীতে এলো অমাবস্যা!

দ্বারকাবাসীরা ভীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন। সেখানে এসে তাঁরা শুনলেন, শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে সুদর্শন চক্র একদা সহসা আকাশে উড্ডীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, সারথি দারুকের চোখের সামনে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যরথের অশ্বরা চালকবিহীন অবস্থায় রথকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়, আর ফিরে আসেনি···

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীত যাদবেরা দ্বারকা ত্যাগ করে সমুদ্র-তীরবর্তী প্রভাসে চলে গেলেন। সেখানে প্রভাস-হ্রদের ধারে বসে তাঁরা অভিশপ্ত মুষলকে পাষাণে ঘষে ঘষে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন।

মুষলের অন্তর্ধানে যাদবেরা আবার আশ্বস্ত হলেন এবং যথা-রীতি আবার উৎসবে মত্ত হলেন···

একদিন মত্ত অবস্থায় যাদববীরেরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কে কতটা

বীরত্ব দেখিয়েছিল, কে কি অনাচার করেছিল, এই নিয়ে আলোচনা করতে করতে পরস্পর পরস্পরকে নিন্দা করতে শুরু করলো। নিন্দা ক্রমশঃ কুৎসিত ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হলো। অবশেষে এমন অবস্থা হলো, কখন কে কাকে আক্রমণ করছে তার কিছুই ঠিক রইলো না···যে যাকে সামনে পায় তাকেই নির্মমভাবে আক্রমণ করে!

প্রভাস-হ্রদের তটে সেই মুষলচূর্ণ থেকে হয়েছে লৌহবর্ণ লৌহ-কঠিন সব শর গাছ। সেই লৌহকঠিন শর হলো আজ আত্মঘাতের অস্ত্র। সেই বীভৎস আত্মকলহে যদুবংশের একটি বীরও জীবিত রইলো না।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল।

আজ আমাদের স্বকৃত ত্রুটির ফলে সেই লৌহ-মুষল আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে—নিরীহ ভাষার ছদ্মরূপে।

কৃষ্ণ-পিঙ্গলবর্ণ কালপুরুষের ছায়া প্রত্যেক প্রদেশের ওপর এসে পড়েছে ; ধরতে গেলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ধীরে সুস্থে ঘষে ঘষে মুষলকে নিরাকার করবার চেষ্টা করছি।

কিন্তু ইতিমধ্যে সেই চূর্ণ মুষল যে লৌহ-শর বনে পরিণত হচ্ছে, সে কথা ভাবতে মন চাইছে না।

আজ মাতৃভাষার দাবিতে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করবার যে মারাত্মক বুদ্ধি জেগেছে, তা কখনই জাগতে পারতো না, যদি আমরা ইংরেজীকে সরিয়ে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করবার সংকল্প আমাদের রাষ্ট্রবিধানে এত ঘটা করে এত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে না যেতাম!

এই এক সমস্যায় ভারতের অখণ্ডতা গড়ে ওঠবার আগেই তাতে ফাটল ধরেছে।

এবং এখনও আমরা ফাটলের ওপর চুনকাম করে নিজেদের বোঝাবার চেষ্টা করছি, সব ঠিক আছে—ধীরে সুস্থে কালক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমরা ভুল করেছি…ভারতের অখণ্ডতার জন্যে আমরা যেমন বলিষ্ঠভাবে ধর্মকে সরিয়ে রেখেছি, তেমনি বলিষ্ঠভাবে এই রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বদেশীকরণকেও সরিয়ে রাখা উচিত ছিল।

যেদিন ভারতবর্ষ যুগ-যুগ-সঞ্চিত পরাধীনতার ও প্রাদেশিকতার গ্লানি কাটিয়ে প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনের বাস্তবতায় ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে স্বীকার করতে শিখবে, সেদিন সম্ভব হবে অনুত্তেজিত চিত্তে এই রাষ্ট্রভাষার সমস্যাকে আলোচনা করা।

ততদিনে জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনে হিন্দী-সাহিত্যিকদের সাধনায় হিন্দীভাষাও ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হবার উপযোগিতা অর্জন করতে পারতো…

রাষ্ট্রের আদেশে পারিভাষিক অভিধান গড়া সম্ভব হতে পারে, কিন্তু পরিভাষাকে জীবনের গতি ও প্রাণ দিতে পারে একমাত্র সাহিত্য—এবং সে সাহিত্য কারখানার মতন তৈরি করা যায় না।

পরিভাষা যতই নিখুঁত হোক, তার কাঠের পা—কাঠের পা নিয়ে দায়ে পড়ে কোনরকমে চলাফেরা করা যায়—প্রতিমুহূর্তে তার ঠকঠক শব্দ স্মরণ করিয়ে দেয়, সে প্রাণহীন, গতিহীন,—সে জীবন নয়, জীবনের বিকৃতি—

পরিভাষাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় সাহিত্যিকের জন্যে। সে সাহিত্যিককে কোন রাষ্ট্রের প্রয়োজন মাফিক তৈরি করা যায় না…

তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতেই হবে…

ইতিমধ্যে যে ভাষা ঐতিহাসিক নিয়মে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষায় স্বাভাবিক ভাবে পরিণত হয়েছিল, স্বাদেশিকতার মিথ্যা মোহে স্বাধীন-ভারতের জীবনে সেই ইংরেজী ভাষাকে অস্বীকারের কোন প্রয়োজন ছিল না।

যে রাষ্ট্রবিধানে ইংরেজী ভাষাকে স্থানচ্যুত করবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, সেই রাষ্ট্রবিধান যাঁরা গড়েছিলেন, তাঁরা ইংরেজী ভাষাতেই তা গড়েছিলেন, পরে তা ভারতীয় ভাষায় অনূদিত করা হয়েছে···

এবং স্বাধীন-ভারতের শাসন-তন্ত্র নির্ধারণ করবার জন্যে যে রাষ্ট্রবিধান গড়ে তোলা হয়, তার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ দুই ইংরেজী-ভাষাভাষী দেশের রাষ্ট্রবিধান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে···

তাতে স্বাদেশিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, একথা আজ কোন স্বদেশ-প্রেমিকই ভাবেন না।

স্বাধীন হয়েও আমরা স্বেচ্ছায় ইংলণ্ডের রাজার নায়কত্বে কমন্‌-ওয়েলথ্‌-গোষ্ঠীর সদস্যরূপে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করেছি···

অথচ যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ভারতের অখণ্ডতা ঐতিহাসিক সত্য হয়ে উঠেছিল, তাকে বিদায় করবার জন্যে একেবারে তারিখ পর্যন্ত ঠিক করে ফেললাম—

এবং তাল সামলাতে না পেরে এখন তারিখ বদলে বদলে চলেছি···

এবং তার ফাঁকে ফাঁকে অনর্থ যা ঘটবার তা ঘটে চলেছে—তুঁষের আগুনের মতন এক তীব্র ভাষা-বৈরিতা প্রত্যেক প্রদেশের আপাত উদারতার আড়ালে ধিকিধিকি জ্বলছে।

ভারতের অখণ্ডতার অনিবার্য বিপ্লবরূপে আজ জেগে উঠেছে ভাষা-সমস্যা···

এবং এই মহা-সমস্যার সমাধানরূপে যা কিছু করা হচ্ছে, আমরা অন্তরে অন্তরে বুঝতে পারছি সে সমাধান সমস্যার অঙ্গকে স্পর্শই করছে না···

প্রদেশে প্রদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে মহম্মদ তোঘলকী পরিবর্তনের অস্থির অনিশ্চয়তায় শিক্ষার মেরুদণ্ডও ভেঙে পড়েছে···

আমরা মুষলকে ঘষে ঘষে নিরাকার করবার চেষ্টা করছি···

কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, সে আকার পরিবর্তন করে মারাত্মকভাবে বিস্তৃত হয়েই চলেছে।

ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখা আজ সত্যিকারের দুশ্চিন্তার বিষয়···

[illegible] ব্রিটিশ আমলের চেয়ার-টেবিল, আইন-আদালত, এমনকি ব্রিটিশের পরিত্যক্ত পেনসিল-কাটা ছুরিটি পর্যন্ত আমরা যে ভাবে সহজে গ্রহণ করেছি, তেমনি সহজে যদি রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে ইংরেজী যেমন ছিল তেমনি তাকে থাকতে দিতাম, তাহলে আজ এইরকম মারাত্মকভাবে ভাষা-সমস্যা কখনই জেগে উঠতো না—এবং এরকম শিক্ষার সংকটও দেখা দিত না।

তাতে বড়জোর কয়েকজন উৎকট স্বদেশপ্রেমিক খবরের কাগজের সম্পাদককে গরম গরম চিঠি লিখতেন—সে-চিঠিতে একটা প্রদেশ দূরে থাক এক আঁটি ঘাসও পুড়তো না!

ভারতের অখণ্ডতা বাস্তবে সত্য হবার আগে ইংরেজী ভাষাকে স্থানচ্যুত করে আমরা ভুল করেছি···

এই ভুলের একমাত্র সংশোধন হচ্ছে, এই ভুলকে স্বীকার করা!

সেই প্রকৃত কৃতী সেনাপতি, প্রয়োজনবোধে যিনি সৈন্যদের প্রত্যাবর্তন করিয়ে আনতে পারেন···

আমাদের পরম সৌভাগ্য আজ এই রাষ্ট্রের যিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনীতিক নন, তিনি শুধু একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতা নন্…

শিক্ষায় দীক্ষায় শালীনতায় তিনি আজ সত্যিকারের বিশ্ব-নাগরিক…তাঁর আছে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি, সাহিত্যিকের অনুভূতি, দার্শনিকের বোধ, তাঁর বয়স্ক দেহে আছে চির-নবীন প্রাণ, যে-প্রাণ আজও হিমালয়ের আকর্ষণে নন্দিত হয়ে ওঠে…

একমাত্র তিনিই পারেন এই প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে…

তাঁর অবর্তমানে, ভাবতে আতঙ্ক হয়, এই ভাষার সমস্যা ভারত-জোড়া দাবানলে পরিণত হবেই।

আজকে বিজ্ঞান যেমন বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তেমনি প্রচণ্ডবেগে এগিয়ে চলেছে মানুষের মন।

কুড়ি বছর আগে কম্যুনিজমের যে চেহারা ছিল, আজ আর তার সে চেহারা নেই…দশ বছর আগে নারীর স্বাতন্ত্র্যের যে রূপ ছিল, আজ আর তা নেই…পঞ্চাশ বছর আগে স্বদেশপ্রেমের যে চেহারা ছিল, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে হয়েছে তার পঞ্চাশ রূপান্তর।

আজকে মানুষের মনে যেখানে ঐতিহাসিক প্রভাবে বিশ্ববোধ জাগছে, সেখানে আপনা থেকেই স্বাদেশিকতার রূপান্তর ঘটছে।

এমন দিন আসবে, যেদিন স্বাদেশিকতার মধ্যে আর কোন উচ্ছ্বাসের উত্তাপ থাকবে না।

একদিন ছিল যেদিন ইংরেজের কোট-পাতলুন পরলে আমাদের স্বাদেশিকতা ক্ষুণ্ণ হতো…ঘটা করে মন্ত্র পড়ে আমরা বিদেশী কাপড় পুড়িয়েছি…আজ কোট-পাতলুন ভারতের স্বাভাবিক পোশাক হয়ে গিয়েছে…কারণ বৃহত্তর জগতের সেইটেই স্বাভাবিক পোশাক।

বিদেশীর যন্ত্র বলে একদিন এদেশের ব্রাহ্মণেরা রেলগাড়িতে চড়তো না, জাত যাবার ভয়ে…তারপর দায়ে পড়ে চড়তে লাগলো, কিন্তু গাড়িতে বসে কিছু খেতো না…আজ সেই সব ব্রাহ্মণদের পৌত্র-প্রপৌত্ররা আগে গাড়িতে উঠে খবর নেন গাড়ির সঙ্গে রেস্তোরাঁ গাড়ি আছে কিনা!

এমন একদিন ছিল যেদিন বিলেতে গেলে ভারতীয়দের জাতিচ্যুত হতে হতো, আজ সে সমাজবোধ কোথায়?

পোশাকের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যখন আমরা বলি আর জাতীয়তার নাড়ীর যোগ নেই…তখন আমরা এই কথাই বলি, দরকার হলে অফিসে কোট-পাতলুন পরে যাব, আবার বিবাহসভায় যখন যাব তখন শান্তিপুরী ধুতি-চাদর পরবো…

তেমনি দুশো বছরের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টায় আজ জাতীয়তার ঊর্ধ্বে ইংরেজী ভাষা প্রত্যেক ভারতবাসীর দ্বিতীয় ভাষারূপে পরিণত হয়েছে…

এবং এই ইংরেজী ভাষাই ভারতের এক-জাতীয়তাকে সত্য করে তুলেছে।

ইংরেজী ভাষা এই বহু-প্রদেশে বহু-ভাষায় বিভক্ত মহাদেশে দুশো বছরের চেষ্টায় যেভাবে অখণ্ডতার চেতনাকে এনে দিয়েছে, দুহাজার বছরের ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কোন জিনিস সেভাবে ভারতের অখণ্ডতাকে সত্য ও জীবন্ত করতে পারেনি…

এত বড় ঐতিহাসিক সত্যকে কিসের জন্যে আমরা অস্বীকার করবো?

দুহাজার বছরের চেষ্টায় যে বাড়িটা তৈরী হয়েছে, কেন তাকে ভাঙতে যাচ্ছি?

ঐতিহাসিক সম্ভাবনার মধ্যে আর কোন জিনিস চোখে পড়ে না, যা এই ভারতের অখণ্ডতাকে আজ ধারণ করে থাকতে পারে!

ইংরেজের সংস্পর্শে এসে যে অমূল্য জিনিস আমরা পেয়েছি, তা হলো ইংরেজী ভাষা আর ইংরেজী সাহিত্য!

আর সব চেয়ে বড় কথা হলো, ইংরেজী ভাষা আজ শুধু ইংরেজের ভাষা নয়, এ ভাষা হলো বিশ্বের প্রয়োজনের ভাষা···বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা।

আজকের ভারতবর্ষ তার প্রয়োজনে যেমন আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের যন্ত্রপাতিকে গ্রহণ করেছে, তেমনি তার প্রয়োজনে সে গ্রহণ করবে বিশ্ব-চেতনাময় ইংরেজী ভাষাকে।

ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করলে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষার গতি ক্ষুণ্ণ হবে, এর চেয়ে ভুল চিন্তা আর কিছু নেই!

এটা আজ ঐতিহাসিক সত্য, ইংরেজী ভাষার বলিষ্ঠ সজীবতার সংস্পর্শে এসেই আজ বাঙলা ভাষা জগতের যে-কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার সমকক্ষ সাহিত্য সৃষ্টি করবার প্রেরণা পেয়েছে···

এবং ঠিক তেমনি সত্য যে, ভারতের যে সব প্রাদেশিক ভাষা আজও অশংবহুলতায় গতিহীন হয়ে পড়ে আছে, তাদের গতি ও মুক্তির জন্যেই প্রয়োজন ইংরেজী ভাষার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আরও একশো বছর ঘটা করে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পড়া হোক।

অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার গায়ে যে চর্বি জমে উঠেছে, অন্য বলিষ্ঠতর বিদ্যুন্ময় ভাষার সংযোগ ছাড়া সে চর্বি কিছুতেই গলবে না।

ইংরেজী ভাষা হলো আমাদের কাছে নিকটতম সহজলভ্য বিশ্ব-ভাষা।

একটা ভাষার সঙ্গে আত্মীয়তা হতে দীর্ঘ সময় লাগে।

দুশো বছর ধরে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে আমরা সেই আত্মীয়তা স্থাপন করেছি।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে ভারতের অন্য রাজনৈতিক নেতার যেখানে সব চেয়ে তফাত, সেটা হলো, নেহরু ইংরেজী ভাষা

যেভাবে বলতে পারেন ও লিখতে পারেন ভারতের আর কোন রাজনৈতিক নেতা তা পারেন না।

বক্তৃতা-সভায় স্বীকার না করলেও, আমি বলতে পারি, প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয় অন্তরের অন্তরতম স্থলে ইংরেজী ভাষাকে ভালবাসে, এবং আজও পর্যন্ত জনসাধারণ যে নেতা ইংরেজী বলতে পারেন, তাঁকেই স্বাভাবিক নেতা মনে করে !

একদল লোক আছেন, যাঁরা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও আড়ালে বলেন, আরও কিছুদিন ইংরেজের এদেশে থাকা দরকার ছিল।

তাঁরা ভুল বলেন কি ঠিক বলেন, তা নিয়ে তর্ক করে আজ তার কোন লাভ নেই, তবে একথা জোর করেই বলবো, আরও কিছুদিন ইরেজী ভাষার সাকরেদী আমাদের দরকার !

একথা স্বীকার করায় কোন লজ্জা নেই।

জাতীয়তার কোন গ্লানির সম্ভাবনা তাতে নেই।

এগিয়ে-পড়া ভারতের অখণ্ডতার একমাত্র সিমেণ্ট হলো, ইংরেজী ভাষা···

যথাস্থানে আবার তার অভিষেক হোক্ !

দূর হোক প্রদেশে প্রদেশে সেই কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ কালপুরুষের অতর্কিত নিশীথ অভিযান !

এই রচনা যখন লিখিত হয় তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু জীবিত ছিলেন।

বই-পড়া

একপাত্র সুরা, একখানি কবিতার বই, আর তুমি আমার পাশে, অরণ্য হয়ে উঠবে স্বর্গভূমি !

আপত্তি নেই ওমর খৈয়াম !

যদি এই তিনটি জিনিস একসঙ্গে নিয়ে তোমার অরণ্যকে তুমি স্বর্গে পরিণত করে থাক, আমরা বাধা দেবার কে ?

তুমি ভাগ্যবান, তুমি সাধক !

কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ, স্বর্গ-তৈরি-করার এই তিনটি জিনিস একসঙ্গে আমাদের ধাতে সয় না···

কবিতার বই হাতে করলে প্রিয়া অসন্তুষ্ট হয়···কাজলচোখে ঘনিয়ে আসে অভিমানের মেঘ···

সুরার মাত্রায় গোলমাল হয়ে যায় ছন্দের মাত্রা···

এ স্বর্গ-রচনা তখনি সম্ভব, যখন দুজনার আস্বাদন এক হয়ে যায় !

বড় দুর্লভ সে রতি-সঙ্গিনী ! বহু যুগ খুঁজে, বহু দেশ ঘুরে আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগে চীনদেশে এমনি একজোড়া স্বর্গ-রচনাকারীর সন্ধান পাই···

দুঃখের অরণ্যে বসে তারা সত্যি স্বর্গ রচনা করেছিল। কারণ স্বর্গ-রচনায় যে বাধা হতে পারতো সেই নারীই নিজের লেখায় সেই স্বর্গ-রচনার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন···

প্রাচীন চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি লিচিঙচাও তাঁর আত্মচরিতে সেই সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন।

সে আর আমি···

পালিয়ে দূর গ্রামে অরণ্যের ধারে একটা ছোট্ট বাড়িতে আছি···

শিন্‌দের অত্যাচারে যথাসর্বস্ব সব গিয়েছে···পয়সা-কড়ি কিছু নেই···কিন্তু একমাত্র সান্ত্বনা বইগুলো সব নিয়ে এসেছি···

সব দুঃখ, সব অভাব তারাই ভুলিয়ে রেখেছে···

একরাশ বই, সে আর আমি···আর কিসের দরকার ?

নিত্য নতুন খেলা তৈরি করি···

সারাদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় একপাত্র চা (একপাত্র সুরা ?)··· তার বেশী জোটে না···এমন দুর্লভ পাত্রকে কি হ্যাংলার মতন ঢকঢক করে খাওয়া যায় ?

গরম জলে চায়ের পাতা পড়তেই সুবাসে ঘর ভরে যায়···

দুটি পাত্র ঠিক করে রাখি···

তাকে ডাকি···

বল তো, এই কবিতার লাইনটি কোন্ বই-এ কত নম্বর পাতায় আছে ?

যার অনুমান ঠিক হবে, সেই চায়ের পাত্রে প্রথম চুমুক দেবে···

ও প্রায়ই হেরে যায়···

আমি হেসে চায়ের ভরা-পাত্রটি তুলে পরাজিতের মুখে ধরি···

ও হেসে ওঠে···

হাসির ছোঁয়াচে আমিও হেসে উঠি···

ভরা-পাত্র থেকে চা উপছে পড়ে যায়···

ওর জেদ বাড়ে···

বলে, আমি একটা কবিতা বলছি, তুমি বল তো এটা কোথায় আছে ?

খোলা জানলার ভেতর দিয়ে হঠাৎ দেখি, চাঁদটা বাইরে একেবারে সামনের গাছের মাথার ওপর এসেছে···

একটি পাত্র…একখানা বই…একটিমাত্র নারী…এখানে স্বর্গ-রচনা সম্ভব !

সুরার পাত্র বা নারী এখন থাক…

আমরা বই পড়ি কেন ?

অবাক্ হয়ো না বন্ধু, যদি বলি, আমরা বই পড়ি কারাগার থেকে মুক্ত হবার জন্যে !

আমরা প্রত্যেকে জন্মগ্রহণ করি একটা কারাগারের মধ্যে…স্থান আর কালের কারাগার…

বিপুলা পৃথ্বী আর নিরবধি কালের মধ্যে আমরা প্রত্যেকে পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্রতম অংশে এবং একটা নির্দিষ্ট কালে জন্মগ্রহণ করি…

আজ আমি জন্মগ্রহণ করেছি বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়…আমি জন্মে দেখেছি আমার জন্মাবার আগে সভ্য পৃথিবীর বয়স হয়ে গিয়েছে প্রায় সাত হাজার বছর…পাঁচিল-ঘেরা কারাগারের বাইরের পৃথিবীর মতন পড়ে আছে আমার অদেখা সেই সাত হাজার বছর…

আমি জন্মেছি বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙলাদেশের এক তুচ্ছ গ্রামে…সেই গ্রামের বাইরে পড়ে আছে অদেখা বিপুলা পৃথিবী…

স্থান আর কালের ছোট্ট কারাগারে আমি জন্মেছি বটে, কিন্তু স্নায়ুর প্রত্যেক রক্তকণায় নিয়ে এসেছি এই কারাগার থেকে মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষা…

আমার দেহের প্রত্যেক সেল্-এ আছে পাঁচিল-ঘেরা ছোট্ট জন্ম-সীমানার বাইরে বিপুলা পৃথিবীর দেশে দেশে নিজেকে বিস্তার করে দেখার বাসনা…তাই মানুষ তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে চায়, তাই নতুন নতুন দেশ দেখলে অকস্মাৎ আনন্দে তার মন ভরে ওঠে…তাই এক জায়গায় বেশীদিন থাকলে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে…

তেমনি মানুষ নির্দিষ্ট যে ছোট্ট সময়ের মধ্যে জন্মেছে, সে চায় সেই বর্তমানকালের কারা-প্রাচীর ভেঙে অতীত বহু শতাব্দীর মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে…

দেশ-পর্যটনের সঙ্গে সঙ্গে সে চায় কাল-পর্যটন…

এই দুই পর্যটন একমাত্র সম্ভব হয় বই-পড়ার মধ্যে দিয়ে…

বই না পড়ে দেশ-পর্যটন কতকটা সম্ভব হতে পারে কিন্তু কালের আকাশে উড়তে হলে গ্রন্থ-অভিযান ছাড়া উপায় নেই…

স্থান আর কালের কারাগার থেকে অনায়াসে আমাদের মুক্তি দিতে পারে বলেই বই-পড়ার পিপাসা…

এ-পিপাসা যার জাগেনি, বইএর পাতা যে খোলেনি, একপক্ষে সে নিশ্চিন্ত…কারণ তার ছোট্ট জগতের মধ্যে কোন অপরিচয়ের ধাঁধা নেই…

কিন্তু বইএর পাতা যাকে টেনেছে, নীড়ের সীমাবদ্ধতার শান্তি তার চলে গিয়েছে…

অকস্মাৎ তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে বিশ্বের বিরাট রূপ…

সাধারণের কাছ থেকে নিঃশব্দে সে কখন সরে যায়…

সাধারণ ক্ষমা করে না…পাগল বলে তার আড়ালে হাসে।

কিন্তু বই পড়ার নানান ধরন আছে…

অনেকে বই পড়েন বিছানায় শুয়ে, ঘুম আনবার জন্যে…সারা-দিনের পর রাত্রিতে বিছানায় শুতে যাবার সময় তাঁরা বইএর খোঁজ করেন এবং স্বভাবতঃই তাঁরা এমন বইএর খোঁজ করেন যাতে চোখের স্নায়ু ছাড়া মস্তিষ্কের আর কোন স্নায়ুর বিন্দুমাত্র উত্তেজনা না হয়… অধিকাংশ নাটক, নভেল ও গল্প এঁদের জন্যেই লেখা হয়…এবং পাঠক হিসেবে এঁদের সংখ্যাই বেশী। সেইজন্যে এই জাতীয় সাহিত্যের চাহিদাই বেশী…

এই জাতীয় সাহিত্যে আজ ইওরোপ আর আমেরিকার বইএর বাজার ভরতি…

ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল ভঙ্গীর একটা পাতলা নিয়ন শার্ট খুলে ফেললেই দেখা যাবে, এই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হলো, নর-নারীর যৌন-ব্যবহারের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বিচিত্র সুখপাঠ্য কাহিনী… কারণ ক্লান্ত দেহ আপনা থেকে যে জিনিস চায় সে হলো যৌন-রতি…

আজকের সাধারণ মানুষের দেহ ও মন ক্লান্ত ও অবসন্ন…একটা প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে সে ভীত…অসুখী……বাস্তব জীবনে বিলাসিতা করবার মতন তার অর্থ-সংগতি নেই…তাই তার একমাত্র আশ্রয় হলো এই সাহিত্য। চরিত্রহীনতার অপবাদ বাঁচিয়ে কম খরচে সেখানে সে যৌন-রতির পরিচিত স্বাদ বিনা আয়াসে গ্রহণ করতে পারে…

প্রমথ চৌধুরী বলতেন, ইওরোপে যা মরে যায়, ভূত হয়ে তা আমাদের ঘাড়ে চাপে…রাজনীতিতেও, সাহিত্যেও…

ইওরোপের এই সাহিত্য প্রেতমূর্তিতে আমাদের সাহিত্যে দেখা দিয়েছে…

নাটক, নভেল আর গল্প আজ সব দেশেই অধিকাংশ ক্লান্ত মানুষের শয্যার সঙ্গী…

মানুষ বারবনিতার কাছে যা চায়, আজ সাহিত্যের কাছে তাই চাইছে।

শোবার সময় যাঁরা বইএর খোঁজ করেন, তাঁদের সগোত্র অন্য বহু পাঠক আছেন…

একদল পাঠক আছেন, ট্রেনে চড়লেই যাদের বই-পড়ার কথা মনে পড়ে…ট্রেনের সময়টুকু তাঁরা অপব্যয় করতে চান না…তাঁদের জন্যেই সারা দেশ জুড়ে স্টেশনে স্টেশনে একটি কোম্পানি বইএর দোকান খুলে বসেছেন…

আবার এই ট্রেনেই আর এক ধরনের পাঠক দেখা যায়, তাঁরা নিজে বই কিনে পড়েন না কিন্তু পাশের যাত্রীর হাতে নতুন বই বা নতুন মাসিক-পত্রিকা দেখলেই তাঁদের পাঠ-স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে এবং বিনা দ্বিধায় বইএর মালিকের হাত থেকে বই বা কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করেন···
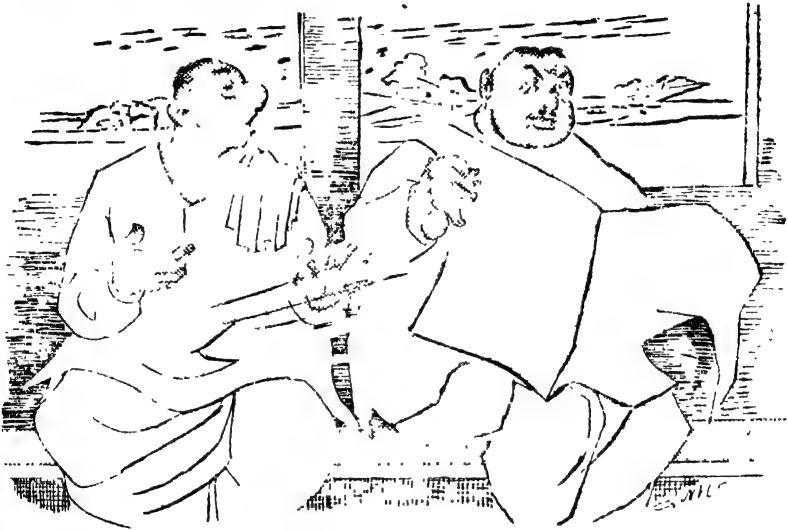
পাশের যাত্রীর হাতে মাসিক পত্রিকা

এই ট্রেন যদি লোকাল ট্রেন হয়, দেখা যাবে কামরার কোণ ঘেঁষে যে ভদ্রলোকটি বসলেন. তিনি ডেলি প্যাসেঞ্জার···কাঁধে ঝোলানো সুতীর ব্যাগে টিফিনের কৌটো আর পানের ডিবের সঙ্গে একখানি লাইব্রেরির বইও আছে···বইটি বার করে বাষট্টির পাতাটা খুলে ফেললেন, ট্রামের টিকিট দিয়ে সেই পাতাটা আগেই চিহ্নিত করে রেখেছিলেন···

সেই যে বইএ মাথা গুঁজলেন আর মাথা তোলেন না; অভ্যাসবশতঃ ট্রেন-থামার ধাক্কা থেকে বুঝতে পারেন নামবার স্টেশন এসে গিয়েছে। ট্রামের টিকিট দিয়ে পড়ার শেষ পাতাটা

চিহ্নিত করে রাখেন। আবার কাল সকালে ট্রেনে আসবার সময়...

আজকাল নারীশিক্ষার দ্রুত প্রসারের দরুন মেয়েদের মধ্যে পড়ার ঝোঁক খুব বেড়েছে এবং তাঁরা অধিকাংশই একনিষ্ঠ নভেল-পাঠক...আজকাল কোন্ লেখকের বই সব চেয়ে বেশী চলছে অর্থাৎ লেখকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী তার সঠিক খবর যে কোন ত্রয়োদশীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায়।

পাঠক হিসেবে এঁদের সকলের গাঁই-গোত্র প্রায় একই...

এঁরা ছাড়া আর এক শ্রেণীর ভিন্ন-গোত্রের পাঠক আছেন, তাঁরা মানসিক উন্নতির জন্যে পড়েন, পণ্ডা অর্থাৎ পাণ্ডিত্য অর্জন করবার জন্যে পড়েন...তাঁদের পড়া দেখে মানুষ ভয় খেয়ে যায় এবং সভয়ে তাঁদের এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে...

তাঁদের সব চেয়ে গৌরব হলো, পাঁচজন মানুষের সমাজে তাঁরা বড় গলা করে বলতে পারেন, শেক্‌স্‌পীয়ার! ও আমার সব পড়া আছে...! তাঁদের সামনে কোন গ্রন্থকার বা কোন বইএর উল্লেখ হলেই তাঁদের বলতে শোনা যাবে, ও বই কবে পড়েছি! আপনি পড়েননি এখনো?

এখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁরা বিলেত বা রাশিয়া ঘুরে এলে, বাড়ির রাঁধুনী বামুনকেও বিলেত বা রাশিয়ার কথা বলে শাসান...ট্রামে বা বাসে যেতে যেতে বাসসুদ্ধ লোককে জানিয়ে দেন, আমি যখন মস্কোতে ছিলাম...

বাসসুদ্ধ লোক চমকে তাঁর দিকে চায়...তেমনি এই জাতের পণ্ডিত পড়ুয়ারা স্থানে অস্থানে মানুষকে তাঁদের পড়ার প্রচণ্ডতায় চমকিয়ে দিতে চান...

এঁদের মধ্যে সত্যিকারের বড় পড়ুয়া আছেন, অনায়াসে যাঁরা প্যারাকে প্যারা মুখস্থ বলে যেতে পারেন...

কিন্তু এত পড়া সত্ত্বেও তাঁদের মন শুকনো...পড়ার পরিশ্রমে

এঁদের চোখেমুখে একটা শুকনো অবসাদ···বই বোঝা হয়ে তাঁদের ঘাড়ে চেপে থাকে, আলো হয়ে দেহমনকে আলোকিত করে না···

বইএর মধ্যে তাঁরা নির্জীব অক্ষরকেই দেখেন, অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে যে আলো থাকে, তার সন্ধান পান না···

তিনি বিদ্বান হতে পারেন কিন্তু রসিক নন্···

তিনি গ্রন্থ-কীট···গ্রন্থ-রসিক নন্···

কোনরকম বাধ্য-বাধকতার মধ্যে পড়া পড়াই নয়···

যে ছাত্র পরীক্ষায় পাস করবার জন্যে পড়ে, পড়া তার কাছে শাস্তি···তাই পরীক্ষার হল থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় পড়া-ভোলার শান্তি···

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, শেক্স্পীয়ারকে যদি বধ করতে চাও, শেক্স্পীয়ারকে স্কুল-কলেজের অবশ্যপাঠ্য করে দাও!

মধ্যযুগের ইওরোপে যখন পড়ার বাতিক জাগে, তখনকার পড়ুয়াদের আত্মনির্যাতনের অনেক গল্প আছে···রাত্রিতে পড়তে পড়তে যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে, তার জন্যে কেউ কেউ পায়ের কাছে লোহার শিক গরম করে রাখতো···ঢুলুনি এলেই সেই শিকের ছেঁকা লাগতো···

আমাদের দেশেও চোখে সরষে তেল দিয়ে পড়বার সময় ঘুম তাড়াবার কথা শোনা যায়···

এসব হলো ব্যর্থ পড়া।

পড়ার মধ্যে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, কোন তাগিদ নেই···

একমাত্র তাগিদ হলো, ভেতরের তাগিদ···

স্থান ও কালের যে ছোট্ট কারাগারে জন্মেছি, তার পাঁচিল ভেঙে নিত্যকালের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার তাগিদ···সর্বস্থানে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দেওয়ার তাগিদ···

যতক্ষণ এই বোধ বা এই তাগিদ না জাগে, ততক্ষণ পড়ার আসল রস পাওয়া যায় না···

ততক্ষণ সব পড়া হলো খবরের কাগজ পড়া···শুধু খবর বা সংবাদ সংগ্রহ করা···

খবরের কাগজ যারা পড়ে, তারা চায় নিত্য নতুন খবর··· নভেলও তারা পড়ে ঘটনার খবরের জন্যে, নিত্য নতুন ঘটনার জন্যে···'লেটেস্ট' ঘটনার জন্যে···সেন্‌সেশনল্ ঘটনার জন্যে···তাই সাধারণ পাঠক কাব্য পড়ে না, কারণ কাব্যে ঘটনা আড়ালে চলে যায়···সামনে থাকে কবির মন···

এই কবির মনের সঙ্গে, সাহিত্যিকের মনের সঙ্গে যখন পাঠকের মনের সংযোগ হয়, তখনই শুরু হয় সত্যিকারের পড়া···

প্রত্যেক বই এক-একটা আলাদা মন···

যে বইতে লেখকের মন সজীব হয়ে ওঠেনি, সে বই হলো মরা বই···অশুচি···

অরণ্যের ঝরা মরা পাতার মতন কাল তাদের নিঃশেষে দগ্ধ করে ফেলে···

কালের আগুনে দগ্ধ হয় না মন···

কবে কোন্ অরণ্যে নামহীন এক ব্যাধ তার বিষাক্ত বাণে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করে, কে তাকে স্মরণে রাখে ?

কিন্তু সেই ভগ্ন-মিথুন পক্ষিণীর অসহায় অরণ্যরোদন জাগিয়ে তোলে একটি ঋষির মন···সঙ্গহারা সেই একটি পাখির বেদনায় সৃজিত হলো আদি ছন্দ···

অরণ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে সে ব্যাধ, নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে সে পাখি, কিন্তু আজও আমার মনে বাল্মীকির ছন্দে ছন্দে জেগে উঠছে ভগ্ন-মিথুন সেই পক্ষিণীর কান্না···সীতার কান্না হয়ে···

আজও আমি কথা বলি বাল্মীকির সঙ্গে, তাঁর সঙ্গে করি মনের মিতালি···

পড়া হলো এই মনের মিতালি…

মন থেকে মনে এক বিরাট অ্যাডভেঞ্চার…

এই পড়ায় যখন কেউ স্নাতকোত্তীর্ণ হন, বাইরে থেকে তিনি কোন ডিপ্লোমা পান না, নামের সঙ্গে পি-এইচ. ডি. বা ডি. লিট্. লেখবার দরকার হয় না, তাঁর সারা মুখে, তাঁর মুখের কথায়, চোখের দৃষ্টিতে এক বিচিত্র ধরনের সুন্দরতার আলো জ্বলে ওঠে…ফল পেকে উঠলে আপনা থেকে তার গায়ে যেমন সুপক্কতার আভা বেরোয়… কণ্ঠস্বর গোল নরম হয়ে আসে…চোখের দৃষ্টিতে প্রদীপের শিখার নীল আভা ঠিকরে পড়ে…কুৎসিত মুখও অপরূপ সুন্দর দেখায়… পণ্ডিত বলে মানুষ তখন তাঁকে ভয় করে না, রসিক বলে কাছে ছুটে আসে…

জগতে অতুলনীয় উপকথার স্রষ্টা ঈশপ্ দস্তুরমতন দেখতে কুৎসিত ছিলেন কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের অনিন্দ্যসুন্দরীরা রতিরঙ্গ ছেড়ে তাঁর সঙ্গ কামনা করতেন…

সক্রেটিস একজন বিখ্যাত কুৎসিত-দর্শন লোক ছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের কথা শোনবার জন্যে লোকে কারাগারেও তাঁর সঙ্গে বাস করেছে…

পণ্ডিত হওয়ার চেয়ে বড কথা হলো রসিক হওয়া…

এবং সেইখানেই পড়ার চরম সার্থকতা।

বই পড়তে হলে বইকে ভালবাসতে হয়, যেমন লোকে স্বভাবতঃই ভালবাসে সুন্দরী নারীকে…

তখন বই-না-পড়ে-থাকা বিরহ-যন্ত্রণার মতন অসহ্য হয়…

চীনের সুঙ্গ রাজত্বকালে একজন পড়িয়ে-কবি ছিলেন,…আজ-কালকার কবিদের মতন তাঁরা বই-পড়াকে মৌলিকতা-হানির কারণ মনে করতেন না…তিনি এক জায়গায় আক্ষেপ করে বলেছেন, আজ

তিনদিন হলো একটাও বই ছুঁতে পর্যন্ত পাই নি, মনে হচ্ছে নিজের কথায় যেন কোন স্বাদ নেই, মাঠের মাঝখানে একলা পড়ে আছি··· মরা শেয়ালটার মতন···

আজকের জগতে যে সব শিক্ষিত লোককে কারাগারে দীর্ঘদিন যাপন করতে হয়েছে, তাঁরা হঠাৎ মানুষের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারাগারের নির্জনতার মধ্যে আটক পড়ে প্রথম যে বস্তুটির জন্যে আকুল হয়ে ওঠেন, সে হলো বই···

কারাগারের এই বাধ্যতামূলক বিচ্ছিন্নতার ভেতর বোঝা যায়, নির্জীব শুকনো পাতার ওপর সারি-বাঁধা অচল অক্ষরগুলোর আড়ালে কি প্রচণ্ড সজীব সচলতা লুকিয়ে আছে···তখন পুরোনো একটা রেলের টাইম-টেবল্-এর ভেতর স্পষ্ট জেগে ওঠে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগের গতি···একটা তুচ্ছ রেলের স্টেশনের নামের আড়ালে জেগে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয়ের রোমান্স···

কারাগারের পাঁচিলের ভেতর এলে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা যায়, সব-পাঁচিল-ভাঙার শক্তি একমাত্র আছে বইএর ভেতরেই···

তাই আজকের শাসকেরা শিক্ষিত বন্দীকে মানসিক শাস্তি দেবার জন্যে বইএর ব্যবহার আগে বন্ধ করেন···

কারাগারের বাইরে বইএর লাইব্রেরির ভেতর বসেও যে লোক বইএর পাতা উলটিয়ে দেখে না, কারাগারের ভেতর সে একটা ঠোঙার গায়ে ছাপানো লেখা পর্যন্ত পড়ে দেখে···

প্রত্যেক মানুষের মনের ভেতর ঘুমিয়ে আছে বিশ্ব-মনের সঙ্গে সংযোগের তাগিদ···

এই তাগিদেরই অপর নাম হলো পড়ার তাগিদ···

যার স্মরণে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন,

> ইচ্ছা করে মনে মনে
> স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
> দেশ-দেশান্তরে * * *

পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে***

কিন্তু লক্ষ লক্ষ বই লেখা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ বই লেখা হচ্ছে, আয়ুর দীপে কতটুকু তেল? একটা প্রদীপের আলোয় কতটুকুই বা পড়া যায়?

তাহলেই প্রশ্ন আসে, কোন্ বই পড়বো? কোন্ বই বাদ দেবো? কি হিসেবেই বা বাদ দেবো? এর ভেতর কি কোন আইন আছে? যদি থাকে সেটা কি?

আইন আছে…পণ্ডিতেরা এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে কতকগুলো আইন খুঁজে বার করেছেন…

কিন্তু সেগুলো নিতান্ত মামুলী, ছাত্রদের প্রতি স্কুল-মাস্টারের উপদেশ, How to read and what to read!

সে সব আইন বা উপদেশ স্কুলের ছাত্রদের ভাল করে পরীক্ষায় পাস করবার জন্যে…

দুঃখ হয়, আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্ররা বহু বই পড়তে বাধ্য হয় কিন্তু পনেরো-ষোল বছর ধরে বই ঘেঁটেও বই পড়ার স্বাদ পায় না…

বই পড়া জীবনের একটা অন্তরঙ্গ রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার…

ঠিক যেমন রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার হলো প্রেমে পড়া…

এই পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কন্যার মধ্যে কোথায় একটি বা দুটি কন্যা আছে যার দেখা পেলেই অন্তর আনন্দে বলে উঠবে, তুমি আমার!

কখন কি করে কোথায় সেই কন্যার সঙ্গে দেখা হবে, তা আগে থাকতে কেউ বলতে পারে না…যৌবন হলো তারই অন্বেষণের অ্যাডভেঞ্চার…

তেমনি প্রত্যেক পাঠকের জন্যে আছে তার প্রিয় গ্রন্থকার…যার

দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর আনন্দে বলে উঠবে, তুমি আমার কথা বলেছ, আমার কথা লিখেছ, তুমি আমার !

জীবনের অন্যতম সব চেয়ে বড় রোমাণ্টিক অ্যাডভেঞ্চার হলো, নিজের প্রিয় গ্রন্থকারকে খুঁজে বার করা…

এই লক্ষ লক্ষ বইএর মধ্যে কোথায় একখানি বই আছে, যে বইএর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনের বন্ধ দরজা জানলা সব খুলে যাবে…সেই খোলা জানলার ভেতর দিয়ে নতুন করে তখন হবে পৃথিবীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় !

বই-পড়া হলো সেই বিশেষ একখানি বইএর অন্বেষণ…

এবং এর রোমান্সই হলো সেইখানে, একটি বিশেষ নারীর স্পর্শের মতন, প্রত্যেকের জন্যে আছে বিশেষ একটি বই যার প্রভাব তার জীবনে এনে দেবে বিস্ময়ের নব-জাগরণ…

সেই একখানি বই বাইবেল হতে পারে, গীতা হতে পারে, কালিদাসের মেঘদূত হতে পারে, কিংবা কারুর কাছে কপালকুণ্ডলা বা ঘরে বাইরে হতে পারে !

পৃথিবীতে এমন একখানিও বই নেই যার সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এই বইখানি প্রত্যেক মানুষের পড়া উচিত…

এবং বিস্ময়ের ব্যাপার, জীবনে প্রত্যক্ষভাবে দেখলাম, মানুষে মানুষে পরিচয়ের যেমন একটা লগ্ন আছে, যে লগ্নে এক মুহূর্তের পরিচয় হয়ে ওঠে সারা জীবনের অন্তরঙ্গতা…ঠিক তেমনি আছে, মহৎ বই, যাকে আমরা বলি Masterpiece, তার সঙ্গে পরিচয়ের একটা বিশেষ লগ্ন…

প্রত্যেক বড় বইকে গ্রহণ করবার জন্যে বোঝবার জন্যে মনের একটা বিশেষ প্রস্তুতি দরকার, জীবনের একটা বিশেষ অভিজ্ঞতার দরকার…যে প্রস্তুতি বা অভিজ্ঞতা না থাকলে সেই বইএর মর্মের পরিচয় কিছুতেই পাওয়া যাবে না…

ইংরেজীতে আমি এম. এ., সেই দাবিতে যদি শ্রীঅরবিন্দের

সাবিত্রী পড়তে যাই, দেখবো তার একটা লাইনের ইংরেজীর সঠিক মানে ধরতে পারছি না…বার কতক পাতা উলটে তখন কাব্যের থাক থেকে সাবিত্রীকে সরিয়ে রেখে দি…দুর্বোধ্য, কঠিন, নিরর্থক হেঁয়ালি!

ইংরেজী জানলেই, ইংরেজীতে যা লেখা হয়, তা বোঝা যায় না…

খবরের কাগজ বোঝা যায়, সাহিত্য বোঝা যায় না…

সাহিত্য বুঝতে হলে জীবনের প্রস্তুতি দরকার…

সাহিত্যের যা কিছু মহৎ সৃষ্টি, তা বুঝতে হলে চাই জীবনের প্রস্তুতি…

সাবিত্রী মহাকাব্যের প্রত্যেক অক্ষরে যে আলো জ্বলছে, সে আলোর প্রতিশব্দ অভিধানে নেই…নিজের জীবনের আলো দিয়ে সেই আলোকে ধরতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে…

সাহিত্যের যা কিছু মহৎ সৃষ্টি, তাকে জীবন দিয়েই বুঝতে হয়… নইলে উইপোকা বই থেকে যা পায়, আমরা তা-ও পাই না!

জীবন সম্বন্ধে যার জিজ্ঞাসা জাগেনি, জীবনের ব্যথা-বেদনার অনন্ত প্রহেলিকার নিরুত্তরতা যাকে মর্মে মর্মে উদ্বেল করেনি, সে গীতা পড়ে কি পাবে?

আমি একজনকে অতি অন্তরঙ্গভাবে জানি। সে নিষ্ঠাসহকারে বিশ্বের বহু বই পড়েছে, কিন্তু কোনদিন শ্রীম-র লেখা রামকৃষ্ণ কথামৃত ছোঁয়নি…কোনদিন তার কৌতূহলও পর্যন্ত জাগেনি, বইটার পাতা উলটে দেখবার…তখন তার ধারণা ছিল, রামকৃষ্ণের মতন অশিক্ষিত গেঁয়ো পুরোহিত হয়তো ধর্মের বড় বড় কথা বলতে পারেন কিন্তু সে কথা হলো ছেঁদো কথা, তার মধ্যে সাহিত্যের নিত্যকামের রূপ-রস কি করে থাকবে?

তারপর জীবনের মধ্যলগ্নে এসে অকস্মাৎ এলো তার অন্তর ও বাহির জীবনে বিপুল বিপর্যয়…সব চেনা নৌকো নোঙর ছিঁড়ে ভেসে চলে গেল…সামনে গর্জন করে ধেয়ে এলো নিশ্ছিদ্র নিশীথ অন্ধকারের মধ্যে প্রমত্ত বন্যার প্রলয় আর্তনাদ…

সেই ভীত আর্ত নিশীথ অসহায়তার মধ্যে অকস্মাৎ তার ঘটে গেল ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়···যে মানুষটিকে সে একেবারে চিনতো না, পরম-বন্ধুর সন্ধান পেলো তাঁর মধ্যে···সে ভালবাসলো ঠাকুর রামকৃষ্ণকে···

সেই ভালবাসার তাগিদে সে তখন খুঁজতে আরম্ভ করলো, কোথায় আরও ভাল করে এই মানুষটিকে জানা যায়···

তখন সে সঙ্গোপনে কথামৃত পড়তে শুরু করলো···

তখন মন্দিরের পাষাণ-বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে উঠলো···

কথা হলো অমৃত···বই হলো মানুষ···বই হলো ঠাকুর···কথামৃত হলো ঠাকুর রামকৃষ্ণ···

মরমী বন্ধুকে বলে, ভাই, এমন সাহিত্য তো আর দেখিনি !

বন্ধু বিশ্ববিত্মালয়ে বক্তৃতা দেয়, কবি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে···

রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোক শোনে।

এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে···

বই থেকে মানুষে···আবার মানুষ থেকে বইএ···

ফ্লবেয়ার লা মিজারেবল পড়ে পাগল হয়ে গেলেন···ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন, কোনরকমে একবার ভিক্টর হুগোকে যদি দেখা যেতো !

রাস্তায় চলেন আর অবাক্ হয়ে রাস্তার লোকদের দিকে চেয়ে থাকেন···মনে হয়, প্রত্যেক লোকটা জাঁ ভালজাঁর মতন অতিকায় মানুষ···হঠাৎ যেন প্রত্যেক মানুষের চেহারার সাইজ দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে···প্রত্যেক মানুষের কুঁকড়ে যাওয়া মুখের চামড়ার ভেতর থেকে যেন চাপা নীল আলো ঠিকরে পড়ছে···

এই হলো মহৎ বইএর কাজ।

শত উপদেশে যা সম্ভব হয়নি, সত্যিকারের স্রষ্টার একটা লাইনে ঘটেছে সেই রূপান্তরের বিস্ময়···

কার লেখায় কখন্ কোন্ পাঠকের মনে এই পরম বিস্ময় ঘটবে কেউ তা জানে না…

কোন্ তীর্থ-দেবতার পাষাণ-বিগ্রহের আড়ালে আমার দেবতার পরম আবির্ভাব লুকিয়ে আছে, তা আমি জানি না,…তাই ঘুরে বেড়াই তীর্থে তীর্থে…

বই থেকে বইএ।

বহু বই আছে যা না পড়লে কিছু যায় আসে না…

বহু বই আছে, যা একবার পড়লেই চলে…

অতি অল্পসংখ্যক বই আছে, যা জীবনে বারে বারে পড়তে হয়…

জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একই বইএর তাৎপর্য বার বার নতুন করে ধরা পড়ে…

মনে পড়ে লুকিয়ে ছাদের চিলেকোঠার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে যখন বারো বছরের ছেলে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা পড়েছিলাম…

…প্রসঙ্গতঃ, জীবনের একটা সব চেয়ে বড় আনন্দ হলো, লুকিয়ে নিষিদ্ধ বই পড়া…

তখন সেই অনভিজ্ঞ কিশোরের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে কপালকুণ্ডলা আর তার স্রষ্টার এক রকম চেহারা ছিল…

তারপর যৌবনে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা পড়লাম…

নবরূপে দেখলাম কপালকুণ্ডলাকে…সমুদ্র-মেখলা নির্জন অরণ্যে ভগ্নতরী নবকুমারের বদলে নিজেকে করলাম গল্পের নায়ক…

নব-জাগ্রত সাহিত্য-বুদ্ধিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে করলাম সমালোচনা…

তারপর আবার যৌবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ক্লান্ত হয়ে জীবনের সন্ধ্যালগ্নে পড়লাম কপালকুণ্ডলা…পড়লাম বঙ্কিমচন্দ্র…

নবরূপ নিয়ে জেগে উঠলো কপালকুণ্ডলা, যে রূপ যৌবনে চোখে পড়েনি…নতুন করে আস্বাদন করলাম সেই বিচিত্র নারীকে…

নতুন করে দেখতে পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রকে…

যেন এই প্রথম তাঁর সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় হলো···
যেন এই প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র পড়লাম···
এই প্রথম সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে সাগরকে দেখলাম···
সমালোচনা করবার আর সাহস নেই।

যখন লাইব্রেরি-ভরা বইএর দিকে চাই, বিস্ময়ে মন ভরে যায়···

প্রত্যেক বইএর ভেতর মৌন প্রতীক্ষায় রয়েছে একটা মহাপ্রাণ, আমাকে স্পর্শ করবার জন্যে···

আমারই জন্যে বাল্মীকি গেয়েছেন রামসীতার গান, আমারই জন্যে বেদব্যাস রচনা করেছেন মহাভারতের কাহিনী, আমারই জন্যে দেশে দেশে গেয়েছে কবিরা প্রেম-বিরহের গান, রচনা করেছে শত শত কাহিনীকার মানব-মনের বিচিত্র খেলার নব নব কাহিনী, আমার বিভ্রান্ত মনকে ভোলাবার জন্যে যুগে যুগে শাহারজাদী সৃষ্টি করে চলেছে সহস্র রজনীর স্বপ্ন-কাহিনী···

এ কল্পনার উচ্ছ্বাস নয়···জীবনের একান্ত বাস্তব সত্য···

মৃত্যুর ছেদকে তুচ্ছ করে একমাত্র পুঁথির পাতার মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে জীবনের অবিরাম ধারা···প্রাণের অবিচ্ছেদ গতি···

একটা বইকে যখন স্পর্শ করি, সেই অনাদি প্রাণগঙ্গাকেই স্পর্শ করি।

কারাগারের নির্জন কক্ষে বসে আছে আঠারো বছরের একটা তরুণ···

আজ কারারক্ষী তাকে জানিয়ে গিয়েছে, রাত প্রভাত হলে তার ফাঁসি হবে!

অন্ধকার নির্জন কারাকক্ষে তরুণ অপেক্ষা করে আছে মৃত্যুর জন্যে!

তার জন্যে তরুণ ভীত নয়···তবুও এইভাবে একেবারে একাকী

মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকা···অন্ধকারে যে আসবে তার মুখও দেখা যাবে না···যদি একটা আলো সঙ্গে থাকতো···যার সঙ্গে চিরকালের মতন চলে যেতে হবে, যদি একবারও প্রদীপের আলোয় তার মুখটা দেখা যেতো···সে মহা ভয়ংকর, না, চির সুন্দর ?

কারাকক্ষ খুলে দেখা করতে আসেন কারাগারের কর্তা···

নিয়ম অনুসারে জিজ্ঞাসা করেন, ক্ষুদিরাম, তোমার অন্তিম ইচ্ছা কি জানাতে পার !

শান্তকণ্ঠে তরুণ বলে, আমার কোন ইচ্ছা নেই, কোন দরকার নেই, শুধু একখানা বই যদি দিতে পারেন, একখানা গীতা !

সেদিন সেই জীবনের শেষ রাত্রিতে অন্ধকার কারাকক্ষে ক্ষুদিরাম শুধু স্পর্শের ভেতর দিয়ে গীতা পড়েছিলেন···

শংকরের বা মধুসূদন সরস্বতী, বা অন্য কারুর ভাষ্যের কোন প্রয়োজন হয়নি···

এই একখানি বই থেকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যায় তার জীবনের চরম পাওয়া, অভয় !

মনে মনে স্বপ্ন দেখি, যেদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব···

সেদিন আমার শেষ শয্যাকে ঘিরে যেন থাকে, জীবনের গোপনতম মুহূর্তের গূঢ়তম আনন্দ যাদের কাছ থেকে পেয়েছি সেই আমার জীবনের সহচর গ্রন্থগুলি···

যদি কোন বন্ধু, যদি কোন প্রিয়জন উপস্থিত থাকে, আমাকে পড়ে শোনাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা···

যে কবিতা পড়ে জীবন জেগেছে, সেই কবিতা হবে শেষ পারানির কড়ি···

ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম স্মরণ করে ঘুমিয়ে পড়বো···

হে দেবতা, এ কি খুব দুর্লভ দুরাশা ?

সুখ কাকে বলে ?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় গোপাল ভাঁড়কে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে সহজে বুঝিয়ে বলতে পার, সুখ কাকে বলে ?

গোপাল ভাঁড় উত্তরে বলেছিলেন, মহারাজ, সুখ হলো সেই জিনিস, কোষ্ঠ-পরিষ্কার হলে যা মানুষ উপলব্ধি করে !

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়ের উত্তরে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু কাহিনীতে বলে গোপাল ভাঁড় নাকি একদিন মহারাজকে স্বীকার করতে বাধ্য করান, কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়াটা সত্যই একটা সুখকর ব্যাপার !

গোপাল ভাঁড় যদি আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি সেদিন মহারাজকে উত্তরে যা বলেছিলেন, সেই কথাই আজকের বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলতেন, All human happiness is biological happiness, অর্থাৎ আত্মিক বা মানসিক সুখ বলে কোন কিছু নেই,···মানুষ সুখ বলে যা কিছু অনুভব করে, তা দেহের কোন-না-কোন ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়েই অনুভব করে···

এশিয়ার দুটি প্রাচীন সভ্যতা আজও বেঁচে আছে,···একটি হলো চীন, আর একটি হলো ভারতবর্ষ···

এই দুই প্রাচীন সভ্যতার জীবন-দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা···

জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে এই দুই জাতের দৃষ্টিভঙ্গী একান্তভাবে বিভিন্ন···

পাশ্চাত্ত্য জগতের নবীনতর জাতিদের কাছে এই দুই জাতের মন হেঁয়ালির মতন লাগে···তাই তারা এই দুই জাতকে মিস্টিক (mystic) বলে আলাদা করে রেখেছে···

কিন্তু চীন অতি প্রাচীনকাল থেকে আশ্চর্যরকম বাস্তবধর্মী এবং তার বাস্তবধর্মিতার মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যরস মিশিয়ে আছে যে আজকের বৈজ্ঞানিক বাস্তবধর্মিতার সঙ্গেও তার মিল নেই।

চীনের এই বাস্তবধর্মিতা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন-দর্শন।

সুখ কি, তাই নিয়ে চীনে আর ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে···

ভারতবর্ষ সুখের খোঁজ করতে গিয়ে বৈরাগ্যকে খুঁজে পায়···তার দার্শনিকেরা বলেছেন, ভূমৈব সুখম্, ভূমাতেই সুখ !

চীন সুখের খোঁজ করতে গিয়ে দেখেছে, তুচ্ছ বলে জীবনের যেসব ছোটখাটো জিনিসকে আমরা বাদ দিয়ে চলতে চেষ্টা করি, সেই সব ছোটখাটো জিনিসের মধ্যেই জীবনের চরম সুখ জড়িয়ে আছে! তাই চীনের জীবনধর্মী দার্শনিকেরা বলেন, বেঁচে আছি, এইটেই সব চেয়ে বড় সুখ !

Lin Yutang তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই The Importance of Living-এ চীনের অন্তরকে আজকের মানুষের কাছে অপূর্বভাবে তুলে ধরেছেন ! যদি ভারতবর্ষে কোন লেখক সেইভাবে ভারতবর্ষের অন্তরকে তুলে ধরতে পারতেন !

Lin Yutang সপ্তদশ শতাব্দীর এক চীনা দার্শনিকের একটা ছোট লেখা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন···

সেই দার্শনিকের নাম হলো Chin Shengtan···

Shengtan আর তাঁর এক বন্ধু বেড়াতে গিয়ে বনের মধ্যে এক পুরানো ভাঙা মন্দিরে দশ দিনের জন্যে আটক পড়ে যান···হঠাৎ তুমুল ঝড় আর বৃষ্টি নেমে আসে···দশ দিন ধরে এমন তুমুল বৃষ্টি হতে থাকে যে তাঁরা আর সেই মন্দির থেকে বেরুতে পারলেন না···

তখন সময় কাটাবার জন্যে Shengtan বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনার বিষয় হলো, সুখ কাকে বলে ?

এক একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেন…

সাহিত্যিক রচনা হিসেবে এই উদাহরণগুলি যে কোন সাহিত্যের ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করবে…

জুন মাস, অসহ্য গরম…সারাদিন একভাবে সূর্য আকাশে জ্বলছে…

কোথাও এতটুকু হাওয়া নেই…আকাশে নেই এক ফোঁটা মেঘের চিহ্ন…

বাড়ির সামনে, পেছনে, দুদিকেই সারাক্ষণ দুটো উনুন জ্বলছে… একটা পাখিও ভুলে উড়ে এসে বসে না…

সারা গা দিয়ে নালার মতন ঘাম বইছে…খাওয়ায় এতটুকু রুচি নেই…

একটা মাদুর নিয়ে বাড়ির পেছনে গাছের ছায়ায় পাতি…কিন্তু বসতে না বসতে ঘামে ভিজে ওঠে মাদুর…ঘামে-ভেজা মাদুরের গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে মাছি…নাকের ডগাকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায়…সামনে থেকে তাড়াই, পেছনে পিঠে গিয়ে বসে… পিঠ থেকে উড়ে সামনে নাকের ওপর বসে…অতিষ্ঠ হয়ে উঠে দাঁড়াই…

এমন সময় হঠাৎ গ্রামান্তরের বনরেখার ওপর ঘন কালো মেঘ থাকের পর থাক ধেয়ে আসে…আকাশের বুকে বেজে ওঠে গুরুগুরু আওয়াজ…চোখের সামনে নড়ে ওঠে গাছের পাতা, দুলে ওঠে বাঁশবন…তীরের মতন নেমে আসে বৃষ্টির ধারা…গরম মাটির বুক থেকে অব্যক্ত আনন্দের মতন একটা শব্দ ওঠে, আঃ!

স্নিগ্ধ বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় দেহের গ্লানি…

মন নেচে ওঠে, এই তো পেলাম সুখ!

জীবনের একমাত্র বন্ধু, দশ বছর দেখাশোনা নেই···

সেদিন ঠিক সূর্যাস্তের সময় দরজা খুলে দেখি, দশ বছর পরে সেই বন্ধু এসেছে আমার ঘরের দরজায়।

তাকে ঘরে এনে বসাই···কি করে এলে, পায়ে হেঁটে না নৌকোতে···কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারি না, তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর গিয়ে স্ত্রীকে ডাকি···

—শুনছো, দশ বছর পরে বন্ধু এসেছে···কিন্তু ঘরে তো এক ফোঁটা সুরা নেই! সিন্দুকে পয়সাও কিছু নেই!

স্ত্রী হেসে বলে, এসো আমার সঙ্গে···এমনি দুঃসময়ের জন্যে দুটো বোতল লুকিয়ে রেখেছি উঠোনের বাঁ কোণে।

উঠোনের বাঁ কোণ থেকে টেনে তুলি দু-বোতলভরা খাঁটি সুখ!

রাত্রিবেলা একলা ঘরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল···চারদিকে ছড়ানো আমার পুঁথি-পত্র···

তার ভেতর থেকে শুনলাম শব্দ আসছে, খুট্···খাট্···কুট্··· কাট্···

চাঁদের আলোয় দেখলাম, একটা ইঁদুর মনের সুখে আমার পুঁথি কেটে চলেছে, কুট্ কাট্ খুট্ খাট্···

ওই পুঁথির কাগজে কি তার পেট ভরবে? অথচ, ও কি জানে আমার কি সর্বনাশ করছে?

একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি···ভ্রূক্ষেপহীন সে পুঁথি কেটে চলে···

হঠাৎ দেখি, পুঁথি থেকে মুখ তুলে সে সামনের দিকে স্থির চেয়ে থাকে···

সামনে একটা হুলো বেড়াল তাকে লক্ষ্য করে এক-পা এক-পা নিঃশব্দে এগুচ্ছে···

কাছাকাছি এসে হুলো বেড়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়ে···

অন্তরের ভেতর থেকে একটা তৃপ্তির শ্বাস আপনা থেকে পড়লো, আঃ!

একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি··· [পৃঃ ৮৩

বেড়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই ইঁদুরটা গর্তে সরে পড়েছে·

আঃ বাঁচলাম!

সুখে ঘুমোতে পারবো!

বাড়ি তৈরি করবো এমন সংগতি ছিল না।

হঠাৎ হাতে কিছু টাকা এসে জমলো···এক গাড়ি ইঁট, কিছু চুন বালি কিনে ফেললাম···

রোজ এখন দাঁড়িয়ে দেখি, একটু একটু করে বাড়িটা গড়ে উঠছে···

মজুররা কাজ করে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবি, এ বাড়ি কি শেষ পর্যন্ত তৈরী হবে?

পয়সা ফুরিয়ে যায় কিন্তু আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না··· আধখানা জিনিস পুরো হবে না?

বহু কষ্টে একটা দুটো করে টাকা যোগাড় করি, আবার একটা দুটো করে ইঁট বসাই···

দিনের পর দিন চলে যায়, মাসের পর মাস···দেওয়ালের ওপর ছাদ ওঠে···ঘরে দরজা জানলা বসে···চুনবালির কাজের ওপর রঙ পড়ে···

বাড়ি শেষ হয়ে যায়···মজুররা জঞ্জাল পরিষ্কার করে চলে যায়···

ঘরেতে মাদুর পাতি···বন্ধুদের ডাকি···চায়ের আসর বসে···

আলাদা স্বাদ লাগে আজ চায়ের···

আলাদা স্বাদ লাগে জীবনের···

বাড়ি আমার শেষ হয়েছে···বন্ধুরা মাদুরে বসে চাঁদের আলোয় সারারাত আলাপ করছে···

এর চেয়ে সুখ আর কি আছে?

বসন্তের রাত···

কবি বন্ধুদের সঙ্গে পান করতে বসেছি···হঠাৎ মাঝরাতে মনে হলো দেহ যেন সুরায় বিবশ হয়ে আসছে···সুরার স্বাদ আর ভাল লাগছে না অথচ পান-পাত্র ছেড়ে উঠতেও পারছি না···

পুরাতন ভৃত্য আমার অবস্থা বুঝতে পারে…কানে কানে চুপি চুপি বলে, হুজুর, কতকগুলো বাজি এনেছি…পোড়াবেন ?

আনন্দে সায় দিয়ে উঠি…ছোট ছেলের মতন স্ফূর্তিতে বাজি পোড়াতে থাকি !

পোড়া গন্ধকের গন্ধ দেহের শিরা-উপশিরায় গিয়ে ঢোকে… সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয় মদের বিবশতাকে…

মাঝরাতে পোড়া গন্ধকের গন্ধে আবার ফিরে আসে সুখ !

বৈঠকখানা ঘরে বসে আছি…পাঁচজন বন্ধু মিলে আড্ডা দিচ্ছি…

হঠাৎ একজন পুরানো বন্ধু এলো…তার মুখচোখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, বিপদে পড়ে সে আমার কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছে !

কিন্তু একঘর লোক…সাহিত্য, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে…

বাধ্য হয়েই সে সেই সব আলোচনায় যোগ দেয় কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি সে-সব আলোচনায় তার মন নেই…

আড্ডা জমে ওঠে…তার অস্বস্তিও বাড়তে থাকে…

অবশেষে সে আমার কানের কাছে চুপি চুপি বলে, একটু বাইরে আসবে ?

তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে ঘরের বাইরে আসি…সে কিছু বলবার আগেই আমি পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বলি, এতে হবে ?

আনন্দে সে চলে গেল…তার চেয়ে দশগুণ আনন্দে আমি ঘরে ফিরে এলাম !

সন্ধ্যাবেলা কাজ সেরে বাড়ি ফিরছি…

দরজা দিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো ছোট ছোট ছেলেরা একসঙ্গে পুরানো কাব্য আবৃত্তি করে চলেছে…

মনে হলো তাদের মিলিত কণ্ঠস্বরে সুখের ঝরনা যেন শতধারায় ঝরে পড়ছে !

কিশোরকণ্ঠে জাতির পুরাণ-কাব্য এমনি প্রতিসন্ধ্যায় চীনের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হয়ে উঠুক !

এর চেয়ে বড় সুখ আর কি হতে পারে ?

পুরানো কাঠের সিন্দুক…কাগজ-পত্র আর দলিলে ভরতি…

একদিন সিন্দুক খুলে দলিল-পত্র-কাগজ সব দেখতে বসলুম…

পুরানো কাগজ-পত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি, প্রায় একশোখানা দলিল…যারা আমাদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে, তাদের দলিল…

তাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গিয়েছে, কেউ কেউ এখনো বেঁচে আছে…কিন্তু ধার আর তারা শোধ দিতে পারছে না, কাগজে কাগজে শুধু সুদ বাড়ছে…

সব দলিল এক জায়গায় জড়ো করি…বাড়ির পেছনে বাগানে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিই…

চুপটি করে দাঁড়িয়ে দেখি, পোড়া দলিলের ধোঁয়া এঁকে-বেঁকে ওপরে উঠছে…

শেষ দলিল পুড়ে ছাই হয়ে গেল…

সব সুদ সুখ হয়ে মনে জমা রইলো !

তিন দিন ধরে সমানে বৃষ্টি ঝরে চলেছে…দরজা জানলা সব বন্ধ…নিজের ঘরে তিন দিন ধরে বন্দী হয়ে আছি…

বিছানায় শুয়ে সারারাত ধরে শুনছি শুধু বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ··· বিষাক্ত হয়ে ওঠে মন···

হঠাৎ ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যায়···বৃষ্টির শব্দের বদলে কানে আসে পাখির ডাক···

বন্ধ জানলার ভেতর দিয়ে যেন এলো একটা পাখির ডাক···

ধীরে ধীরে জানলার কাছে গিয়ে জানলা খুলে দিই···

মহাবিস্ময়ে দেখি, গাছের প্রত্যেক পাতা পাখি হয়ে যেন ডাকছে···

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে···

পাতা, পাখি আর সূর্যের আলো এক হয়ে গিয়েছে···

সূর্যের আলোর বীণায় বাজছে আনন্দের সুর !

আকাশে, বাতাসে, অরণ্যে উথলে উঠছে সুখ !

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন···

রুপোর পাতের মতন সারাদুপুর রোদে অবশ হয়ে কেঁপেছে···

বিকেলবেলা বাড়ির পেছনের বারান্দায় ছায়া নেমে আসে···

সবুজ ধানী রঙের পোশাকে গৃহিণী মাদুরের ওপর লাল রঙের সব চেয়ে বড় প্লেট-টা রাখেন···

সারাদুপুর জলে-ভেজানো সবুজ তরমুজটা লাল প্লেটের ওপর রাখেন···

ঝকঝকে ধারালো ছুরিটা দিয়ে তরমুজটা দুফালি করেন···

সবুজ খোলার ভেতর থেকে দেখা দেয় টকটকে লাল তরমুজের বুক···

মুখ ডুবিয়ে তরমুজে কামড় দিই···

সুখের লালায় ভরে ওঠে সারা মুখ···

শীতের রাত্রি, দরজা জানলা বন্ধ করে রাত জেগে পড়ছি আর মাঝে মাঝে পান করছি…

হঠাৎ খিল আলগা হওয়ায় একটা জানলা খুলে যায়…

দেখি, আগাগোড়া বরফে-ঢাকা একটা গাছ প্রথম সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে…

প্রথম তুষার…

অবাক হয়ে চেয়ে থাকি…

ক্লান্ত চোখে স্নিগ্ধ সুখের অঞ্জন! কি যে ভাল লাগে!

অনেক দিন থেকে মনে সাধ, মঠে সন্ন্যাসী হবো।

কিন্তু সন্ন্যাসীদের মাংস খাওয়া নিষেধ, তাই সন্ন্যাসী হওয়া আর হয় না!

যদি কোন মঠ ঘোষণা করে, না, সন্ন্যাসীদের মাংস খেতে বাধা নেই…

তখুনি আনন্দে ক্ষুর দিয়ে মাথা নেড়া করে ফেলি!

মনের মতন একটা বাড়ি অনেক দিন থেকে খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি না।

অবশেষে খবর পেলাম, আমি যা খুঁজছি, তা একজায়গার আছে।

গিয়ে দেখি, ঘর-দোর ঠিকই আছে এবং সেই সঙ্গে আছে খানিকটা খালি জায়গা।

খানিকটা খালি জায়গা না থাকলে বাড়ি বাড়িই নয়।

মন খুশী হয়ে উঠলো, বাড়ির পেছনেই কাঠাখানেক খালি জায়গা…নিজের হাতে শাকসবজি অনায়াসেই সেখানে গজাতে পারবো!

রোজ দেখবো, নিজের হাতে পোঁতা তরমুজ গাছে তরমুজ একটু একটু বাড়ছে…

এর চেয়ে সুখ আর কি আছে ?

নানান দেশ-বিদেশে ঘুরে তীর্থ-যাত্রী অবশেষে ফিরে এসেছে তার নিজের গাঁয়ে !

গাঁয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো মেঠো গেঁয়ো বুলি…কোন স্ত্রীলোক তার শিশুপুত্রকে ডাকছে, হ্যাদে ও পোলাপান !

জগতের সেরা সংগীতের মতন লাগে এই নিজের গাঁয়ের বুলি…

সুখের আবেশে ভেঙে পড়ে মন, এই তো ফিরে এসেছি নিজের ঘরে !

আমি সাধুপুরুষ নই, সন্ন্যাসীও নই, সাধারণ মানুষ, মাঝে মধ্যে অন্যায় করে ফেলি !

গতরাত্রে এইরকম একটা অন্যায় করে ফেলেছি…সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মনটা ভার হয়ে থাকে…কেন এ অন্যায় করলাম ?

এখন কি করে এই অন্যায়ের জ্বালা থেকে উদ্ধার পাই ! হঠাৎ মনে পড়লো এক বৌদ্ধশ্রমণের উপদেশ…পরিচিত অপরিচিত যাকে পাই তাকে ডেকে বলি আমার অন্যায়ের কথা !

সন্ধ্যাবেলা দেখি, সুখে ভরে গিয়েছে মন…কখন উবে গিয়েছে কাঁটার জ্বালা !

দোর-জানলা বন্ধ করে দুপুরে ঘরে ঘুমুচ্ছি…

হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল…

দেখি ঘরের ভেতর একটা বোলতা পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেরিয়ে যাবার পথ পাচ্ছে না…

তাড়াতাড়ি উঠে জানলা খুলে দিই···খোলা জানলা দিয়ে তীরের মতন বোলতাটা বেরিয়ে যায়···

মন থেকে একটা বোঝা নেমে যায়···

ঘুড়ি-উড়ানোর দিন···গাঁয়ের সবাই ঘুড়ি ওড়াচ্ছে আজ !
সারাদিন মাঞ্জা দিয়ে বুড়ো ধাড়ি সুতোকে শক্ত করেছে !
একটা বাচ্চা ছেলের ঘুড়িতে তার ঘুড়ি কেটে গেল···
অপরের ঘুড়ির সুতো কাটতে দেখে কার না আনন্দ হয় ?

একটু একটু করে শোধ দিতে দিতে আজ আমার সব ঋণ শোধ হয়ে গেল !

আঃ ! এতদিন পরে এই তো সুখ পেলাম !

বাড়ির ছেলেরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রাতের মতন ঘুমিয়ে পড়েছে···

ছোট নাতির বই-এর ভেতর থেকে রূপকথার গল্পের বইটা বার করে নি !

বিছানায় শুয়ে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি···

সকালবেলা ছোট নাতি দেখে আমার বুকের ওপর গল্পের বইটা খোলা পড়ে রয়েছে···

আনন্দে সে করতালি দিয়ে নেচে ওঠে···

তার সুখের আজ তুলনা নেই !

এই সব ছোট ছোট কাহিনীর মধ্যে একটা বিরাট জাতের মানসিক গঠনের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায় ; যে পরিচয় ইতিহাসের তথাকথিত বড় ঘটনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

‘ভাল্‌গার’

ইংরেজ আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে কিন্তু ইংরেজী ভাষা আমাদের মাটিতে থেকে গিয়েছে…

যত বড়ই দেশপ্রেমিক হই, চেয়ার টেবিল ফেলে দিয়ে কাষ্ঠাসনে আর বসছি না…

অন্ততঃ আমরা যারা বাঙলা ভাষা বলি, চেয়ার টেবিলে বসতে আমাদের লজ্জা নেই…পয়সা খরচ করে টিকিট কেটে রেলে না চড়ে লৌহনির্মিত বাষ্পযানে আমরা কিছুতেই চড়বো না…

আইনে বাধ্য করালেও, লৌহযানে আমরা আর চড়বো না…

তাই বাঙালীর মুখে মুখে অনেক ইংরেজী কথা শোনা যায়, যেগুলো বাঙালী নিজের করে নিয়েছে…

এই রকম একটা কথা হলো, ‘ভাল্‌গার’, Vulgar…

কিন্তু ‘ভাল্‌গার’ কাকে বলে ?

এক মিনিটের জন্যে অভিধানটা একটু খুলবো…

ওয়েবস্টার বলছেন, যে ল্যাটিন কথা থেকে ভাল্‌গারের উৎপত্তি হয়েছে, তার মানে হলো, সাধারণ লোক…

তাই তার গোড়ার মানে হলো, অতি সাধারণ, বিশেষত্বহীন… চল্‌তি…

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক-একটা কথার মানে বদলে যায়…

আজকে ভাল্‌গার কথার মানে দাঁড়িয়েছে, ওয়েবস্টার বলছেন, যার সঙ্গে কালচারের কোন সম্পর্ক নেই, মোটা, স্থূল, অভদ্র, রুচিহীন···

কিন্তু বিপদ হয়েছে এই রুচির কথা নিয়ে···আমার ধারণায় যেটা রুচিহীন, আর একজনের ধারণায় সেটা রুচিসম্মত, সুন্দর! এক যুগে যেটা রুচিসম্মত, আর-এক যুগে সেইটেই রুচিবিগর্হিত···

ভিক্‌টোরিয়া-যুগের মায়েরা আজকের যুগের মেয়েদের বডি-লাইন-বার-করা পোশাক দেখে বলবেন, ভাল্‌গার···আজকের মেয়েরা তেমনি ভিক্‌টোরিয়া-যুগের সর্বাঙ্গ সযত্নে-ঢাকা পোশাক দেখে রুচিহীন বলে হাসেন···

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে সেক্‌স্‌কে সন্তর্পণে আড়ালে রাখা ছিল রুচির পরিচয়···আজকের বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে সাহিত্যিকেরা সেক্‌স্‌ সম্বন্ধে এই লুকোচুরিকেই কুরুচির পরিচয় মনে করেন···

মাত্র কয়েক বছর আগে, আমাদের দেশে অপরিচিত স্ত্রীলোকের একহাতের মধ্যে যাওয়া ভাল্‌গার ছিল, আজ অপরিচিত পুরুষ ও নারী এক বাসে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে চলেছেন···কেউ তার জন্যে কাউকে ভাল্‌গার বলেন না, যতক্ষণ না একজন আর একজনের পা মাড়িয়ে দিচ্ছেন···

সুতরাং কথা দাঁড়াচ্ছে, কে কাকে ভাল্‌গার বলবে?

ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুললেন, আজকের যুগের সাহিত্যিকদের ভেতর যাঁকে সব চেয়ে বড় পণ্ডিত ও রসিক বিবেচনা করা হয়, সেই আল্‌ডুস্‌ হাক্‌স্‌লি···

হাক্‌স্‌লির বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্ম শ্লেষের আঘাতে বহু পুরানো মূর্তি খাঁদা-বোঁচা হয়ে গেল···

বহু কথার মানে বদলে গেল···

বহু সু কু হয়ে গেল, বহু কু সু-র পর্যায়ে উঠলো···

তার মধ্যে ভাল্‌গার কথাটারও মানে বদলে গেল···

তখন জাঁ ক্রিস্‌তফের জন্যে রমাঁ রোলাঁ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন···প্রত্যেক দেশে সমালোচকেরা, সাহিত্যিকেরা নভেল হিসেবে জাঁ ক্রিস্‌তফের তুমুল প্রশংসা করছেন···হাক্‌স্‌লি বললেন, জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌ তাঁর কাছে ভাল্‌গার লেগেছে।

বিশ্বসুদ্ধ লোক চমকে উঠলো!

চমকে ওঠবারই কথা···রবীন্দ্রনাথের লেখায় যেমন কুরুচি থাকতে পারে না, তেমনি কুরুচি থাকতে পারে না রেঁালার লেখায়!

জাঁ ক্রিস্‌তফের বিরাট আদর্শবাদে মুগ্ধ হয়ে জগৎ বলেছে, এই নভেল হলো বিংশ-শতাব্দীর মহাভারত!

এর ভেতর কোথাও নেই ইঙ্গিতে এতটুকু অশ্লীলতা!

অথচ হাক্‌স্‌লি স্পষ্টভাবায় লিখলেন, জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌ তাঁর কাছে ভাল্‌গার লেগেছে!

এবং নিজের এই উক্তির সমর্থন করতে গিয়ে তিনি ভাল্‌গার কথাটা নতুন করে ব্যাখ্যা করলেন···

এবং সেই প্রসঙ্গে বললেন, জাঁ ক্রিস্‌তফের ভেতর sentimentality-র এত বাড়াবাড়ি আছে, যার জন্যে এই নভেল তাঁর কাছে ভাল্‌গার লেগেছে···

অতিরিক্ত মিষ্টি দিলে যেমন তরকারি অখাদ্য হয়ে যায়, তেমনি লেখার মধ্যে sentiment-এর অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস রচনাকে ভাল্‌গার করে ফেলে!

সেন্টিমেণ্ট নিয়েই লেখা কিন্তু তার উচ্ছ্বাস সাহিত্যে ভাল্‌গার···

অর্থবান্‌ হওয়া দোষের নয় কিন্তু সবাই যেখানে দশ টাকা চাঁদা দিচ্ছে, সেখানে একশো টাকা চাঁদা দেওয়া ভাল্‌গার···

শীতের দিনে যেখানে সবাই গরম কাপড় পরছে, সেখানে আদ্দির ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরে আসা ভাল্‌গার···

অতি ছোট ঘর···সবাই মিলে গল্প করছে···সেখানে তুমি যদি একাই সব কথা বলতে যাও, যত দামী কথাই তুমি বল না কেন, তুমি ভাল্‌গার!

যে-পোশাক, যে-ভঙ্গি, যে-কথা বলবার ধরন রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক, রবীন্দ্র-ভক্তিবশতঃ তাকে অনুকরণ করা, ভাল্‌গার!

এইভাবে হাক্‌স্‌লি দেখালেন, আজকের প্রগতিশীল জীবনের মধ্যে কিভাবে 'ভাল্‌গারিটি' নানা ছদ্মবেশে মিশিয়ে রয়েছে···

পণ্ডিতদের মধ্যে, শিক্ষিতদের মধ্যে, সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে···

বিশেষ করে যারা নিজেদের মধ্যবিত্ত বলে পরিচয় দেয়, তাদের মধ্যে···

ভাল্‌গার কথার উৎপত্তি থেকে বোঝা যায়, একদিন অশিক্ষিত জনসাধারণকেই ভাল্‌গার বলা হতো···

সেই সর্বনিম্ন স্তরকে ছাড়িয়ে আজ 'ভাল্‌গারিটি' মধ্যবিত্তদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে···

সেখান থেকে তা দ্রুত সমাজের শীর্ষস্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে···

ম্যালেরিয়া, বসন্ত, টাইফয়েড, কলেরা সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যে বাইরে থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক আমাদের দেশে আসেন, কারণ আমাদের দেশের জলহাওয়ায় এই সব ব্যাধির কেস প্রচুর পাওয়া যায়···

তেমনি আমাদের দেশের জলহাওয়ার গুণে একজাতের খাঁটি দেশী 'ভাল্‌গারিটি' কচুরিপানার মতন বাধাহীন বেড়ে চলেছে···

মনুষ্য-চরিত্রের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেন, এরকম উপাদান তাঁরা অন্য আর কোন দেশে পাবেন কি না জানি না…

কয়লার খনির ভেতরে যারা কাজ করে তাদের যেমন খনির অন্ধকার সয়ে যায়, তেমনি এই ভাল্‌গার আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে এর ভাল্‌''রত্ব আমাদের এমন সয়ে গিয়েছে যে, আমরা তার প্রতিবাদ পর্যন্ত করি না…

কচুরিপানা যেমন তার প্রচণ্ড নিঃশব্দ বিস্তারে বাঙলার নদ-নদী খাল-বিল মজিয়ে ফেলেছে তেমনি সামনেই সেদিন আসছে যেদিন প্রতিবাদহীন এই ভাল্‌গারিটির প্রচণ্ড বিস্তারে বাঙালীর মন হেজে মজে শুকিয়ে যাবে…

সেদিন বিদেশীরা গবেষণা করতে বসবেন, এই দেশে কি করে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দের জন্ম হয়েছিল!

আমার কথা শুনে বন্ধু খেপে গিয়ে আমার কলম চেপে ধরে…

বলে, এসব তোমার অসুস্থ মনের পরিচয়…ছায়া দেখে ভূত মনে করছো!

—ছায়া দেখে আমি ভূত মনে করি নি…তবে ভূত আমি দেখেছি…ভূত ছায়াতে নেই, ভূত আছে তোমার ওই প্রশ্নে!

—বুঝিয়ে বল, উদাহরণ দিয়ে!

—আরব্য উপন্যাস পড়েছ? সিন্ধবাদ আর দৈত্যের গল্প? আকাশ-জোড়া বিরাট দৈত্যটা ছিল একটা নিরীহ ছোট বোতলের ভেতর…সিন্ধবাদ ভাবতেই পারেনি, ওইটুকু বোতলে এমন কি দৈত্য থাকতে পারে যার জন্যে ভীত হতে হবে? তুমিও ঠিক সিন্ধবাদের মতন ভাবছো, এমন কি ভাল্‌গারিটি আমাদের জীবনে এসেছে যার জন্যে আতঙ্কিত হতে হবে? যে-ভাল্‌গারিটিকে তুচ্ছ বলে, সামান্য

বলে আমরা চোখ বুঁজিয়ে আছি, তার সেই তুচ্ছতার ভেতরই লুকিয়ে আছে তার মারাত্মক ভয়ংকরতা···সে-ভয়ংকরকে দেখলেই চেনা যায়, সে ভয়ংকর হলেও তার সঙ্গে যোঝা যায় কিন্তু যে-ভয়ংকরকে দেখলে চেনা যায় না তার চেয়ে মারাত্মক শত্রু আর কিছু নেই!···বাঙালীর জীবনে আজ এই ভাল্‌গারিটি যে কত বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, ভাবলে অবাক্‌ হয়ে যেতে হয়···এই সঙ্গে মনে রেখো, অন্য প্রদেশের যে সব লোক বাঙলায় এসে বসবাস করছেন, বাঙলার এই মানসিক অধঃপতনের ইতিহাসে তাঁদের দানও কম নয়! প্রাদেশিকতার ভয়ে সেকথা মুখ ফুটে বলবারও জো নেই!

গম্ভীর কণ্ঠে বন্ধু বলে, বাজে বোকো না···উদাহরণ দাও!

—শোন তবে···

দেওঘর···

শীতের দিন স্বাস্থ্যকামী লোকেরা হাওয়া খেতে এসেছেন···

সকালবেলা···বাতাসে ইউকালিপ্‌টাসের গন্ধ···

লাল মাটির একটি মাত্র রাস্তা উঁচু-নীচু চলে গিয়েছে···

ছেলে-বুড়ো তরুণ-তরুণী সবাই সেই রাস্তায় হেঁটে চলেছে···

হাঁটাটাই আনন্দ···

হঠাৎ সেই একটি মাত্র রাস্তা দিয়ে এক বিরাট মোটরগাড়ি সমস্ত রাস্তাকে কাঁপিয়ে চলে গেল···

সঙ্গে সঙ্গে ধুলোতে পথ-ঘাট সব ভরে গেল···

মোটরের ভেতর তিন-চারটি বালক···আর বিপুল কলেবর একজন প্রৌঢ়···

সঙ্গে সঙ্গে ধুলোতে পথ ঘাট সব ভরে গেল।

প্রৌঢ়টি মোটরে বসে দাঁতন করছেন···

দাঁতন হয়ে গেলে আবার ধুলো উড়িয়ে এই পথ দিয়ে ফিরবেন···

তারপর বিকেলে আবার লাল ধুলো উড়িয়ে মোটরে করে 'গাঠে' যাবেন কোষ্ঠ পরিষ্কার করতে···

এবং সন্ধ্যার মুখে যখন আবার সবাই এই রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরুবেন তখন ইনি ধুলোর ঢেউ তুলে মাঠ থেকে আবার ঘরে ফিরবেন···

স্বাস্থ্যনিবাসে এসে যে সুস্থ লোক মোটরে হাওয়া খায়, মোটরে বসে দাঁতন করে, নিজে হাওয়া খাবে বলে বিনা দুশ্চিন্তায় অপর সকলের হাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে তার একমাত্র বিশেষণ হলো, সে ভাল্‌গার্‌!

তার সমগোত্রের লোক বাঙলার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে···

নিবারণবাবু জেলার সব চেয়ে বড় ডাক্তার···সবাই শ্রদ্ধা করে, সবাই মানে···রোজগারও রীতিমত ভাল···গরিব-দুঃখীদের কাছে ফী নেন না, দেবতাজ্ঞানে গরিব-দুঃখীরা তাঁকে প্রণাম করে···ঘরে ঢুকলে রোগীরা আশ্বাস পায়···জেলার সবাই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে···

সেই নিবারণ ডাক্তারের মাথায় ঢুকলো আ[illegible]হত্যা করবার নেশা···পলিটিক্‌সের আকর্ষণ! বিধান-সভার ডাক!

টাকা আছে, প্রতিপত্তি আছে···সুতরাং হিতৈষীর অভাব হলো না!

রাজনৈতিক দলের তিলক-কাটা পাণ্ডারা কানের কাছে জপতে লাগলো, দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে···স্বাধীন দেশের বিধান-সভায় আপনারা যদি না আসেন, কে আসবে?

নিবারণবাবু সে কথা অস্বীকার ক[illegible]তে পারলেন না···

খাতায় নাম লেখালেন···ভোটে নামলেন···এবং ভোটে জিতলেন···

এখন তিনি বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় দিল্লীতে থাকেন··· পার্লামেণ্টের সভ্য তিনি···

কাজ হলো পার্টির আদেশে হাত-তোলা আর হাত-নামানো! মাঝে মধ্যে বোকার মতন দু'একটা প্রশ্ন করেন···একজন ইকোনমিক্স্-এ পি-এইচ. ডি.-কে দিয়ে পয়সা খরচ করে একটা বক্তৃতা লিখিয়েছিলেন কিন্তু পার্টির কর্তা সে বক্তৃতা অনুমোদন করলেন না···

কিন্তু এ-সবের জন্যে নিবারণবাবুর কোন দুঃখ নেই···রোজ কুড়ি-পঁচিশ খানা করে চিঠি পান···আপনি ইচ্ছা করলেই পণ্ডিতজীকে ধরে আমার ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন···আপনি একবার অমুক বিভাগের সেক্রেটারিকে যদি একটু বলে দেন তাহলেই আমার পারমিটটা তাড়াতাড়ি পেতে পারি···ইত্যাদি···

দিল্লী থেকে যখন তাঁকে জেলায় ফিরতে হয়, কলকাতা ছুঁয়ে যেতে হয়···তখন নানান সভা-সমিতি, ক্লাব, প্রতিষ্ঠানে তাঁকে প্রধান অতিথি হতে হয়···

এই রকম এক সভায় নিবারণবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়··· এক নতুন টি-বি ক্লিনিকের দ্বার উদ্ঘাটনের ভার তাঁর ওপর পড়ে···

বক্তৃতায় তিনি যা বললেন, তার সার কথা হলো, আজ স্বাধীন দেশের সবচেয়ে বড় দরকার হলো, জাতির স্বাস্থ্যকে রক্ষা করা এবং তার জন্যে দরকার দেশহিতব্রতী আদর্শবাদী ডাক্তারদের, যাঁরা দূর পল্লী অঞ্চলে রোগগ্রস্ত পল্লীবাসীদের মধ্যে বাস করতে কুণ্ঠিত হবেন না!

রাজনীতির মোহে নিবারণবাবু ভুলে গিয়েছেন যে তিনি নিজে একজন ডাক্তার, যে ডাক্তার ডাক্তারি ছাড়া আর সব কিছু করেন!

রাজনীতির এই ভাল্গার আকর্ষণে আজ ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার,

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, শিক্ষক যাঁদের প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট ও একান্ত প্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্র আছে, তাঁরা তা পরিত্যাগ করে রাষ্ট্র-সভার সদস্য হতে ছুটেছেন···

দুর্গাপূজা হবে, আজ তার জন্যে সবচেয়ে দরকার একজন পার্লামেণ্ট বা বিধান-সভার সদস্যের, যিনি দ্বার উদ্‌ঘাটন করলে তবে দেবী দুর্গা পূজামণ্ডপে প্রবেশ করতে পারবেন!

রাজনৈতিককে এ সম্মান দেখানো নয়···এ হলো খাঁটি বাঙলাভাষায় যাকে বলে "আদিখ্যেতা"···অতি ভাল্‌গার আদিখ্যেতা!

মোটরগাড়ির যুগে গরুর গাড়ি হলো ভাল্‌গার···

প্রতিদিন যে-কোন লোক কলকাতার রাস্তায় দেখতে পাবেন, আমি সেদিন দেখলাম একটা অপ্রশস্ত রাস্তায় প্রায় মাপা সিকি মাইল ধ'রে মোটর, বাস, ট্যাক্সি, লরি সব "জাম্‌" হয়ে গিয়েছে··· এবং খ্রীষ্টান শবযাত্রীদের মতন আস্তে আস্তে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে···বিরক্তিতে প্রত্যেক চালক আর্তনাদ করছে, কিন্তু কেউই 'স্পীড্‌' দিতে পারছে না···

এগিয়ে গিয়ে দেখি সেই লম্বা সারির মুখে চারখানি গরুর গাড়ি পড়েছে···

গরুর গাড়ির চালকদের পেছন থেকে লোকে চিৎকার করে গালাগালি দিচ্ছে···

কিন্তু তাদের মুখে দেখলাম, এক বিচিত্র গর্বের বাঁকা হাসি!

ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল যানেওয়ালাদের আজ তারা বাগে পেয়েছে···

অন্ততঃ দশ মিনিটের জন্যে তাদের শ্লথ স্পীডে অন্য সকলকে চলতে তারা বাধ্য করাবে !

ভাল্‌গারিটি-টা হলো এই মনোভাবে…

আমাদের মধ্যে যারা অলস, অশিক্ষিত ও অকর্মণ্য, তারা অধিকাংশ হলো এই গরুর গাড়ির দল…

তাদের মন ক্রমশঃ সেই গাড়োয়ানদের মতন ভাল্‌গার হয়ে আসছে…

সর্বদাই তারা সুযোগ খুঁজছে নিজেদের গতিহীনতায় অপর সকলের গতি কি করে শ্লথ করতে পারে…

যদি পারে, সত্যিই তারা আনন্দিত হয়…

সময়ে-অসময়ে লাউডস্পীকার বাজিয়ে যেসব ছেলে পাড়া মাতিয়ে তোলে, তাদেরও এই মনোভাব, আমি যদি এতে আনন্দ পাই, তোমাকেও এতে আনন্দ পেতেই হবে !

আজ অন্য প্রদেশের লোকেরা বাঙালীকে ঘৃণা করে…তারা এক বিচিত্র অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আজকের বাঙালীর দিকে চায়…

একদিন তারাই বাঙালীকে শ্রদ্ধা করতো…বাঙালীর চালচলন অনুকরণ করতো…নেতৃত্বের জন্যে বাঙালীর দিকে চেয়ে থাকতো …বাঙালীকে অনুকরণ ও অনুসরণ করে গর্ব ও আনন্দ বোধ করতো !

আজ কেন এই উলটো হাওয়া বইছে ?

অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বাঙালী এর একটা উত্তর তৈরি করে, কিন্তু নিজের দোষটা দেখতে চায় না…

প্রত্যেক ভাল্‌গার লোকের মতন আজ বাঙালী নিজেদের ভাল্‌গারিটি দেখতে পায় না…

একটা জায়গায় বাঙালী এত ভাল্‌গার হয়ে উঠেছে যে বাঙালী ছাড়া অন্য কেউ আর তাকে সহ্য করতে পারে না···

সে ভাল্‌গারিটি হলো, বাঙালীর অতীত-গর্ব!

নিকটবর্তী অতীতে বাঙালী ভারত-সমাজে অধিনায়কত্ব করেছে, এই ঐতিহাসিক সত্য আজকের বাঙালীর মুখে একটা লজ্জাকর ভাল্‌গার আতিশয্যে ফুটে উঠেছে···

এই ভাল্‌গার আতিশয্যের একটা উদাহরণ ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিতেন···

একটি ছেলে গর্ব করে বলেছিল, আমার মামার বাড়িতে গোয়াল-ভরতি ঘোড়া ছিল!

এই গোয়াল-ভরতি ঘোড়ার গর্ব লোকে সহ্য করবে কেন?

একান্ত সদাশয় অমায়িক লোকও ভাল্‌গার হতে পারেন···

এবং বাঙালী উচ্চবর্ণের ভেতর এইজাতীয় ভাল্‌গার লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে···

আমাদের অনুকূলদা এদিকওদিক করে এখন বেশ অবস্থাপন্ন হয়েছেন···

টাকায় যা পাওয়া যায়, তা তিনি পেয়েছেন, কিন্তু টাকায় যা পাওয়া যায় না তাও তিনি টাকা দিয়ে পেতে চান···

অর্থাৎ তিনি সাহিত্যিক হবেন···

নাতির অন্নপ্রাশনে বড় বড় সাহিত্যিকদের, নামকরা কাগজের সম্পাদকদের নিমন্ত্রণ করেন···

পরের দিন কাগজে কাগজে তাঁর ছবি বেরুলো, বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মাঝখানে তিনি বসে আছেন, তাঁর হাতে তাঁর প্রকাশিত নভেল···

অমুক সাহিত্যিক একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন···অনুকূলদা আগে তাঁর বাড়িতে গিয়ে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেন···

সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার আলো জ্বলে ওঠে···কাগজে কাগজে ছবি বেরোয় সাহিত্যিক অনুকূলচন্দ্র পাল অমুক সাহিত্যিককে মাল্যদান করছেন···

পরের বছর পাড়ার কালচার-অনুষ্ঠানে সাহিত্য শাখায় অনুকূলদা সভাপতিত্ব করেন···

অনুকূলদা গত মাসে দিল্লীতে গিয়েছিলেন, একাডেমির পুরস্কার কিভাবে দেওয়া হয় তার খবরাখবর আনতে···

দিল্লী থেকে ফিরে এসে অনুকূলদা সগর্বে আমাকে একটা ফটো দেখালেন, দেখেছ ?

ফটোতে দেখি, নন্দাঘুন্টি অভিযানে যেসব বাঙালী গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনুকূলদা বসে আছেন, অনুকূলদারও গলায় একটা মালা···

অনুকূলদা এখন নিঃসংকোচে ছেলেদের কাছে গল্প করেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবে কবে তাঁর দেখা হয়েছিল, তাঁর বাড়িতে যে শ্যামলা গাইটা ছিল রবীন্দ্রনাথই তার নামকরণ করেছিলেন···একবার শান্তিনিকেতনের জন্যে ডাল কেনবার দরকার হয়, অনুকূলদাই বলেছিলেন কোথায় সস্তায় কোন্ ডাল পাওয়া যায়। সেই থেকে ডাল কেনবার দরকার হলেই রবীন্দ্রনাথ অনুকূলদার খোঁজ করতেন···

বাঙালীর মধ্যে অনুকূলদার সংখ্যা বেড়েই চলেছে···

বাঙলার যে কোন রাস্তায় যে কোন দুজন বাঙালীর দেখা···

—কেমন আছ ভায়া ?

—আর বলো না, আজ হপ্তাখানেক ধরে পেটে একটা 'পেন্‌' উঠছে···

—তাতেই ঘাবড়ে যাচ্ছো? আমি যে আজ একমাস এই ভাঙা পা নিয়ে অফিস করছি, তার ওপর বুকের বাঁ দিকে···

—আমার ডান দিকে 'পেন্‌'টা ওঠে···সব সময় চিনচিন করছে ···ডাক্তার মুখুজ্জের কাছে গিয়েছিলাম···মুখুজ্জে আবার শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে আমার মেজ শালীর···

—ডাক্তার মুখুজ্জের কম্মো নয়···আমি সব দেখে বেছে হয়রান হয়ে গিয়েছি···আমার শ্বশুরের গল-ব্লাডার অপারেশনের সময়··· ওই মুখুজ্জে···

—ও কথা বলো না···আমার জামাই-এর অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস অপারেশনের সময় নিজে দাঁড়িয়ে দেখলাম···জামাইকে তো তুমি চেন? রায়বাহাদুর হরিহর দত্তের নাতি···

—আরে তুমি ও কি বলছো? স্যার কে. জি. বোসের বাড়িতে তো আমার ভাই বিয়ে করেছে···আমার পিসতুতো ভাইপো ···বাঙালীর মধ্যে এত কম বয়সে কেউ ডি-এসসি পায় নি···সাত সাতটা ডাক্তার কে. জি. আনিয়েছেন···তার মধ্যে···

কেউ কাউকে কথা শেষ করতে দেবে না···কাউকে ছাড়িয়ে যেতে দেবে না···

রাস্তাসুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে শুনছে তাদের ভাল্‌গারিটির পাল্লা···

আমি-র সঙ্গে আমি-র লড়াই···

চায়ের দোকানে, আড্ডায়, রকে, যেখানে বাঙালী মুখোমুখি হয়, সেখানেই এই আমি-র লড়াই···

বাঙালীর ব্যাকরণে সব সর্বনাম মুছে গিয়েছে, শুধু আছে একটি সর্বনাম, আমি!

বেদান্তের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞানের দিকে বাঙালী দ্রুত এগিয়ে চলেছে…

আমরা আমাদের ছেলেবেলায়, সে খুব বেশীদিন আগেকার কথা নয়, কৃতী লোকদের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করতাম…

আজ বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণীর কাছে একমাত্র কৃতী লোক হলো সিনেমার অভিনেতা ও অভিনেত্রী…

সেদিন রূপবাণী হলে একটা কাল্চার অনুষ্ঠান হবে …এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন বাঙলার সিনেমা-তারকারা…

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকজন কৃতী সাহিত্যিক ও অধ্যাপকও নিমন্ত্রিত হয়েছেন…

অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে দেখি সারা প্রেক্ষাগৃহে তরুণ আর তরুণীরা অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় স্বাক্ষর দেবার যোগ্য লোক বসে আছে!

হঠাৎ দেখি, একদল স্বাক্ষর-শিকারী সামনের দিকে ছুটলো…ঘাড় তুলে দেখি কবি কালিদাস রায় সবে মাত্র এসে সেখানে বসলেন!

বুঝলাম, তাঁর স্বাক্ষরের জন্যেই তরুণ-তরুণীরা ছুটেছে…

কবির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাঁর পেছনে এসে বসলাম…

দেখলাম, স্বাক্ষর-শিকারীদের মধ্যে একজনও তাঁর সামনে খাতা ধরলো না…

তাঁর পাশে তৃতীয় শ্রেণীর একজন সিনেমা অভিনেত্রী বসেছিলেন…প্রত্যেক তরুণ-তরুণী তাঁর স্বাক্ষরের জন্যে খাতা বাড়িয়ে

দিল···অভিনেত্রী একটার পর একটা খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে চললেন···

স্বাক্ষরের জন্যে খাতা বাড়িয়ে···

স্বাক্ষর নিয়ে হাসতে হাসতে তরুণ-তরুণীরা চলে গেল···

তাদের সুন্দর পোশাক, সুন্দর মুখ, সুন্দর হাসি মনে হলো বীভৎস, বিকৃত, ভাল্‌গার···

এই শহরের কোন সিনেমা হাউসে একখানি হিন্দি ছবির প্রথম শো হবে…

তিনটের সময় শো আরম্ভ হবে…দুটোর সময় গিয়ে দেখি দশ আনার টিকিটঘরের সামনে জনসমুদ্র…

এবং এই জনসমুদ্রের প্রত্যেকে চেষ্টা করছে, সামনের লোককে ঠেলে ফেলে এগিয়ে যেতে…কেউ কেউ জনতার মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে…এই ধাক্কাধাক্কিতে অধিকাংশ লোকের জামা গেঞ্জি ছিঁড়ে যাচ্ছে…কিন্তু কারুরই ভ্রূক্ষেপ নেই…

পাশ থেকে সেই সিনেমার ম্যানেজার কদর্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে চিৎকার করছেন, লাইন ধরে দাঁড়াও, লাইন ধরে দাঁড়াও!

কে তাঁর কথা শোনে!

মিনিটে মিনিটে ভিড় আর উন্মাদনা বেড়ে ওঠে…টিকিটঘরের বন্ধ জানলা ভেঙে যাবার মতন হলো…

তখন দেখি আট দশ জন বিরাট-দেহ দরোয়ান লম্বা পুরু চামড়ার স্ট্রাপ নিয়ে এসে দুধার থেকে সজোরে জনতার ওপর চালাতে লাগলো…

ছিটকে ছিটকে লোক পড়ে যেতে লাগলো, আবার তখুনি উঠে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করে…

দরোয়ানরা হাত ধরে টেনে ফেলে দেয়, লাথি মারে…আবার তখুনি উঠে তারা ঠেলাঠেলি করে…

এত যে মার খাচ্ছে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই…অথচ তারা যে-ক্লাসের লোক অন্য সময় তাদের একটু চোখ রাঙালে তারা লাঠি তুলে মারতে ছোটে…

কিন্তু ছবি দেখতে এসে তারা উন্মাদ…দাঁড়িয়ে না দেখলে সে উন্মাদনা যে কি ভয়ংকর তা বোঝা যাবে না…

তাদের বঞ্চিত নিরানন্দ জীবনে একজাতীয় হিন্দি ছবি জাগিয়ে তুলেছে অর্ধ-নগ্ন নারী-দেহের দৃষ্টিভোগ···ছবির গান, আবহসংগীত, সুর, এমন কি গানের ভাষা সস্তা মদের মতন কড়া যৌন-আবেশের নেশা ধরিয়ে দেবার জন্যে তৈরি করা হয়···

এই হলো সিনেমার ভাল্‌গার রূপ···

বিষের মতন এই ভাল্‌গারিটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে রাস্তা থেকে আমাদের ঘরে ঢুকছে···

আমরা নির্বিকারভাবে হাসছি···

সেদিন এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাঙালী বাড়িতে গিয়েছিলাম··· বাড়ির কর্তারা কেউ অধ্যাপক, কেউ ডাক্তার, কেউ এঞ্জিনীয়ার···

ডাক্তার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল···এমন সময় তাঁর চার-পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়েটি বেরিয়ে এলো···

সুন্দর শিশু, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে···

কন্যাকে পাশে টেনে নিয়ে ডাক্তার সগৌরবে বললেন, আশ্চর্য মেয়ে, যা একবার শুনবে, অমনি তা মুখস্থ হয়ে যাবে !

তার প্রমাণস্বরূপ তিনি শিশুকে বললেন, কি কি গান শিখেছ, কাকাবাবুকে শুনিয়ে দাও !

নির্বিকার আনন্দে হাসি গেয়ে উঠলো,

—বক্‌ বক্‌ বকুম্‌ পায়···রা···আ···আ···আ···

ভদ্রলোক খুশী হয়ে কন্যাকে জড়িয়ে ধরলেন···

আমি ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলাম···

কারণ সিনেমার এই গানের পায়রাটির জ্বালায় বাড়ি ছেড়ে একদিন আমাকে পালাতে হয়েছিল···

স্বপ্ন দেখেছিলাম, কি সত্যি প্রত্যক্ষ করেছিলাম জানি না, তবে সে-রাত্রির অভিজ্ঞতা আমার মনে গাঁথা রয়ে গিয়েছে···

পাড়ায় সার্বজনীন দুর্গাপূজা হচ্ছে···

আমার ঘরের খুব কাছেই পূজার প্যাণ্ডেল···

পাড়ার মুরুব্বী ছেলেদের হাতে ধরে অনুরোধ করেছিলাম, দোহাই তোমাদের, লাউডস্পীকার বসিয়ো না !

কিন্তু পূজার দিন দেখলাম, একটা নয়, তিনটে লাউডস্পীকার তারা তিন প্রান্তে বসিয়েছে···

মধ্যরাত্রিতে ঘুম ভেঙে গেল, শুনলাম পূজামণ্ডপে লাউডস্পীকারে ভক্ত পূজারীরা বিশ্বজননীকে সারারাত ধরে তাদের প্রিয় সিনেমার গানগুলি রেকর্ড বাজিয়ে শোনাচ্ছে···

কিছুক্ষণ পরেই শুরু হলো,

বক্ বক্ বকুম্ পায়···রা···আ···আ···আ···

এবং বিশ্বাস করুন, উপরি-উপরি দশবার সেই একই রেকর্ড বেজে চললো···

ঘুমুতে পারলাম না···বিছানা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম ···মধ্যরাত্রির নিশুতি রাত্রি···রাস্তার দুই প্রান্তেই দুই লাউডস্পীকার ···যেদিকেই যাই, সেই পায়রা তেড়ে আসে···

হাঁটতে হাঁটতে নির্জন মাঠের দিকে চললাম···একটা ভাঙা পাথরের ওপর বসে পড়লাম···

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি···হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে দেখি, সামনে দীর্ঘকায় এক আলোকমূর্তি।

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি—কে আপনি ?

আলোকমূর্তি বলে, একশো বছর আগে তোমাদের এই শহরে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম···আজ আমি ধ্রুবলোকবাসী !

ততোধিক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি, ধ্রুবলোক ছেড়ে এই লাউডস্পীকার আর ভেজাল খাদ্যের দেশে কি জন্যে এসেছেন ?

—ধ্রুবলোকের নিয়ম হলো, জন্মের একশো বছর পূর্ণ হলে একবার, শেষবারের মতন জন্মস্থান আর জন্মভূমিকে দেখে যেতে হয়, তাই এসেছিলাম বাঙলা দেশে···কিন্তু না এলেই ভাল ছিল !

—কেন ?

—একটা বক্ বক্ বকুম্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো ?

—হ্যাঁ···সিনেমার পায়রা ডাকছে !

আলোকমূর্তি প্রতিবাদ করে উঠলো, না···না···না···ওটা পায়রা নয়, ওটা বাজপাখি···পায়রার গলার আওয়াজ নকল করেছে··· তাড়াও···তাড়াও···পায়রা মনে করে বাজপাখি পুষো না··· সর্বনাশ হয়ে যাবে···সর্বনাশ হয়ে যাবে !

আলোকমূর্তি কুয়াসায় মিলিয়ে গেল···

কানে বাজছে তার শেষ সতর্কবাণী !

———

প্রেমে পড়া

বোধহয় ইংরেজ কবি টেনিসন লিখেছিলেন, **it is better to be loved and lost than never to love at all !**

অর্থাৎ, কাউকে ভালবাসতে পেলাম না, তার চেয়ে ভালবেসে প্রত্যাখ্যাত হওয়া ঢের ভাল !

অর্থাৎ, উপোস দেওয়ার চেয়ে খেয়ে পেটের অসুখ হওয়া ঢের ভাল !

কবির কথার ভাষ্য করলে দাঁড়ায়, ভালবেসে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার একটা জ্বালা আছে, একটা ব্যথা আছে, লজ্জাও আছে···তবু সেটা ভাল, কেননা তাতে জানা যায় ভালবাসার স্বাদ কি !

আর এই পৃথিবীতে মানুষের দেহ-মন নিয়ে এলাম···অথচ ভালবাসার স্বাদ কি তা জানতে পারলাম না···এ শূন্য-মুঠির দৈন্যের চেয়ে পেয়ে হারানোর জ্বালা ঢের ভাল !

কিন্তু আর এক কবি, এই বাঙলাদেশেরই কবি, এই মনোভাবকে যেন ব্যঙ্গ করেই লিখেছেন, কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে !

অর্থাৎ, সাপ আছে জানতে গিয়ে সাপের কামড় খাওয়া, মারাত্মক রসিকতা !

এদেশী কবি বলছেন, ভালবেসে প্রত্যাখ্যাত হওয়া আর বিষাক্ত সাপের ছোবলের মৃত্যুনীল অসহ্য জ্বালা একই জিনিস !

তার চেয়ে ও-পাড়ায় না যাওয়াই ভাল !

তাই বৈষ্ণব কবিরা প্রেম-বিষদগ্ধা শ্রীমতীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, যে দেশে পিরিতি আছে, সে দেশে আর যাব না···

যে লোক এই ভুবনে পি-রী-তি এই তিনটে অক্ষরকে এনেছিল, ব্যথার জ্বালায় শ্রীমতী তাকে অভিশাপও দিয়েছেন।

তবুও···

কি তীব্র নেশা এই বিষ-জ্বালার,—এত কান্না, এত ব্যথা, এত রামায়ণ, এত ট্রয়-ধ্বংসের পরেও···মানুষের রক্ত-কণিকায় কণিকায় মিশিয়ে রয়েছে, অমৃত হোক, বিষ হোক, প্রেমের একটু ছোঁয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা!

সারাজীবন নারী-ভোগের পর রাজা ভর্তৃহরির যেদিন বৈরাগ্য এলো, অনাগত মানুষদের সাবধান করবার জন্যে তিনি বৈরাগ্যশতক লিখলেন···

শতকের একটি শ্লোকে তিনি আক্ষেপ করে লিখছেন, গলায় বন্ধন-রজ্জু, অনাহারে কংকালসার পথ-কুক্কুর, সে-ও কুক্কুরীকে দেখে খাদ্য-অন্বেষণ ছেড়ে তার পেছনে ছোটে!

রাজা ভর্তৃহরি বলছেন, এ কামনার শেষ নেই, এ আগুনের নির্বাণ নেই, এ তৃষ্ণার বার্ধক্য নেই···তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে···

···একমাত্র এই তৃষ্ণা এক পাত্র জল নিঃশেষিত করে আর এক পাত্রের জন্যে লেলিহান হয়ে ওঠে···

•

ভোগ-বিতৃষ্ণ রাজা ভর্তৃহরি যে কামনাকে ভয়ংকররূপে দেখেছেন, সে প্রেম নয়—তার নাম কাম···

ভাল ও মন্দের ঊর্ধ্বে, এই কাম হলো সৃজনের সহচর···

আমাদের বিবাহ-মন্ত্রে এই কামস্তুতি অগ্নির সামনে উচ্চারণ করতে হয়···

কাম-সমুদ্র থেকে আমরা এসেছি, আবার কাম-সমুদ্রে ফিরে যাব···

সমস্ত প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে এই কাম···

এরই অন্ধ অনুশাসনে জীব-জীবন চলেছে মৃত্যুর ছেদকে অস্বীকার করে অবিরাম বিবর্তনের চক্র থেকে চক্রান্তরে…

ভাল ও মন্দ, সুনীতি ও দুর্নীতির বাইরে এর একমাত্র কাজ হলো বীজকে রক্ষা করা…

সমস্ত প্রকৃতি হলো তার একাধিপত্য…

প্রকৃতির রাজ্যে প্রেম নেই, আছে শুধু কাম…instinct… অন্তর্গূঢ় তার নিজের বাঁধা নিয়মে সে চলে…সেখানে ইচ্ছা-অনিচ্ছার বালাই নেই…

প্রেম এলো মানুষের সঙ্গে…মনের সঙ্গে…

প্রেম হলো মানুষের মনের সৃজন-উল্লাস…প্রকৃতিগত instinct-এর ওপরে ওঠবার মানুষের মহাপ্রয়াস…instinct-এর ভস্মস্তূপে, মদন ভস্মের পর তার জন্ম…

মানুষের ব্যথা, আনন্দ আর গর্ব—সে বলতে পারে,

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।"

…প্রেম মানুষের মনের রচনা…মানুষ তাকে তার মনের রামধনু-রঙে, হাজার কথায়, হাজার ব্যথায়, হাজার কান্নায় বিচিত্র করে তোলে…

দুর্লভ অমৃতের স্বাদের লোভে মানুষ প্রেমকে নিত্য নবরূপে সৃজন করে চলে…প্রেমাস্পদ যত দুর্লভ, প্রেম তত গভীর…

কাম স্বয়ং প্রভু…অন্য কারুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন ধার ধারে না …একটি মাত্র তার রূপ…একটি মাত্র তার পথ…যোনিসর্বস্ব সে…

এই কামের নির্দয় প্রভুত্বের একঘেয়েমি থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার জন্যে মানুষ দ্বিতীয় স্বর্গলোকের মতন প্রেমকে আবিষ্কার করেছে…

কাম মানুষের সহজাত…প্রেম মানুষের তপস্যা…

এই তপস্যায় পার্বতী হয় উমা…

কৈলাসের রিক্ত তুষার-শুভ্রতায় আনে অকাল-বসন্তের অজস্রতা…

চির বৈরাগী শ্মশানচারী শিবের বুকে জাগায় নব-সৃজনের উল্লাস···

নিজের সৃজিত এই প্রেমের দুর্লভতার কাছে বার বার পরাভূত হয়েও মানুষ পায় আনন্দ···ব্যথামিশ্রিত এক বিচিত্র আনন্দ···

প্রেমাস্পদকে না পেলেও প্রেম তাকে দিয়ে যায় এক বিচিত্র মাধুরী···জীবনের নব আস্বাদনের মাধুরী···নব-স্বর্গ রচনার মাধুরী··· দেহকে ছাড়িয়ে দেহ-সঙ্গ-বোধের মাধুরী···

প্রেমে বিচ্ছেদ আছে···কিন্তু রিক্ততা নেই···

আনন্দ আছে কিন্তু পরিতৃপ্তি নেই···

আঘাত আছে কিন্তু অবসাদ নেই···

অর্ধেক কল্পনা, অর্ধেক বাস্তবতা···তাই অশেষ।

শেষ-ভয়-কণ্টকিত পৃথিবীতে একটা অ-শেষ অবলম্বন মানুষের দরকার ছিল···

মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামের প্রেম মানুষের সেই সর্বোত্তম আবিষ্কার···

তাই প্রেমের একটিই মিনতি, আমাকে ভুলো না!

প্রকৃতি অরণ্যচারী পশুকে যা দিয়েছে, মানুষকেও তা দিয়েছে··· sex-urge, যৌন-ক্ষুধা···

যে মাটিতে প্রাণীর জন্ম, সে মাটির সঙ্গে মেশানো আছে এই যৌন-ক্ষুধা···

এই যৌন-ক্ষুধাই পুরুষ-প্রাণীকে টেনে নিয়ে আসে নারীর কাছে ···চতুর্দশী নারীর দেহের অকস্মাৎ পরিবর্তনে সেই ক্ষুধার পরিতৃপ্তিরই আমন্ত্রণ···

বৃক্ষে লতায় পশুতে পাখিতে সর্বত্র প্রকৃতি বিস্ময়কর সুকৌশলে এই যৌন-আবেদনকে গেঁথে রেখেছে, যাতে পুরুষ আর নারী পরস্পর স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়, কারণ প্রকৃতির প্রয়োজন নব-বীজ-সৃষ্টি···

এই নিয়মের নির্দিষ্টতার এতটুকু বাইরে প্রকৃতির রাজ্যে কেউ যেতে পারে না···

একই নিয়মের কোটি কোটি একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে প্রকৃতিতে চলেছে পুরুষ আর নারীর সঙ্গম···

যদিও আজ বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন, পশুদের মধ্যেও সঙ্গমের আগে মনোরঞ্জন আছে কিন্তু সে মনোরঞ্জন-প্রথাও নির্দিষ্ট, নিয়মে-বাঁধা, একঘেয়ে···

মানুষ ক্রমশঃ প্রকৃতির এই যৌন-শাসনের একঘেয়েমি থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রেমের সৃষ্টি করলো···

প্রেম যদি না আসতো, সুন্দরবনের বাঘ আর বাঘিনীর যৌন-জীবন কিংবা কুকুর-বেড়ালের যৌন-জীবন থেকে আমাদের যৌন-জীবনের কোন তফাত থাকতো না···

আঁন্দ্রে মোরাও অতি সহজে এই তফাতটা বুঝিয়েছেন···

তিনি বলছেন, এই তফাতটা যে কতখানি হয়েছে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি, যখন কোন পশুর সঙ্গম-লীলা দেখি, তার পর কোন তরুণের প্রথম প্রেমপত্র যদি পড়ি!

যোনি-সর্বস্বতার আতঙ্ক থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মানুষ প্রেমের সৃষ্টি করেছে···

প্রেমের উপাদানে যতই কল্পনার উন্মাদনা থাকুক না কেন, মানুষের মনের স্বধর্মই হলো সেক্স্‌কে প্রেমে রূপান্তরিত করা···

নইলে, পৃথিবীতে মেঘদূত লেখা হতো না···সব গান সব কবিতা থেমে যেতো···

আজ ইওরোপ আমেরিকায়, সাহিত্যে ও জীবনে একটা নতুন আন্দোলন এসেছে, প্রেমের আদর্শগত অবগুণ্ঠনকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সেক্স্‌কে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করা···তার ফলে প্রেম-করার রীতি-নীতিও বদলে যাচ্ছে···

এবং আমাদের দেশের সাহিত্যে ও সমাজে তার ঢেউ এসে লাগছে…

কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি, সেক্‌স্-এর এই বাস্তবতার মধ্যে এমন একটা একঘেয়েমি আছে যা দুদিন পরেই আমাদের মনকে পীড়িত করে তুলবে…

যে আড়ালকে আজ ভাঙছি, সেদিন বুঝতে পারবো একান্ত প্রয়োজনেই সেই আড়ালকে আমরা রচনা করেছিলাম…

এ আগুনকে উপভোগ করতে হলে একটা আবরণ দরকার…

আবরণ-হীন বিদ্যুৎ অপমৃত্যু আনে, আবরণে বদ্ধ বিদ্যুৎ আলো আর শক্তি দেয়…

সেক্‌স্ আবরণ-হীন বিদ্যুৎ…প্রতিদিনের জীবনে তাকে ব্যবহার করতে হলে প্রেমের আবরণ দরকার…

কিন্তু সে অন্য কথা…

বিশ্বকবি তাঁর প্রথম জীবনে গেয়েছিলেন,

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কখন কে পড়ে কে তা জানে !

কিন্তু এত দীর্ঘকাল ধরে এত লোক এই ফাঁদে পড়েছে যে, স্বভাবতঃই জানতে ইচ্ছা যায় যে এই ফাঁদে পড়ার বা তা থেকে উদ্ধার পাবার কোন নিয়মকানুন কেউ আবিষ্কার করেছেন কি না !

বৈজ্ঞানিক ছাড়া, দুচারজন রসিক লোক তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে চেষ্টা করেছেন এ সম্বন্ধে মানুষকে সজাগ করবার… কিন্তু তাঁরা সব পশ্চিমের লোক…

আমাদের দেশে একজন ঋষি অবশ্য চরম দুঃসাহস দেখিয়ে কামকে নিয়ে শাস্ত্র রচনা করেছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর শাস্ত্রে যে-

সমাজের কথা, যেসব নর-নারীর কথা লিখেছিলেন, সে, সমাজ আজ চৌষট্টি-কলা-অভিজ্ঞা বারবনিতার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে শতবনিতাসঙ্গ-সুখী নরপতির দল···

আজ অন্য জগৎ···অন্য মন···অন্য মনস্তত্ত্ব···

তা ছাড়া আমাদের দেশের প্রাচীন অলংকার-শাস্ত্রের অনুশাসনে কোন সাহিত্যিক বা কোন কবিই তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমের কথা বলবার প্রেরণা পান নি···তাঁদের অধিকার ছিল একমাত্র দেবতা বা রাজার প্রেমের কথা বলবার···

মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের লঘু-দীর্ঘ উচ্চারণের ফাঁকে ফাঁকে হয়ত কালিদাসের ব্যক্তিগত দীর্ঘশ্বাসের স্পর্শ পাওয়া যায় কিন্তু তবুও তাঁকে এক নির্বাসিত যক্ষকে সামনে রাখতে হয়েছিল···

সংস্কৃত-শাসনের যুগ যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন এই চির-অশান্ত বাঙলাদেশেই দেশজ ভাষায় একদল কবি মর্মের কথা গেয়ে উঠলেন···কিন্তু তাঁরাও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রেম-বিরহের কাহিনীকে নিঃশেষে লুকিয়ে ফেললেন···

কিন্তু দেবতার বিগ্রহের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে ফেললেও, দুরন্ত দুঃসাহসে তাঁরা দেবতাকে মানুষ করে গড়লেন···

যে-প্রেম, যে-বিরহ, যে-ব্যথা-বিচ্ছেদ মানুষের, তাই দিয়েই দেবতাকে গড়ে তুললেন···

তাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে প্রেমের সূচনা ও পরিণতির একটা ক্রমিক ধারা দেখতে পাওয়া যায়···

নায়কের প্রথমদর্শন···নায়িকার প্রথমদর্শন···পুরুষের পূর্বরাগ···নারীর পূর্বরাগ···রূপ-বর্ণনা···ছদ্মবেশে মিলন···মান···অভিমান···অভিসার···ব্যর্থ অভিসার···মাথুর বা বিরহ···ইত্যাদি···

এই থেকে বৈষ্ণব-রসিকরা একটা অপরূপ রস-শাস্ত্র গড়ে তুললেন ···তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো উজ্জ্বলরসনীলমণি···

কিন্তু এই রসশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক···

এবং প্রত্যেক শাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের মতন নির্দিষ্ট তত্ত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ…

এ প্রদীপ নিয়ে প্রতিদিনের রাস্তায় চলা যায় না…এ হলো নিভৃত ঘরের দীপশিখা…

প্রেমের ব্যক্তিগত রূপের বিচিত্র প্রকাশের জন্যে পাশ্চাত্ত্য দেশে যেতে হয়…

তার কারণ এ নয় যে আমাদের দেশের লোক প্রেমে পড়ে না… প্রেমে আমরাও পড়ি কিন্তু তার কথা আদালতের রিপোর্টের বাইরে আর প্রকাশিত হয় না…

আমাদের দেশেও ক্যাসানোভা বা বায়রন জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁদের জীবনী লেখা হয় না…আমরা প্রেমের কবিতা লিখি, কিন্তু প্রেম করেছি, এ কথাটা সযত্নে ঢেকে যাই…

আমাদের দেশের বায়রন বা ক্যাসানোভার জীবনী যদি লেখা হয়, তাহলে সে জীবনীতে একটি সংবাদই পাব…সে সংবাদটি হলো, তিনি একান্ত সাধু-পুরুষ ছিলেন…যদি তিনি অবিবাহিত হন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন…আর যদি বিবাহিত হন, জীবনীকার নিশ্চয়ই লিখবেন, তিনি পত্নীগতপ্রাণ আদর্শ স্বামী ছিলেন !

আমাদের দেশে কৃতী পুরুষের অভাব নেই…ইতিহাস-বিখ্যাত কর্মীরও অভাব নেই…তাঁদের জীবনীও আছে, কিন্তু সে-সব জীবনী থেকে তাঁদের অস্তিত্বের যেটা অন্তরঙ্গতম সুর, সেটা সযত্নে বাদ দেওয়া হয়…

গ্যেটের জীবনের সমস্ত প্রেম-কাহিনী সুবিস্তৃতভাবে আমরা জানি, শেলী বা বায়রনের জীবনে কোন্ নারী কতটা বা কতটুকু দোলা দিয়ে গিয়েছিল, তার প্রতিদিনের কাহিনী পর্যন্ত জানি, কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোন একটি মর্ম-কাহিনীও আমরা সঠিকভাবে জানি না···অথচ এতবড় প্রেমের কবি বহু শতাব্দীতে আর জন্মগ্রহণ করে নি !

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও, এখানে অধ্যাপক-সাহিত্যিক জগদীশ ভট্টাচার্যকে আমার অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কি অসাধ্য পরিশ্রম করে তিনি প্রচলিত ভক্তির উজান-পথে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভেতর থেকে তাঁর অসামান্য প্রেমজীবনের কাহিনীকে নীরবতার ষড়যন্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন !

অধ্যাপক নির্মল বসু যখন মহাত্মা গান্ধীর অন্তরঙ্গ জীবনের আংশিক ইতিহাস লিখছিলেন···তিনি আমাদের সেই লেখা পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন···তাতে তিনি এই বিরাট পুরুষের অন্তরের সংগোপন উৎসের সন্ধানে যা দেখেছিলেন, তার কথা অকপট নিষ্ঠায় ও সম্ভ্রমে লিখেছিলেন···জানি না, সে লেখা প্রকাশিত হয়েছে কিনা···কারণ প্রকাশে বাধা ছিল অনেক···

পাশ্চাত্ত্য দেশে এ বাধা নেই···সে দেশের কৃতী পুরুষেরা যতই কৃতী হোন না কেন, দেবতা হয়ে যান না, মানুষই থাকেন !

তাই পাশ্চাত্ত্যের কৃতী পুরুষদের মর্মের অন্তরঙ্গ কাহিনীরও সব খবর আমরা পাই···

এবং সে-অন্তরঙ্গ খবর তাঁরা নিজেরাই রেখে যান···তাতে একটা সুবিধা হয়, বিকৃত হবার সম্ভাবনা থাকে না···

এইভাবে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ক্যাসানোভার আত্মচরিতের মতন বহু ক্লাসিক বই আছে যা থেকে আমরা প্রেমের নিগূঢ় ইতিহাসের বহু নিখুঁত পরিচয় পাই···তার মধ্যে শেষতম দুটি অপরূপ বাস্তব জীবন-কাহিনী আমরা জানবার সুযোগ পেয়েছি, একই প্রেমের দুটি কাহিনী, একটি পুরুষের লেখা, অপরটি নারীর লেখা···অষ্টম এডওয়ার্ড আর মিসেস্ সিম্‌সনের অপরূপ প্রেম-কাহিনী···তাঁরা দুজনেই লিখেছেন তাঁদের মর্মকাহিনী···

এ ছাড়া ইওরোপীয় সাহিত্যে তিনজন বড় সাহিত্যিক প্রেম সম্বন্ধে তাঁদের জীবনের বহু অভিজ্ঞতা থেকে তিনখানি ক্লাসিক বই লিখে গিয়েছেন…সে তিনজন হলেন, Ovid, Stendahl আর Balzac…

কিন্তু কথা হলো, প্রেমে-পড়া এমন একটা ব্যাপার, যার সঙ্গে বই-পড়া-বিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই…

রেলের টাইম-টেবল পড়ে ভ্রমণের সাধ মেটে না…টিকিট কেটে রেলে উঠলে টাইমটেবল সঙ্গে থাকলে সুবিধা হয়…না থাকলে কিছু যায় আসে না !

বিশ্বকবির ভাষায়, ভুবন জুড়ে প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে…কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে এক-একটি আলাদা ফাঁদ নির্দিষ্ট আছে !

লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কোথায় একটি লোক আছে যাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে…সেই একটি বিশেষ লোককেই বার বার দেখবার জন্যে, তার কাছে যাবার জন্যে মনে শুরু হয়ে যায় এক বিচিত্র সজাগতা…মনে হয়, পৃথিবী আমাকে যা দিতে পারে, সেই একটি লোকের হাত দিয়েই আমি তা পাব…সে হাসলেই আকাশ হেসে উঠবে, সে কথা বললেই তারায় তারায় কথা জেগে উঠবে…যে পুঁথির মানে এতদিন নিরর্থক ছিল, সে পাশে এলেই আপনা থেকে তাতে মানে ধরা পড়বে…

এই হলো প্রেমে-পড়ার শুরু…

কেন এমন হয় ?

কি করেই বা এমন অসম্ভব সম্ভব হয় ?

সেই কথাই বলবো…

প্রেমে-পড়ার পর

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এত লোক থাকতে কেন বিশেষ একটি লোককে আমরা বেছে নিয়ে বলি, আত্মার আত্মীয় তুমি!

কেনই বা সেই একটি বিশেষ লোকের প্রতি এইভাবে আকৃষ্ট হই?

এ-কূলে ও-কূলে গোকুলে বহু লোক আসে যায়, কেন রাধার অন্তর কাঁদে শুধু একটি লোকের জন্যে যাকে কাছে পাওয়া তার সব চেয়ে বেশী বিড়ম্বনা?

যাকে কখনো দেখি নি, জানি না, চিনি না, হঠাৎ কেন তাকে দেখেই মনে হয় এমন মোহনীয় রূপ জগতে আর নেই? কিছুতেই কেন তখন নজরে পড়ে না, সেই মোহনীয় রূপ যার তার চলন বাঁকা, চোখ ছোট, নাকটা মুখের অনুপাতে প্রকাণ্ড বড়, দুই দাঁতের মাঝখানে বিশ্রী ফাঁক? কেউ যদি সেই ত্রুটী দেখিয়েও দেয়, কেন মন বলে ওঠে, দুই দাঁতের মাঝখানে ওই এইটুকু ফাঁক হাসিটাকে আরও বিচিত্র মধুর করে তুলেছে, তাই না?

কেন এমন হয়?

আদিরসের পরম আচার্য বৈষ্ণব কবিরা বিরহিণী শ্রীমতীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, আমার কাল হলো যমুনায় জল আনতে যাওয়া, আমার কাল হলো কদম্ব-তলার দিকে যাওয়া, কাল হলো বাঁশি শোনা, আর কাল হলো আমার নয়া যৌবন!

আদিরসের যাঁরা আধুনিক আচার্য, তাঁরাও বলেন, যারা প্রেমে পড়ে, এই 'নয়া যৌবন'ই তাদের কাল হয়···

বৈষ্ণব কবিরা যাকে নয়া যৌবন বলেছেন, আধুনিক যৌন-তত্ত্ব-বিদেরা তাকে বলেন, adolescence, কৈশোর চলে গিয়ে যখন দেহে, দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আগতপ্রায় যৌবনের নতুন পদধ্বনি বেজে ওঠে···বয়ঃসন্ধিক্ষণ···

আগুনের স্বধর্ম যেমন উত্তাপ, চুম্বকের স্বধর্ম যেমন লোহাকে আকর্ষণ করা, তেমনি এই বয়ঃসন্ধিক্ষণ বা নয়া যৌবনের স্বধর্মই হলো, প্রেমে-পড়ার জন্যে দেহ-মনকে উন্মুখ করে রাখা···

এই সময় দেহের ভেতর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে নীরবে যে প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটে যায়, তার ফলে অকস্মাৎ মনের মধ্যে জেগে ওঠে, যৌন-তত্ত্ববিদেরা যাকে বলেছেন a pleasant sense of anticipation !

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখন দেহে মনে জেগে ওঠে একটা উন্মুখ প্রতীক্ষা !

যেন কার আসবার কথা আছে, সে আসবে···সে আসবে···

পৃথিবীর যেদিকে তখন চাও, লতায় পাতায় ফলে ফুলে তারায় তারায় শুধু সেই একটি সংবাদেরই বিজ্ঞাপন, সে আসবে !

"আমার যৌবন-স্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ"···

এই উন্মুখ প্রতীক্ষার লগ্নে যে প্রথম এসে দরজার করাঘাত করে, মন তখুনি বলে ওঠে, সে এসেছে !

করাঘাতেরও দরকার করে না, মন তখন প্রতীক্ষার উন্মাদনায় এমনি তন্ময় হয়ে থাকে যে, কল্পনায় সে তখন তার মনের দোসরকে গড়ে তোলে···

মনের এই অপরূপ গোধূলি-লগ্নে তরুণেরা কাব্যের উপেক্ষিতার জন্যে নিদ্রাহীন একক শয্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে···কাব্যের বা উপন্যাসের নায়িকাদের সঙ্গে মানস-রমণ করে···

সন্ধ্যাসংগীতের কবির ভাষায় তখন আকাশে আকাশে ফুটে ওঠে উর্বশীর আমন্ত্রণ···

তরুণীরা এই সময়, ফরাসীরা বলে, কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপককে গোপনে প্রেমপত্র লেখে এবং সে-পত্র ছিঁড়ে ফেলে মনে করে যে পাঠানো হয়েছে! এই সময় কুমারী মেয়ে তার শুভ্র লজ্জায় অন্তরের নিভৃত বেদীতে বীর-পূজা করে···

আধুনিক কুমারীরা সিনেমার নায়ককে···

আধুনিকা কুমারী এই সময়, বীরের অভাবে, সিনেমার নায়ককে ভালবাসে···ফুটবল বা ক্রিকেটের মাঠের 'হীরো'-র ছবি বিনি-সুতোয় মনে গেঁথে তোলে···

ফউস্ট তখন হেলেনকে হারিয়ে একেবারে স্থবির হয়ে পড়েছে ···জীবনে কোথাও কোন উদ্যম নেই···মেফিস্টোফেলিস্ তার সামনে একটা পাত্র ধরে বলে, এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়ে খেয়ে নাও!

ফউস্ট জিজ্ঞাসা করে, কি আছে ওতে ?

গ্যয়টের শয়তান বলে, নব-যৌবন-রসায়ন···পান করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নারীর মধ্যে তোমার হেলেনকেই দেখতে পাবে !

নব-যৌবনে বা বয়ঃসন্ধিক্ষণে প্রকৃতি পুরুষ ও নারীর দেহে এই উন্মুখ প্রতীক্ষাকে জাগিয়ে তোলে বলেই, জীবনের পরিধির মধ্যে তখন মনোমত যে প্রথম এসে পড়ে, তাকেই প্রাণের আসন ছেড়ে দিই···

প্রতীক্ষার এই সুতীব্র ব্যাকুলতায় বিচার-বিশ্লেষণের বালাই থাকে না···

বিচার-বিশ্লেষণ আসে পরে, যখন এই প্রতীক্ষার উন্মাদনার বিস্ময় কেটে যায়, প্রতিদিনের পরিচয়ের পুনরাবৃত্তিতে !

প্রেম যখন আসে, তখন তার আকুলতার ঐকান্তিকতায় সে একটা মায়া-আবরণের সৃষ্টি করে, যে-আবরণে পরস্পরের ত্রুটী চোখেই পড়ে না···

বাঙালী হিন্দুর বিয়েতে পুরানো একটা স্ত্রী-আচার আছে···শুভ-দৃষ্টির আগে একজন রসিকা সধবা এসে বর ও বধূর চোখে মায়াজল বা মায়াকাজল ছুঁইয়ে দেন···সেই মায়াকাজলের সম্মোহনে শুভ-দৃষ্টির সময় যেন তারা পরস্পরকে অনিন্দ্যসুন্দর দেখে !

প্রকৃতি নিজের গরজে প্রেমিক-প্রেমিকার চোখে প্রথম দর্শনের সময় এই মায়াঞ্জন বুলিয়ে দেয়···নইলে সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনের ব্যাপারে মানুষ বুদ্ধি ও বিচারের পাল্লায় বিপন্ন হয়ে পড়তো···এই সম্মোহনের মধুর অনিবার্যতায় প্রকৃতি যোনি-শৃঙ্খলের একঘেয়েমির বিভীষিকাকে বুদ্ধি-চালিত মানুষের কাছ থেকে অতি কৌশলে লুকিয়ে রেখেছে···

এই ব্যাপারে প্রকৃতি এত সজাগ যে প্রথম বয়ঃসন্ধিক্ষণের সময় মানুষের যে স্বাভাবিক প্রেম-প্রবণতা জাগে, তারপরও আর একবার যখন মানুষ যৌবনের আধিপত্যের সীমানা ছাড়িয়ে বার্ধক্যের দিকে পা বাড়ায়, যখন পুরুষের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি আর নারীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি আসে, সেই সময় আর একবার প্রকৃতি দেহ-মনকে বিচারহীন প্রেম-প্রবণ করে তোলে। সেইজন্যে দেখা যায়, একান্ত সংযত জীবন যাপন করে এসে হঠাৎ জীবনের এই মধ্যপথে অনেক পুরুষ প্রেম-চঞ্চল হয়ে উঠেছে···

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী উপন্যাসে এই জাতীয় প্রৌঢ় নর-নারীর প্রেম-উন্মাদনার বহু বিচিত্র কাহিনী দেখা যায়···

দুষ্মন্ত যেদিন মৃগয়া করতে এসে হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বল্কলবাসা শকুন্তলাকে দেখেছিলেন, সেদিন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছিই ছিল এবং কালিদাস তাঁর সেই প্রণয়-মুগ্ধতা যেভাবে এঁকেছেন, তার সঙ্গে তরুণ-জীবনের প্রথম-প্রণয়-মূঢ়তার কোন পার্থক্য নেই···

প্রথম বয়ঃসন্ধিক্ষণের প্রণয়-মুগ্ধতার মধ্যে যে অতিরিক্ততা থাকে, যৌবনের অনভিজ্ঞ স্বভাব-চঞ্চলতার মধ্যে তাকে বেমানান মনে হয় না···কিন্তু প্রৌঢ়-জীবনের এই দ্বিতীয় আক্রমণ নর-নারীকে যেভাবে প্রেম-মূঢ় করে তোলে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা সকরুণ হাসির উপাদান থেকে যায়···

যে ব্যালজাক শত শত মানুষের চরিত্র অমর করে এঁকে গিয়েছেন, সেই সব বিচিত্র চরিত্রের এতটুকু হাস্যকর চ্যুতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে প্রৌঢ়বয়সে এক অসম্ভব প্রেমের উন্মাদনায় দিনের পর দিন যে হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, তার সকরুণ ট্রাজেডি আজ মনকে ব্যথিতই করে তোলে···

এই প্রৌঢ়-প্রেমের আকুলতা ও আত্মনিগ্রহ, লজ্জা ও জ্বালা,

জয়-পরাজয়ের সূক্ষ্ম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব Stendhal তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস The Charterhouse of Parma-তে Count Moscaর অপূর্ব চরিত্রে অমর করে এঁকে গিয়েছেন•••

বয়ঃসন্ধিক্ষণের স্বভাবধর্মের প্রভাব ছাড়া, প্রেমে-পড়ার দ্বিতীয় একটা প্রকরণ আছে···সেটাকে আমরা বলি, প্রথম দর্শনেই প্রেম··· Love at first sight !

বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতন প্রথম দর্শনেই সমস্ত ভেতরটা কেঁপে উঠলো··· শুধু একটি নিমেষ, দুজন দুজনকে দেখলো···কেউ কোন কথা বললো না, কোন জিজ্ঞাসার আদান-প্রদান হলো না···অথচ সেই একটি নিমেষের মধ্যে মন-দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেল···!

শ্রীমতী গিয়েছিলেন শূন্য কুম্ভ নিয়ে যমুনায় জল আনতে···সেই একটি নিমেষের দর্শনে সব ভুলে শূন্য কুম্ভ কাঁখে নিয়েই শ্রীমতী জাবটে তাঁর ঘরে ফিরে এলেন···

শূন্য কুম্ভ দেখে ননদিনী বলে, জল কই ? কি আনলে যমুনা থেকে ?

জ্ঞানদাস বলছেন, ননদিনী, শ্রীমতী জলই এনেছে, তবে কুম্ভে নয়, চেয়ে দেখ নয়নে !

সেই দিন থেকে—

"রাধার অন্তরে কি হলো ব্যথা
কেন বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা !"

এই প্রথম-দর্শনে-প্রেমে-পড়ার পেছনে আছে, যাকে বলে ভবিতব্যতা···জন্মান্তরের স্মৃতি···

হিসেব মেলাবার জন্যে এই ভবিতব্যতার তত্ত্বকে প্রাচীন সভ্যতা স্বীকার করে নেয়···

নর-নারীর মিলন ব্যাপারে ভারতবর্ষ বহুকাল থেকে এই তত্ত্বকেই মেনে আসছে···

প্রত্যেকের ধর্মগুরু যেমন পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তেমনি প্রণয়-গুরুও পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে···

কুমারসম্ভবে কালিদাস সেই কথাই বলেছেন···

মেনকা-মার মনে দুর্ভাবনা, মেয়ে পার্বতী পূর্ণ-যৌবনা অথচ সে শিশুর মতন তার খেলা আর খেলাঘর নিয়ে মেতে থাকে···

নারদ এসে বলেন, বৃথা ভাবনা করছো মেনকা! জন্মান্তরের বিস্মৃতির ফলে পার্বতী শুধু ভুলে আছে···বিস্মৃতির দ্বার একটু খুলে দিলেই দেখবে, এক নিমেষে ওর সব মনে পড়ে যাবে···ওর স্বামী তো নির্দিষ্ট হয়েই আছে!

নারদ গোপনে খেলা-রসে-মত্ত নবীনা কিশোরীর কানে কি মন্ত্র জপেন, এক নিমেষে জেগে ওঠে তার পূর্ব-স্মৃতি···খেলাঘর ফেলে, রাজার কুমারী একাকিনী চলে তুষার-পথে শিব-উদ্দেশে···

বেদনায় বিস্ময়ে মেনকা-মা অশ্রুজলে মিনতি করেন, উ মা! যেয়ো না!

কোন বাধা, কোন মিনতি আর তাকে ধরে রাখতে পারে না··· পার্বতী হয় উমা···

পার্বতীর বেলায় নারদ যে-কাজটুকু করেছিলেন, সাধারণ মানব-মানবীর বেলায় প্রথম দর্শনের সেই মায়ামুহূর্তে সামান্য একটি দৃষ্টিপাতে, অকস্মাৎ একটু অতর্কিত স্পর্শে বিস্মৃতির সেই রুদ্ধ-দ্বার হঠাৎ খুলে যায়···অর্ধ-অঙ্গ যেন তার বাকী অর্ধেকের সন্ধান পেয়ে যায়···

প্রাচীন গ্রীক পুরাণের এক কাহিনীতে বলে, একসময় নাকি পুরুষ আর নারী অর্ধনারীশ্বর দেবতার মতন এক-দেহেই সংযুক্ত ছিল···সৃষ্টির অধিপতি একদিন কি খেয়ালে তাদের বিযুক্ত করে দিলেন···সেই থেকে বিযুক্ত অর্ধ-অঙ্গ তার বাকী অর্ধেককে খুঁজে

বেড়াচ্ছে…এবং যখন দেখা পায় তখন স্বর্গ-মর্ত্য-ভোলা প্রচণ্ড আবেগে পরস্পর সংযুক্ত হবার চেষ্টা করে…

প্রথম-দর্শনে-প্রেমের অকস্মাৎ আকুলতার পেছনে আছে এই ভবিতব্যতার রহস্য…

রূপক বাদ দিলে এর ভেতর একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সন্ধান মেলে…

প্রত্যেক মানুষের মনে, প্রচ্ছন্ন অথবা প্রত্যক্ষভাবে, নিজস্ব একটা রূপের আদর্শ, সুন্দরতার একটা ব্যক্তিগত ধারণা গড়ে উঠতে থাকে…যখনই বিপরীত সেক্সের মধ্যে সেই কাম্য রূপের বা সুন্দরতার স্পষ্ট আভাস দেখতে পায় তখনি সে আকৃষ্ট হয়…

এই আকর্ষণ হলো প্রেমে-পড়ার সূত্রপাত…আদিপর্ব…

কিন্তু এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে পথে-ঘাটে বিস্মৃত সেই অর্ধ-অঙ্গকে খুঁজে বেড়ানো যুক্তিসংগত নয়…মারাত্মকও হতে পারে…

কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ নর-নারীর জীবনে প্রেম অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকে, ঝড়ের উন্মাদ মাতনে, একটি নিমেষের অতর্কিত রথ-ঘর্ঘরে দেখা দেয় না…

অধিকাংশ নর-নারীর জীবনে প্রেম নিঃশব্দে ছদ্মবেশে একান্ত শান্তভাবে মন্ত্র-পড়া পুরুতের আড়ালে দেখা দেয়…

প্রেমিকার পরিবর্তে সামনে থাকে ঠিকুজী-কুষ্ঠী-মেলানো নববধূ …প্রেমিকের বদলে নারীর সামনে থাকে গুরুজন-নির্বাচিত একজন অপরিচিত ভদ্রলোক…

পাদরী বা পুরোহিত বা মৌলভীর মারফত প্রকৃতি বলে দেয়, অতঃপর তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে, প্রেমে সংযুক্ত থেকে প্রজা-বৃদ্ধি কর!

এ প্রেমের সঙ্গে রোমান্টিক প্রেমের চেহারার মিল নেই…তাই

অনেকে মনে করেন, চিনি-দিয়ে-মোড়া কুইনাইনের মতন বিবাহিত-প্রেমের ওপরটা শুধু একটা পাতলা প্রেমের মোড়ক দেওয়া, ভেতরটা তেতো কর্তব্য !

এ যেন প্রেমের প্রলোভন দেখিয়ে নর-নারীকে প্রজা-বৃদ্ধিতে প্রলুব্ধ করার প্রকৃতির হীন ষড়যন্ত্র !

এবং বিয়ের বছরখানেক যেতে না যেতেই বর ও বধূর কাছে প্রকৃতির এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়…

এবং দুপক্ষই মনে করে তারা ঠকে গিয়েছে…বিয়ের মন্ত্রের সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের গলায় যে মালা পরিয়ে দিয়েছিল, সংগোপন আতঙ্কে দেখে সে মালা নয়, প্রেমহীন বন্ধন-শৃঙ্খল !

ওদের দেশেও নব-দম্পতি 'হনি-মুন' বা মধুচন্দ্রিকা থেকে ফেরবার পথেই আতঙ্কে ভাবে, মধু যা ছিল তা তো ফুরিয়ে গেল, পড়ে রইলো কি শুধু মৌমাছির কামড় ?

তাই বিশ্ব-চরাচরে আজ মানুষের সমাজে জিজ্ঞাসা উঠছে, বিবাহিত প্রেমকে কি করে বাঁচিয়ে রাখা যায় ? বাঁচিয়ে রাখা কি সম্ভব ?

"শেষের কবিতা"য় রবীন্দ্রনাথ আজকের মানুষের এই আর্ত জিজ্ঞাসারই একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন…

কিন্তু সে কথার আলোচনা আজকে নয়…

প্রথম দর্শনে প্রেমের যে অঙ্কুর জাগে, বহু বহু জলসিঞ্চন লাগে তবে সেই অঙ্কুর প্রেম-পাদপে পরিণত হয়…বৈষ্ণব-কবির ভাষায় বহু নয়ন-জলের সার লাগে তবে প্রেম-পাদপে ফুল দেখা দেয়…

প্রেমের জন্ম আর মহা-প্রয়াণের মধ্যে আছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-সমেত অষ্টাদশ বিরাট পর্ব !

বৈষ্ণব-কবিরা প্রেমকে বলেছেন আদিরস বা মধুর রস এবং এই আদিরসের একটা শাস্ত্র বা বিজ্ঞান তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন…

আজকে যেমন এলোমেলো চিন্তার জন্যে আমরা বিখ্যাত, একদিন ছিল যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা এলোমেলো চিন্তাকে ঘৃণা করতেন…তাঁদের ছিল বৈজ্ঞানিক মন…সব-কিছুকেই তাঁরা পদ্ধতি-অনুযায়ী ভাবতেন, সূত্রের আকারে ভাবনাকে রূপ দিতেন…

সেইজন্যে তাঁরা প্রেমের মতন স্বাতন্ত্র্য-বিলাসী যথেচ্ছাচারী কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন শক্তিকেও শাস্ত্র ও সূত্রের নিয়মে বাঁধতে দুঃসাহসী হয়েছিলেন…

এবং তাদের সেই প্রেম-বিজ্ঞান আজকের বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিকদের কাছেও অচল হয়ে যায় নি…

প্রেমের গতিবিধি ও চরিত্রের একটা গড়পড়তা বিবরণ তাঁদের রস-শাস্ত্রে সুন্দরভাবে পাওয়া যায়…

কিন্তু প্রেমের ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনার সংবাদ সেখানে নেই…

তার জন্যে আদিরসের আধুনিক আচার্যদের শরণাপন্ন হতে হয়…

আজকের আদিরসের সাধকদের মধ্যে Stendhal-এর নাম ইতিহাসে খোদাই হয়ে গিয়েছে…

তাঁর কবরের স্মৃতিফলকে যে তিনটি কথা ইতালীয় ভাষায় লেখা আছে, তা তিনি নিজেই লিখে রেখে গিয়েছিলেন…

Visse, Scrisse, amo…

He lived, he wrote, he loved…

* বাঙলায় অনুবাদ করতে গেলে মূলের তিনটি কথার গাম্ভীর্য বহু কথায় নষ্ট হয়ে যায়। তাই তার সারার্থ দেওয়া হলো, সে বেঁচে ছিল শুধু লেখবার জন্যে, শুধু ভালবাসবার জন্যে !

তার প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন প্রেম সম্বন্ধে তাঁর ক্লাসিক বই De L'amour বা Love-এ…

সেখানে তিনি বলছেন, প্রত্যেক জন্ম-কার্যের মতন প্রেমের জন্মও একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার (work of nature), কিন্তু কি-করে-ভালবাসতে-হয় সেটা শিল্পকার্যের মতন মানুষের সাধনার বিষয়…

প্রেমে-পড়ার অব্যবহিত পরেই একটা অবস্থা আসে, তাকে তিনি নাম দিয়েছেন, crystallization…দানা-বাঁধার অবস্থা…

সাল্জ্‌বুর্গের বিখ্যাত নুনের খনিতে বিভিন্ন সাইজের সরু সরু কাঠ কয়েকদিনের জন্যে ফেলে রাখা হতো…কয়েকদিন পরে খনির ভেতর থেকে যখন সেই কাঠ বার করে আনা হতো, তখন সেই কাঠের সারাগায়ে নুন দানা বেঁধে হীরের কুঁচির মতন ঝকঝক করতো…ভেতরের শুকনো কাঠ আর দেখা যেতো না…একেই স্টেন্‌ধলে crystallization বলছেন…

সাময়িক বিচ্ছেদ বা অদর্শন হলো সেই নুনের খনি…

প্রথম দর্শনের পর, এই অদর্শনের সময়টুকুতেই প্রেমের অদৃশ্য রস দানা বেঁধে যায়…

তারপরেই শুরু হয়, অথবা তার জন্যেই শুরু হয় সেই অসম্ভব উন্মাদ অবস্থা যে অবস্থায় একজন অপরজনকে জগতে অদ্বিতীয়রূপে দেখে…একজন অপরজনকে একমাত্র পরমবাঞ্ছিত মনে করে…

কারণ দানা বাঁধার দরুন ভেতরের শুকনো কাঠের চেহারা তখন আর চোখে পড়ে না…

এইজন্যেই Proust তাঁর বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকতামূলক নভেলে* এক জায়গায় বলেছেন, আমরা যখন কোন মানুষের প্রেমে পড়ি,

* Remembrance of Things Past—Morcel Proust

তখন সেই আসল মানুষটিকে কল্পনায় ভেঙেচুরে মনের ভেতর নতুন মূর্তিতে গড়ে তুলি…এবং ভালবাসি নিজের-তৈরী সেই নতুন মূর্তিটিকে…

এবং মনের ভাণ্ডারে রঙের অভাব হয় না…তাই প্রত্যেক প্রেমিক বা প্রেমিকা আকাশের সব রঙ দিয়ে প্রেমাস্পদকে রাঙিয়ে তোলে…

পাকা জাদুকরের মতন প্রেম তাই সামান্য ভিখারী-ভিখারিনীর মধ্যেও লায়লী-মজনুকে জাগিয়ে তোলে…

অতি সাধারণ যে মেয়ে, সেও তার প্রেমিকের চোখে জীবনে একবার শিরীঁ হয়ে ওঠে…অতি সাধারণ যে ছেলে সেও জীবনে একবার তার প্রেমিকার চোখে ফরহাদ্ হয়ে জেগে ওঠে…

প্রতিদিনের অতি-সাধারণ জীবনের তুচ্ছ মালমসলা নিয়েই প্রেম অনন্তকাল ধরে লায়লী-মজনুর খেলা খেলে চলেছে…

প্রেমের এই অবস্থায় যে-আনন্দ জেগে ওঠে, বাইরের কোন বিরূপ সমালোচনায় বা বাস্তবতার কোন ধাক্কায় তার বিচ্যুতি ঘটে না…তার কারণ যে লোককে নিয়ে এ আনন্দের সৃষ্টি, সে লোক তো বাইরে কোথাও নেই…যে মুখ দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে, সে মুখ তো তারই কল্পনার সৃষ্টি…

"আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি !"

সব মানুষ গন্ধর্ব নয়, সব নারী অপ্সরা নয়…কিন্তু জীবনে একবার সব মানুষকেই অনিন্দ্যসুন্দর হবার মওকা প্রেম এনে দেয়…তাই বিশ্ব জুড়ে প্রেমের একটু ছোঁয়ার জন্যে মানুষের এত আকুলতা…

তাই প্রেম যখন আসে, অতি সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে ওঠে…

এই অবস্থায় বাঙলার মধ্যযুগের এক নারী-কবি সমালোচকদের বিরূপতাকে তুচ্ছ করে বলেছিলেন,

"স্রোত-বিথার-জলে এ তনু ভাসায়েছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে ?"

অতি ভীরু লোকের মনেও প্রেম এনে দেয় বিস্ময়কর এক দুঃসাহসিকতা···

মসীঘন-অন্ধকার ঝড়ের রাতে গলিত শবদেহকে অবলম্বন করে বিল্বমঙ্গল তরঙ্গ-সংকুল নদী পার হয়ে যায়···

কণ্টক-বিকীর্ণ পথে শ্রীমতী চলে তিমিরাভিসারে···

সর্ব-তুচ্ছকারী যে আনন্দ প্রেম এনে দেয়, তার উৎস কোথায় ?

প্রত্যেক মানুষ একটি লোককে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে··· সে লোক হলো সে নিজে···

একটি নাম তার সব চেয়ে প্রিয়···সেই-একটি নামই বিশেষ করে সে শুনতে চায়···সে হলো তার নিজের নাম···

মানুষের এই আত্মপ্রীতির সংগোপন ক্ষীণ শিখাকে প্রেম শতশিখায় প্রোজ্জ্বল করে তোলে···

শত-সহস্রের অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে প্রেম অকস্মাৎ মাথায় পরিয়ে দেয় দুর্লভ রাজ-মুকুট···

প্রেমের আলোয় অকস্মাৎ সে নিজেকে আবিষ্কার করে সম্রাটরূপে···

একটি মুগ্ধকণ্ঠে শোনে, মন্ত্রের মতন উচ্চারিত হচ্ছে তার অতি সাধারণ নাম···প্রিয়তম, প্রিয়তম, প্রিয়তম···

একজনের প্রেম-নিবেদনে, এই বিরাট বিশ্বে সে খুঁজে পায়

তার অস্তিত্বের সার্থকতা; মুগ্ধরাতে প্রেয়সী বা প্রিয়তমের কণ্ঠে যখন সে শোনে, তুমি না থাকলে এ বিশ্ব নিরর্থক আমার কাছে!

তাই বিশ্বকবির মন্ত্রে প্রেমের আরতি করে সে বলে,

"তুমি মোরে করেছ সম্রাট! তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরবমুকুট ***
* * তব রাজটিকা
দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি! আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
রাজ-আভরণে * *
* * হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়যৌবনময় দেবতা সমান"

পথের ভিখারীর মনেও প্রেম এনে দেয় আত্মগরিমার এই দুর্লভ ক্ষণ...

একমাত্র প্রেমের আধিপত্যে নেই শ্রেণী-বিচার, নেই জাতি-ভেদ, নেই কাঞ্চন-কুলীনতার পক্ষপাতিত্ব...

স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে এইখানেই প্রেম-বঞ্চিত রাজা ভর্তৃহরি তার দীনতম প্রজার প্রেম-সৌভাগ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে...

অর্ধেক পৃথিবীর ঈশ্বরী হয়ে মেসালিনা দীনতমা ক্রীতদাস-রমণীর প্রেম-ভাগ্য অশ্রুজলে কামনা করে...

প্রেমের গর্বে তাই কবি বলতে পারে, তোমার ওই রক্ত-কপোলের কালো তিলবিন্দুটির জন্যে আমি বিকিয়ে দিতে পারি সমরখন্দ আর বোখারার সাম্রাজ্য!

কিন্তু প্রেমের এই উন্মাদনা কতদিন থাকে?

অকস্মাৎ আকাশ-রাঙানো যে আগুন জ্বলে ওঠে চিরদিন কেন তা তেমনি প্রোজ্জ্বল থাকে না ?

প্রেমে যারা সম্মিলিত হলো, তিক্ত কলহে কেন তারা বিচ্ছিন্ন হয় ?

যে বৃন্তে ফুটে উঠলো প্রেমের ফুল, সব ফুলের মতনই দিনান্তে সেই বৃন্তেই তাকে ঝরে পড়তে কেন হয় ?

চিরন্তন প্রেম কি শুধু কবির কল্পনা ?

যুগে যুগে প্রেম

প্রথম মিলনের রাতে যে নারীর কানে কানে বলেছিলাম,

'তুমি যদি যাও দূরে
বিরহ-বিচ্ছেদ-সুরে
সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে'…

অচিরকালের মধ্যে এমন দিন আসে যখন সেই নারীর কাছ থেকেই অভিযোগ শুনতে হয়,

'আজ তুমি দেখেও দেখ না,
সব কথা শুনিতে না পাও * * *
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে যাও !'

এবং অধিকাংশ সময় অভিযোগের ভাষা এমন কোমল ছন্দময়ও হয় না…

প্রেমের শপথ যখন উচ্চারিত হয়, আকাশের দূর তারারা শুধু তার সাক্ষী থাকে, প্রেমের শপথ যখন ভাঙে, ইচ্ছে না থাকলেও পাড়াপড়শীরা তার সাক্ষী হয়ে পড়ে…

পৃথিবীর আকাশ-বাতাস প্রেমের অপমৃত্যুর আর্তনাদে ভরা…

একটা প্রবাদ আছে, প্রেম নাকি অন্ধ…

ইতিহাসে দেখা যায়, শুধু অন্ধ নয় খোঁড়াও !

জীবনের প্রতিদিনের পথে রাস্তা এ-পার ও-পার হতে গাড়ি-চাপা পড়বার ভয় তার পদে পদে…

তাই বায়রন বলেছিলেন, It is easier to die for the

woman one loves than to live with her, যে নারীকে ভালবাসি, তার জন্যে জীবন বিসর্জন দেওয়া যত সহজ তার সঙ্গে ঘর করা তত সহজ নয়!

তাই 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায় যখন লাবণ্যকে নিয়ে ঘর-সংসার পাতবার সংকল্প করলো, লাবণ্য বলেছিল, হে বন্ধু বিদায়!

প্রতিদিনের সংস্পর্শের ম্লান ধুলোর সুনিশ্চিত মলিনতা থেকে প্রেমকে চির-উজ্জ্বল চির-অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে বিশ্বকবি লাবণ্যের মারফত যে বৃহৎ বিরহের প্রেসক্রপশন বাতলেছেন, বড় ডাক্তারের প্রেসক্রপশনের মতন কোন ওষুধের দোকানেই তার পাত্তা পাওয়া যাবে না…স্বভাবতঃই তাই সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করবে, ওষুধ খুঁজতে যদি রোগী মরে যায়, সে প্রেসক্রপশনে কি লাভ?

তাই জগৎ জুড়ে প্রশ্ন উঠেছে, প্রতিদিনের জীবনে কি করে প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখা যায়?

সে কি মানুষের অসম্ভব স্বপ্ন?

পণ্ডিত লোকেরা অনায়াসে এই প্রশ্নের উত্তর দেন, তাঁরা পুরুষকে বলেন, কর্তব্যপরায়ণ স্বামী হও; নারীকে বলেন কর্তব্য-পরায়ণা আদর্শ স্ত্রী হও!

সমস্যা এত সহজ নয়…

মানুষের মন এত সহজে ভোলে না…

যে মন প্রেম চায়, সে কর্তব্য ভোলে না!

দেবতারা নলের রূপ ধরে দময়ন্তীকে ঠকাতে এসেছিলেন… এক নিমেষে দময়ন্তী তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে বলে দিলেন, তোমরা কেউ-ই নল নও, তোমরা দেবতা, হয়তো নলের চেয়ে সুন্দরতর কিন্তু আমি নলকেই চাই!

কর্তব্য হয়তো প্রেমের চেয়ে বড় কথা, কিন্তু দময়ন্তী নলকেই চায়।

মানুষের মন চির-অতৃপ্তভাবে প্রেমকেই খোজে…

যে আদিম অন্ধ উন্মাদনায় এই মৃত জড় পৃথিবীতে প্রথম

প্রাণের স্পন্দন জাগে, একমাত্র প্রেমের অনুভূতির মধ্যে মানুষ সেই আদিম প্রাণ-চেতনার অকারণ আনন্দ-স্পন্দনের স্বাদ পায়…

এই আনন্দের স্বাদ অতি দুর্লভ…একমাত্র এই আনন্দের মধ্যে আছে সেই শক্তি যে শক্তিতে মানুষ নিজেকে নতুন করে দেখতে পায়…তার মধ্যে যা কিছু জড়, যা কিছু মুমূর্ষু এই আনন্দের স্পন্দনে তা নিমেষে রূপান্তরিত হয়ে যায় প্রাণের বিদ্যুতে, নব সৃজনের উল্লাসে…

প্রেম নিমেষে যে miracle ঘটাতে পারে কর্তব্য তা পারে না…

মানুষের মনকে ছেয়ে আছে এই miracle-এর লোভ…

তাই পুরুষ নারীর মধ্যে শ্রেয়সীকে পুজো করে কিন্তু প্রেয়সীকে পাশে অন্তরঙ্গভাবে চায়…

পুরুষের সর্বোত্তম কামনা, স্ত্রী যদি প্রেয়সী হয়!…

নারীর সর্বোত্তম কামনা, এক দেহে স্বামী ও প্রেমিককে পাওয়া!

মানুষের জীবনের চরম ট্রাজেডি হলো, স্ত্রী হতে গিয়ে নারী প্রেয়সী হতে ভুলে যায়…স্বামী হয়ে পুরুষ প্রেয়সীকে শুধু স্ত্রীতে পরিণত করে ফেলে…

ফলে, কর্তব্যপরায়ণ সুন্দরী স্ত্রীকে ফেলে পুরুষ বেড়ালের মতন রাত্তিরে ঘুরে বেড়ায় প্রেয়সীর সন্ধানে…

আদর্শ স্বামী চন্দ্রশেখরকে পরিত্যাগ করে শৈবলিনী অজানা বিপদসংকুল পথে ভিখারিণীর ছদ্মবেশে বেরোয় প্রতাপের সন্ধানে…

সমাজ স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকে বলেছে বৈধ প্রেম…

শৈবলিনা-প্রতাপের প্রেমকে অবৈধ বলে শাসন করে…

কিন্তু বৈধ প্রেম সন্তান ছাড়া আর কিছু প্রসব করে না, অবৈধ প্রেম সৃষ্টি করেছে যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত মানুষের বিরাট সাহিত্য, শিল্প, সংগীত…

যতদিন মানুষের মনে থাকবে সৃজন-পিপাসা, ততদিন ভাল ও মন্দের বাইরে, প্রেম তাকে আকর্ষণ করবেই…

ভাল ও মন্দ, উচিত ও অনুচিতের থাকে যে সব জিনিস সাজিয়ে রাখা যায়, প্রেম সে বস্তু নয়···

প্রেমের একমাত্র পরিচয়, সে আছে, সে থাকবে···

আলোর মতন···বাতাসের মতন···

পৃথিবীর সব সুখাদ্য পেটে পুরেও মানুষ চির-ভিখারীর মতন কাঁদে,

'যদি প্রেম না দিলে প্রাণে,
ভোরের আকাশ কেন ভরিয়ে দিলে এমন গানে গানে ?'

শেলী আক্ষেপ করে বলেছিলেন···

'One word is too often profaned,
For me to profane it !'

—একটাই কথা, ভালবাসা···

বার বার মানুষ সেই একটা কথাই উচ্চারণ করে এসেছে··· প্রত্যেক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার মানে ক্রমশঃ ছোট হয়ে এসেছে, কদর্য হয়ে এসেছে···

"আমি কি করে তা করবো।"

যুগ থেকে যুগে সেই একটি কথার মানে বদলে এসেছে বলেই প্রেম সম্বন্ধে আজকের মানুষের ভাব-ভাবনার সঙ্গে অন্য যুগের কোন মিল নেই···

সেই একই প্রেম কিন্তু যুগে যুগে তার চেহারা বদলে বদলে এসেছে···

কিন্তু আজকে বিংশ-শতাব্দীর মধ্যপাদে এসে প্রেমের যে চেহারা দাঁড়িয়েছে, তাতে অনেক সময় সন্দেহ হয়, বুঝি তার রূপান্তর ঘটেছে···

বহুকাল আগে এক অতি-কঠিন দেবতার বৈরাগ্য ভাঙতে গিয়ে মদনদেব তনু হারিয়ে অতনু হয়েছিলেন…পুরাণে বলে, রতির বিরহ-সাধনায় সেই অতি-কঠিনের আশীর্বাদেই আবার মদনদেবের নব কলেবর হয়…

এতদিন পরে আশঙ্কা হয়, বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক মানুষের পাল্লায় মদনদেব কলেবর না বদলান, এমন make up নিয়েছেন যে তাঁকে চেনা কঠিন হয়ে ওঠে…

পাঁচটি বিভিন্ন ফুলে সাজানো তাঁর যে পঞ্চশর ছিল, তা ফেলে দিয়ে তিনি আজ একযন্ত্রী হয়েছেন…

এবং সেই যন্ত্রের নাম যোনি।

একদিন প্রেম ছিল, ঈশ্বরের মতন, একটা idea…অমনি সুদূর, অমনি দুর্লভ…ইন্দ্রিয়ের স্পর্শের বাইরে…জীবনের মহত্তম প্রেরণার মতন শুধু অনুভূতি-গ্রাহ্য রহস্যাবৃত…

সেদিন প্রেমাস্পদের ভেতর দিয়ে প্রেমিক প্রমকেই পুজো করতো…

প্রেমাস্পদ মরে গেলে কিংবা পাওয়ার সীমার বাইরে চলে গেলে, প্রেম মরে যেতো না…

অনির্বাণ শিখার মতন প্রেম জ্বলতো প্রেমিকের অন্তরে…

মৃত্যুতে তার ছেদ হতো না…কারণ তার পেছনে ছিল একটা বৃহৎ বিশ্বাস, হাক্স্‌লী যাকে বলেছেন mythology, যুগ-যুগান্তরের ভাব-অভ্যাসের ফল মৃত্যুর পরও জীবনের অস্তিত্বের বিশ্বাস, যে-বিশ্বাস এনে দিতো অন্য আর এক জীবনে পুনর্মিলিত হবার আশা…

তাই এই প্রেম ছিল নদীর মতন এক-সমুদ্রমুখী…চাতকের মতন শুধু মেঘজলপিয়াসী…

শুধু একজনকে কেন্দ্র করে ছিল তার সব রতি, সব আরতি…

লায়লার জগতে মজনু ছাড়া আর কোন পুরুষ ছিল না, মজনুর জগতে লায়লী বিধাতার সৃজিত এক মাত্র নারী…

আজকের মনোবিজ্ঞানবিদ্‌রা এই প্রেমের যে ব্যাখ্যাই করুন, প্রেম বলতে আজও মানুষের মনে যে বিচিত্র অনুভূতি জেগে ওঠে, তা হলো এই প্রাচীন প্রেমেরই স্মৃতি…

বাস্তব হোক আর অবাস্তব হোক, এই প্রেম মানুষকে যা দিয়ে গিয়েছে, অবিস্মরণীয় উপাদান হিসাবে তা মানুষের চেতনায় চির-কালের মতন মিশিয়ে গিয়েছে…

মধ্যযুগে দান্তে এই প্রেমকেই অমর করে রেখে গিয়েছেন ডিভাইন্ কমেডি মহাকাব্যে….

দান্তে জন্মেছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি…তখন সারা ইওরোপ যে নীতি-ধর্মের অনুশাসনে চলতো, তাতে আমাদের দেশের বৈরাগ্য-পন্থীদের মতন, নারীকে নরকের দ্বার বিবেচনা করা হতো… কামপরবশ হয়ে নারীর দিকে চাওয়া ছিল পাপ, ভয়ংকর পাপ… বিবাহের ভেতর দিয়ে নর-নারী একশয্যায় শুতে পারে, কারণ জীব-রক্ষার জন্যে সেটা দরকার…কিন্তু তার ভেতর যদি আসক্তি আসে, অবিবাহিত জীবনে নয় বিবাহিত জীবনে যদি স্বামী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, সে আসক্তিও অন্যায়, পাপ…

দান্তে এই জগতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন…

এবং নিজের জীবনে এবং কাব্যে এই আসক্তি আর এই নারীকে পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে দিব্য স্বর্গীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন,…প্রাণহীন নীতির মরুভূমি থেকে নারী ও প্রেমকে উদ্ধার করে প্রাচীন পৌরাণিকতার প্রাণ-ঐশ্বর্যে আবার প্রতিষ্ঠা করে গেলেন…নারী ও প্রেমকে নিয়ে নতুন পুরাণ রচনা করলেন…সে পুরাণ হলো দি ডিভাইন্ কমেডি…

দেহ-সম্পর্কের অপরাধ ও ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত করে দান্তে প্রেমকে দেহাতীত দিব্য-শক্তির প্রতীকরূপে দেখলেন...

প্রেম হলো জীবন-মরণের ঈশ্বরী...

প্রেমই একমাত্র পারে সব ক্ষুদ্রতা, সব তুচ্ছতা থেকে মানুষকে দিব্য নব-জীবনে রূপান্তরিত করতে...

তাই ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম যে বইখানি লেখেন, যাতে প্রথম তিনি তাঁর জীবনের ও কাব্যের নায়িকা বিয়াত্রিচের পরিচয় দেন, সে-বইএর নাম রেখেছিলেন Vita Nuova, নব-জীবন...গদ্য ও সনেট-মেশানো দান্তের জীবন-স্মৃতি...

এই জীবন-স্মৃতিতে আমরা জানতে পারি মাত্র ন বছর বয়সে দান্তে প্রথম বিয়াত্রিচেকে দেখেছিলেন এবং সেই বালক-কালের ক্ষণ-অনুভূতি তাঁর সমগ্র জীবনকে, জীবনের সমস্ত ভাবনাকে মৃত্যুহীন রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে রাখে...

তিনি বিচিত্র এক বিবাহ-আসরের কথা লিখেছেন, অভিজ্ঞ সমালোচকেরা বলেন সেটা বিয়াত্রিচেরই বিবাহ-আসর, দান্তে সেখানে নিমন্ত্রিত দর্শক হয়ে এসেছিলেন...নববধূর বেশে বিয়াত্রিচে এগিয়ে আসতে দান্তে অভিবাদন জানান কিন্তু বিয়াত্রিচে তাঁর অভিবাদনের কোন উত্তর দেয় না, উলটে অন্য নারী-সংসর্গের কথা তুলে দান্তেকে উপহাস করে...খুব সম্ভব, দান্তে-বিয়াত্রিচের সামনাসামনি এই শেষ দেখা...বিয়ের বছরখানেক পরেই বিয়াত্রিচে দেহরক্ষা করে...রাজনৈতিক কারণে দান্তেকেও ফ্লোরেন্স পরিত্যাগ করে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়...

ডিভাইন্ কমেডি তিনি যখন লেখা শেষ করেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি...

এই মহাকাব্যে এক অপরূপ রূপে দেখা দিল বিয়াত্রিচে... জীবনের প্রথম প্রেম দেখা দিল জীবনের সর্বোত্তম প্রেম হয়ে...

ছাব্বিশ বছর বয়সে ভিটা নুভাতে বিয়াত্রিচেকে কেন্দ্র করে

জীবনের যে প্রথম প্রেমের কথা লিখেছিলেন, বাস্তব দিক থেকে সে প্রেম জীবনের মধ্যে এমন কিছু ছিল না, আধুনিক মানুষের ধারণায় যা সারাজীবনকে আচ্ছন্ন করে থাকতে পারে···

অথচ, স্মৃতিমাত্রসম্বল সেই প্রেম, আমরা দেখি দান্তের সমগ্র হৃদয়, মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ছিল···শুধু আচ্ছন্ন করেছিল নয়, সেই প্রেমই তাঁকে দিয়েছে সেই দুর্লভ প্রেরণা ও শক্তি যার ফলে পণ্ডিত-জন-পরিত্যক্ত ইতালির জনসাধারণের ভাষা তাঁর হাতে মহা-কাব্যের ভাষায় ফুটে উঠলো···

ডিভাইন্ কমেডি সেই প্রেমেরই সৃষ্টি···সেই প্রেমেরই অবিনশ্বর সাক্ষী···

কবির চিত্তলোকে বিয়াত্রিচে শুধু স্মৃতি হয়ে ছিল না···সেখানে বিয়াত্রিচে ছিল তাঁর জীবনের ঈশ্বরী···

ডিভাইন্ কমেডিতে আমরা দেখি কবি চলেছেন জীবন-মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে মহারহস্যের পথে···

সেই অজানা রহস্য-লোকের পথে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন মহাকবি ভার্জিল···

কিন্তু পথের প্রায় শেষপ্রান্তে এসে দেখেন, এতক্ষণ যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন সেই ভার্জিল আর পাশে নেই···অথচ সামনে রয়েছে চির-আলোকের দেশ যার জন্যে এই অভিযান···

স্বপ্নে-শোনা কথার মতন কানে আসে ভার্জিলের কণ্ঠস্বর, আমার বুদ্ধি, আমার কল্পনা, আমার জ্ঞান যতদূর যেতে পারে, আমি ততদূর পর্যন্ত তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি···তোমার সামনে বাকী যেটুকু পথের আভাস দেখতে পাচ্ছো, সে-পথের দিশা আমি নিজেই জানি না, তাই এখান থেকেই আমাকে ফিরতে হলো!

এই শেষ বাকী পথটুকু কে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে? জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত সামনের ওই নিত্য আলোর রাজ্যে কে হবে পথের দিশারী?

অপেক্ষায় ম্রিয়মাণ কবির সামনে এসে দাঁড়ায় আলোকবসনা বিয়াত্রিচে…

—তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি…আমাকে অনুসরণ কর…

বিহ্বল কবি বিয়াত্রিচেকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলে আবার …এগিয়ে চলে নিত্য আলোর উৎসের পথে…

একমাত্র প্রেমই পারে নিত্য আলোর উৎসে পৌঁছে দিতে…

এই হলো প্রাচীন প্রেমের পৌরাণিক চেহারা…

প্রাচীন মন ও মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে…

ব্যক্তিগত প্রেমের বিভিন্নতাকে বাদ দিয়ে, প্রেমের মোটামুটি আর তিনটি চেহারা আছে, কিংবা আর তিনটি বিভিন্ন যুগ আছে…

প্রথম হলো প্রেমের পৌরাণিক যুগ…

দ্বিতীয় হলো প্রেমের রূপকথার যুগ…

তৃতীয় হলো প্রেমের আধুনিক যুগ…

প্রাচীন প্রেমের আত্মিকতা আর আধুনিক প্রেমের দেহ-সচেতনতার মাঝখানে যোগসেতু হয়ে আছে প্রেমের রূপকথার যুগ…

পাশ্চাত্ত্য জগতে এই প্রেম নিয়ে আসে শিভাল্‌রির সৌরভ… নারীর একটা মুখের কথায় নাইটরা যখন অস্ত্র-মুখে দেহবিসর্জন দিতে পারতো…

পূর্ব-জগতে এই প্রেম সৃষ্টি করে লায়লা-মজনু, শিরীঁ-ফরহাদ, রূপমতী -রাজবাহাদুর…আনারকলি আর সেলিমকে…

এই প্রেমকেই শেলী বলেছেন, Grand Passion! জীবনের দিব্য-উন্মাদনা!

মৃত্যু-তুচ্ছকারী এই গ্রাণ্ড প্যাশান আজ জগত থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে···

আজকের জগতে আর জন্মগ্রহণ করে না লায়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ···

কেন?

কেন জীবন থেকে চলে গেল সেই গ্রাণ্ড প্যাশান?

———

তীর থেকে নামো নীরে

তখন সবে আট-ন'বছর বয়স। সেকালের স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী মাত্র ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ি। পাঠ্যপুস্তক বোধহয় আখ্যানমঞ্জরী দ্বিতীয় ভাগ। কিন্তু গোপনে ইতিমধ্যেই দুর্গেশনন্দিনী পড়তে শুরু করেছি···

যে বাড়িতে মানুষ হয়েছি, সে বাড়ির আবহাওয়ায় ছিল সাহিত্যের সুর···সে বাড়িতে পুরোদমে তখন শুরু হয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের যুগ···আজ যেমন প্রয়োজনে, বিনা প্রয়োজনে কোন কোন বাড়িতে অষ্টপ্রহর বেতারের আওয়াজ শোনা যায়, সে সময় এ বাড়িতে অষ্টপ্রহর তেমনি শোনা যেতো রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের কবিতা···

বোধহয় মোহিত সেনের সংকলিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চয়নিকা গ্রন্থ ছিল···বৃহৎ চৌকো সাইজ···খ্রীষ্টান বাড়িতে সকলের ব্যবহারের জন্যে যেমন একখানি বাইবেল থাকে, তেমনি এ বাড়িতে সকলের ব্যবহারের জন্যে সেই কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থটা বাইরে টেবিলে বা বিছানায় পড়ে থাকতো···আমার কাজ ছিল, তা থেকে কবিতা মুখস্থ করা···

অনর্গল বহু কবিতা মুখস্থ বলতে পারতাম এবং এমন বদ অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে যখন তখন আপনার মনে সেই সব কবিতা আবৃত্তি করে যেতাম···এবং আমার বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক কবিতারই মানে আমি জানি!

বিপদ ঘটালেন ক্লাসের যোগীন পণ্ডিত···

সেই সময় রবীন্দ্র-ভক্তদের সংখ্যা যেমন একটি-দুটি করে বাড়ছিল, সেই অনুপাতে বাড়ছিল রবীন্দ্র-দ্বেষীদের সংখ্যাও···

রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে যেমন উৎকট ভক্তরা ছিলেন, তেমনি রবীন্দ্র-দ্বেষীদের মধ্যে ভয়ংকর-উৎকট রবীন্দ্র-বিদ্বেষীরা ছিলেন···রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই তাঁরা খেপে উঠতেন এবং তাঁরা প্রমাণ করে দিতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ সাধু বাংলা লিখতে পর্যন্ত জানেন না···কাব্য-লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁরা আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন··· !

আমাদের ক্লাসের যোগীন পণ্ডিত যে সেই রবীন্দ্র-বিদ্বেষীদের মিছিলে ঝাণ্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়ান, আট-ন'বছরের বালকের তা জানা ছিল না···

দৈব-দুর্বিপাকে একদিন···

মন্মথ মাস্টার পিরিয়ড্ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছেন এবং তখনও যোগীন পণ্ডিতের আবির্ভাব হয় নি···সেই সন্ধিক্ষণের কয়েক সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্ররা পূর্ণ-স্বাধীনতা উপভোগ করে··· প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতন করে···

সদ্য-মুখস্থ-করা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা তখন আমাকে মস্ত্ করে রেখেছে···ইচ্ছে গেলেই আবৃত্তি করে উঠি···হঠাৎ-মুক্তি-পাওয়ার সেই গণ্ডগোলের মধ্যে· পণ্ডিতমশায়ের চেয়ারের কাছে গিয়ে আমি সজোরে আবৃত্তি করে উঠলাম,

ধূপ আপনারে মিলাইতে চায় গন্ধে
গন্ধ সে রহে ধূপের মাঝারে হারা···

ক্লাস নিস্তব্ধ হয়ে গেল···দ্বিগুণ অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত কবিতাটা আবৃত্তি করলাম···

আবৃত্তির শেষে দেখি, ছোট-ছোট-চোখ-ঠিকরে-পড়ছে···যোগীন পণ্ডিত গম্ভীরভাবে ক্লাসে ঢুকছেন···

বাইরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে সমগ্র কবিতাটা আবৃত্তি করবার সুযোগ দিয়েছিলেন···

চেয়ারে বসেই তিনি আমার দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠলেন, স্ট্যাণ্ড্ আপ্ অন্ দি বেঞ্চ !

এ শাস্তি ইতিপূর্বে আমি কোনদিন আর পাই নি···প্রচণ্ড অভিমানে কান দুটো জ্বালা করতে লাগলো···আমি এমনি উঠে দাঁড়ালাম !

কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে গর্জন করে উঠলেন, এতদূর 'বোকে' গিয়েছ তা তো জানতাম না !

তখনও আমি বুঝতে পারি নি কেন হঠাৎ পণ্ডিতমশাই তাঁর অতিপ্রিয় ছাত্রের ওপর এতখানি চটে গেলেন !

আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম, আপনি ভুল করছেন !

যোগীন পণ্ডিত চিৎকার করে উঠলেন, আবার মুখের ওপর জবাব ! ও কবিতাটা কার লেখা জান ?

সগর্বে বলি, জানি, রবীন্দ্রনাথের !

শক্ত সুপুরির কুচির মতন রবীন্দ্রনাথ নামটা দুবার সমস্ত দাঁত দিয়ে চিবিয়ে পণ্ডিতমশাই বলে উঠলেন, ওকে কবিতা বলে না, কবিতার ব্যঙ্গ ! কতকগুলি নিরর্থক শব্দের অকারণ অপব্যবহার !

বালকের অন্তর-সিংহাসনে তখন রবীন্দ্রনাথ রাজ-রাজেশ্বরের মতন এসে বসেছেন···মনে হলো, এই লাঞ্ছনা থেকে রবীন্দ্রনাথকে মুক্ত করার সমগ্র দায়িত্ব আমার···

বালকের সহজ আত্ম-প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিরর্থক হয় না !

রেগে যোগীন পণ্ডিত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বল কবিতাটার মানে কি ?

মানে নিশ্চয়ই আমি জানি, কিন্তু হায়! মানে বলতে গিয়ে দেখি কিছুই বলতে পারছি না···মনের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানে কিন্তু প্রকাশ করতে যাই, কোথায় যেন হারিয়ে যায়···প্রাণপণ চেষ্টা করি, যত চেষ্টা করি ততই অস্পষ্ট অনুভূতির ছায়ায় হারিয়ে হারিয়ে যায় মানে···একটা মানের জায়গায় তিনটে মানে এসে দাঁড়ায়, তিনটেরই অস্পষ্ট চেহারা···অগঠিত অনুভূতির অন্ধকারে আর্তভাবে হাতড়ে বেড়াই···

আজও জীবনে ভুলি নি, সেই কয়েকটি মুহূর্তের অব্যক্ত তীব্র যন্ত্রণা…

একটা কিছু মানে বুঝছি কিন্তু কিছুতেই তাকে প্রকাশ করতে পারছি না…এরকম যে একটা অবস্থা হতে পারে, তা তো কখনও ভাবি নি!

পরাজয়ের নিদারুণ লজ্জায় চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে!

সমস্ত ক্লাসের সামনে যোগীন পণ্ডিত বিজয়গর্বে চেয়ারে গিয়ে বসেন…আমার দিকে চেয়ে বলেন, বসো!

আমি বসতে পারি নি…বসলে যেন পরাজয়কে স্বীকার করে নেওয়া হবে…তাই পণ্ডিতমশাই যতক্ষণ ক্লাসে ছিলেন আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম।

সেইদিন থেকে আজও পর্যন্ত যখনই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ি, সামনে দেখি যোগীন পণ্ডিত দাঁড়িয়ে বলছেন, মানে বল!

আজও তেমনি সেই বালকের মতন মানের জন্যে মনের গহনে আর্তভাবে ঘুরে বেড়াই…

তবে আজ আর সে পরাজয়-বোধ নেই…

আজ মহানন্দে দেখি, দিক-চক্ররেখার মতন কবির কবিতার মানে জীবনের গতির সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে চলেছে…

আজ জেনেছি, অভিধানের মানের বন্ধন থেকে মহাশিল্পী বাংলা শব্দকে প্রাণের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় বহু-অর্থবান্ করে গিয়েছেন…

তাঁর সাধনায় ভাষা পেয়েছে মন্ত্রের রূপ…জীবনের গতির তরঙ্গকে শিবজটার মতন ধরে রেখেছেন ছন্দের বাঁধনে…তাই কবিতার মানে খুঁজতে গিয়ে জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছি…

তৃণফুল থেকে দূরতম নক্ষত্র, রবীন্দ্রনাথের কবিতা না থাকলে কে তাদের অর্থ খুঁজে পেতো?

কে জানতো নিভে-যাওয়া প্রদীপের শিখার সঙ্গে উদয়-তারার প্রথম আলোর কম্পনের কি সম্পর্ক?

রৌদ্রদগ্ধ শীর্ণ গ্রাম-পথের দিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন লিখলেন, 'বৈরাগীর একতারার মতন শীর্ণ পথ বেজে উঠছে' সমালোচক-প্রবর সুরেশ সমাজপতি তাঁর সাহিত্য পত্রিকায় ব্যঙ্গ করে উঠলেন, আমরা শুনেছি ঢাক বাজে, ঢোল বাজে কিন্তু রবিঠাকুরের হাতে পথও বাজে !

পথ চিরকালই বেজে চলেছে কিন্তু তার সুর পণ্ডিত সমাজপতিরা কোনদিনই ধরতে পারেন না···তার জন্যে দরকার হয় স্রষ্টা কবির !

বঙ্কিম বাঙলাভাষার দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এসে সেই প্রাণময় দেহে আত্মাকে খুঁজে বার করলেন···

প্রত্যেক শব্দের আড়ালে তার একটা দ্বিতীয় সত্তা আত্মার মতন সংগোপনে লুকিয়ে থাকে, মহাদেবের তৃতীয় নয়নের মতন যে সাহিত্যিকের থাকে দিব্যদৃষ্টি, শব্দের এই দ্বিতীয় সত্তা তাঁর কাছেই ধরা পড়ে···

রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ে শব্দের সেই আত্মিক রূপ···

তাই প্রত্যেক শব্দের জড় আভিধানিক রূপের আড়ালে তিনি তার সেই সংগোপন দ্বিতীয় সত্তার সন্ধান বার করলেন···

অভিধানে যে পথ শুধু মাটির রূপান্তর, মানুষের পায়ের তলায় যা জড় হয়ে পড়ে থাকে, দুদিকে দুই ফুটপাতে সীমাবদ্ধ···রবীন্দ্রনাথ সেই জড়-পথের ভেতর তার সংগোপন আত্মিক সত্তাকে দেখতে পেলেন, যেখানে অহরহ অসংখ্য মানুষের পায়ের শব্দে বীণার তন্ত্রীতে করাঘাতের মতন চলার বিচিত্র ছন্দ ও সুর বেজে বেজে উঠছে···

শব্দের এই আত্মিক দ্বিতীয় সত্তার আবিষ্কার বাঙলাভাষায় রবীন্দ্রনাথের চরম দান···এবং তারই জন্যে আজ বাঙলাভাষা বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার মতন ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে পেরেছে···

এবং তারই জন্যে আজকের আধুনিক কবিরা শব্দার্থের দুঃসাহসিক প্রয়োগে কবিতার নব-রূপের সন্ধানে বেরুতে পেরেছেন…

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রয়াস বিশ্বের সাহিত্যের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ব্যাপার…

স্বল্পপ্রাণ লিরিক কবিতার বিচ্ছিন্ন খণ্ডতার ভেতর থেকে তিনি কালজয়ী এপিকের অখণ্ড একত্বকে সজ্ঞান সাধনায় গড়ে তুলে গিয়েছেন…

এইখানেই রবীন্দ্র-প্রতিভার অদ্বিতীয় অসাধারণত্ব…

আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয় টুকরো টুকরো ছোট পাথর…আসলে তা একটা অখণ্ড বিরাট পাহাড়…হিমালয়, কালিদাসের ভাষায় 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ড'—পূর্ব আর পশ্চিমের সমুদ্রে অবগাহন করে দাঁড়িয়ে আছে যেন পৃথিবীর মানদণ্ড!

হিমালয় আর রবীন্দ্রনাথ, ভারতাত্মার দুই মহা-প্রকাশ…

জগতের কোন লিরিক কবির রচনা এপিকের এই অখণ্ড বিশালতার মহিমা অর্জন করতে পারে নি…কিশোরকালের প্রথম অস্ফুট কবিতার কলি থেকে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অজস্র রচনার শেষতমের মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর একত্বের নিবিড় আত্মীয়তা…যেন কিশোরকাল থেকে পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত তিনি অজস্র কবিতা আর গানে একটি মহাকাব্যই রচনা করে গিয়েছেন, প্রত্যেক কবিতা প্রত্যেক গানের মধ্যে রয়েছে এমনি অচ্ছেদ্য একত্ব…বিভিন্ন কবিতার বই যেন একটি মহাকাব্যেরই বিভিন্ন সর্গ… যে মহাকাব্যের প্রথম সর্গ হলো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, সেই মহাকাব্যেরই শেষ স্বর্গ হলো, সম্মুখে শান্তি-পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার!

টুকরো টুকরো জিনিস একসঙ্গে জুড়ে আবার এক-করে গড়ে

তোলা যায় কিন্তু তাতে জোড়ের চিহ্ন থেকে যায়···রবীন্দ্র-রচনার বিস্ময়কর সমগ্রতার মধ্যে কোথাও নেই জোড়া-দেওয়ার চিহ্ন··· বিভিন্ন ফুল দিয়ে একটা বড় মালা গাঁথাও নয়···প্রথম রচনা থেকে শেষ রচনা পর্যন্ত যেন একটাই সহস্রদল ফুল একটু একটু করে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে···

এমন কি সুদীর্ঘ জীবন ধরে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন সময়ে শত শত যেসব চিঠি লিখেছেন, প্রত্যেক চিঠিগুলি যদি পর পর সাজানো যায়, মনে হবে একই সময়ে একই দোয়াতের কালিতে একই কলমে সেগুলো লেখা···কোন একখানি চিঠির মধ্যে নেই অপর চিঠির বিরুদ্ধ-ভাব, কোথাও নেই এতটুকু ব্যস্ততার চিহ্ন, এতটুকু এলোমেলো দ্রুততার ছন্দপতন···

কবির ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, তিক্ততা বা আনন্দের সঙ্গে লিরিক কবিতার 'মুড্' (mood) বদলায়·· লিরিক কবিতা তাই বৈচিত্র্যে রূপবান্···

কিন্তু এপিকের মধ্যে কবিকে তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার ঊর্ধ্বে উঠতে হয়···মহাকাব্যের সমস্ত বিচিত্রতার পেছনে সমুদ্র-তরঙ্গের অবিরাম ধ্বনির মতন বিশ্ব-মানসের ঐকতান অচপল সুরের মতন নিত্য ধ্বনিত হয়ে চলে···মহাকাব্য এই ভাবের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান্···

রবীন্দ্রনাথের লিরিক কবিতার বিচিত্র রূপের আড়ালে মহা-কাব্যের এই বিশ্বমানস প্রত্যেক ক্ষরের পেছনে জাগ্রত হয়ে রয়েছে···

দেহের গঠনে তাঁর কবিতা লিরিক কিন্তু অন্তরধর্মে তা পুরোমাত্রায় এপিক···

লিরিক যেখানে সম্পূর্ণতা পায়, সেখানে সে অনুভূতির সূক্ষ্মতম স্পন্দনকেও ধরতে পারে…গাছ থেকে সামান্য একটা পাতা খসে-পড়ার নিঃশব্দ শব্দ তার তন্ত্রীতে আর্তনাদের মতন বেজে ওঠে…

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ও গানে অনুভূতির সূক্ষ্মতম স্পন্দনকেও ছন্দ ও সুরের সরগমে ধরেছেন…

এপিক যেখানে সম্পূর্ণতা পায়, সেখানে সে বিস্তারে দেশকালকে ছাড়িয়ে অনাগতের হৃদ্‌স্পন্দনে বাজে…

মহাকাব্যের বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সেই অনাগতের হৃদ্‌স্পন্দনকে ধরেছেন…যে ক্ষেত্রের আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি, তাঁর ছন্দে বাজছে তার জ্যোতির কম্পন…

শিবের তৃতীয় নয়নের মতন এপিকেরও আছে তৃতীয় নয়ন…সে শুধু সত্য ও সুন্দর নয়…সে শিবময়ও…

প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ এপিকের ভেতর থেকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে বিশ্বের কল্যাণ মন্ত্র…সব বিরোধের উপশম, শান্তিমন্ত্র…

রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে উঠছে বিশ্বের কল্যাণ-মন্ত্র…সর্ববিরোধের ঊর্ধ্বে শান্তির সামগান…

ঋগ্‌বেদের ঋষি প্রার্থনা করেছিলেন, আ নো ভদ্রা ঃ ঋতবো যন্তু বিশ্বতঃ…

বিশ্বের সকল দিক থেকে প্রবাহিত হোক কল্যাণ-চিন্তা…

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সকল দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে সেই কল্যাণ-চিন্তা…ছন্দে সুরে ঝরে পড়ছে মধুকণা, যে মধুতে সিক্ত হয়ে গিয়েছে ধরণীর ধূলি…

রবীন্দ্র-সাহিত্যে আছে সেই সঞ্জীবনী মধুবিদ্যা যার স্পর্শে অসুন্দর সুন্দর হতে পারে, দুর্বল ভীরু বীর্যবান্ হতে পারে, দগ্ধ শুষ্ক জীবনের শাখা যার স্পর্শে আবার জেগে উঠতে পারে প্রাণের সবুজ সমারোহে…

এইখানেই তাঁর অপূর্ব লিরিক প্রতিভার বিস্ময়কর এপিক মহিমা···

ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এনে সগরের মৃত সন্তানদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন···ভারতের পুনরুজ্জীবনের প্রাণ-মন্ত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে আছে···

রবীন্দ্র-স্মৃতি-তর্পণের একমাত্র বিধি হলো, রেকর্ডে বা বেতারে তাঁর গান গাওয়া নয়, জীবনে তাঁর গানকে সত্য করে তোলা···

বয়ে চলেছে নদী···তীরে বসে শুধু তার শোভা দেখে ঘরে ফিরে যেয়ো না···তীর থেকে নামো নীরে···ডুব দাও তার গহন-তলে···

———

প্রেম ও সেক্স্

পরশপাথরের খোঁজে খেপা সারা পৃথিবীর নুড়ি কুড়িয়ে বেড়িয়েছিল…

নুড়ি দেখলেই হাতের লোহায় ঠেকিয়ে দেখতো, লোহা সোনা হলো কিনা…

মাসের পর মাস…বছরের পর বছর…নুড়ি তোলে, ঠেকায় আর ছুঁড়ে ফেলে দেয়…

ব্যর্থতায় এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে আর লোহার দিকে চেয়েও দেখতো না…

অভ্যাসমত নুড়ি তুলতো, অভ্যাসমত ফেলে দিতো…

একদিন হঠাৎ দেখে, কখন অন্যমনস্কতার অবসরে হাতের লোহা সোনা হয়ে গিয়েছে ! পরশ-পাথরকে পেয়েও সে ফেলে দিয়েছে…।

হায় কে তাকে বলে দেবে, কোন্ নুড়িতে তার লোহা সোনা হয়েছিল !

সে আবার একটি একটি করে নুড়ি তোলে…হাতের লোহায় ঠেকায় আবার ফেলে দেয়…

আবার ব্যর্থতায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে…

অনাদিকাল থেকে মানুষ প্রেমকে খুজে চলেছে…

খেপার মতন সেও তাকে পেয়েও অন্যমনস্কতায় ফেলে দিয়েছে·

ফেলে দিয়ে আবার তাকেই খুঁজে চলেছে···

যুগ থেকে যুগান্তরে···

এক যুগের রতি পরবর্তী যুগে বিকৃতি হয়ে তাকে করেছে ব্যঙ্গ···

আজকের যুগের নারীর গর্ব, পুরুষের সমকক্ষতায় সে তার মুক্তি খুঁজে পেয়েছে···

কিন্তু আধুনিক নারীর এই মুক্তি-আন্দোলনের জয়স্তম্ভের তলায় একটি কঙ্কাল পড়ে আছে···প্রাচীন প্রেমের কঙ্কাল···

মধ্যযুগে নারীকে হারেমে বন্দিনী করে পুরুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, বহু ব্যথায় বুঝেছে দেহ যেখানে সহজ, প্রেম সেখানে কোথায়?

আধুনিক যুগে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করে নারী বহু ব্যথায় বুঝেছে, নিরাবরণ সেক্‌স্‌ দিয়ে পুরুষকে সে-সাময়িক আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু সে আকর্ষণে কোথায় প্রেমের সে সুগভীর স্পন্দন?

বিংশ-শতাব্দীর সাহিত্যের জগতে ঢুকলে চারিদিক থেকে কানে আসে শুধু চাপা আর্তনাদ, অতৃপ্ত যৌন-পিপাসার নির্লজ্জ আর্তনাদ···

সমুদ্রসৈকতে প্রায়-নগ্ন-দেহে নারীর জনতা দেখে আর যাই জাগুক, শেলী যাকে বলেছেন Grand Passion, তা জাগে না···

নারীদেহের সান্নিধ্য যত সহজ হয়েছে, প্রেম তার মায়া-রহস্য নিয়ে তত দূরে সরে গিয়েছে···

ইওরোপ আর আমেরিকায় নর ও নারীর যে সহজ ও নিকট সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, আমাদের দেশে এখনও ব্যাপকভাবে তা দেখা যায় না···

তবে আশা করা যায়, অচিরকালের মধ্যেই আমাদের দেশের

সমুদ্রসৈকতেও ওদের দেশের সমুদ্রসৈকতের অর্ধনগ্ন নর-নারীর স্বচ্ছন্দ জনতা দেখা যাবে···

ইতিমধ্যেই দেখা যায় পুরীর সমুদ্রতীরে পাতলা বেদিং-স্যুট পরে স্থূলকায় অন্তঃপুরবাসিনীরা ঢেউ-এর ধাক্কায় কুমড়োর মতন গড়াগড়ি খাচ্ছেন···

এবং ওদের দেশের মতন আমাদের দেশেও দেখা যায় তরুণীরা সিনেমার হিরোর জামা ছিঁড়ে নিয়ে স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ করছেন···

প্রাচীন প্রেমের পেছনে ছিল একটা রহস্যঘন চেতনা, একটা অতীন্দ্রিয় পৌরাণিক বিশ্বাস···

প্রেম সেদিন ছিল জীবন ও মৃত্যুর মতনই সুগভীর রহস্যে ঢাকা···

সেক্‌স্ সাইকলজী এসে প্রেমের সর্বাঙ্গ থেকে সেই রহস্যের আবরণকে খুলে ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলে দিয়েছে···

আধুনিক শিক্ষিতা স্বাধীনা নারী পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করেছে বটে, কিন্তু তার জন্যে নর-নারীর সম্পর্ক অনেকখানি রসহীন হয়ে পড়েছে···

একথা এদেশের প্রাচীনপন্থীদের উক্তি নয়···একথা বলছেন পশ্চিমের চিন্তানায়কেরাই···একথা বলেছেন অ্যালডুস্ হাক্‌স্‌লী, একথা বলেছেন ফরাসী আন্দ্রে মরোয়া···

যথা, আন্দ্রে মরোয়া লিখেছেন,···"the far too accessible ladies of present-day sea-side resorts almost never inspire love because they are emancipated."

"আজকের দিনের সমুদ্রসৈকত-বিহারিণীদের অতি অনায়াস

সান্নিধ্য কখনই পুরুষের চিত্তে প্রেমের উদ্দীপনা আনতে পারে না, তার কারণ তাঁরা মুক্ত, তাঁরা স্বাধীন।"

যুক্তিস্বরূপ তিনি বলছেন, "where is love's victory when there is neither veil, modesty, nor self-respect to check its progress ?"

"যেখানে অবগুণ্ঠন নেই, যেখানে লজ্জার শালীনতা নেই, আত্ম-সংবৃত্তির মধ্যে যেখানে আত্মমর্যাদাবোধ নেই সুতরাং যেখানে জয় করার কোন মানসিক প্রতিবন্ধকই নেই, সেখানে প্রেমের বিজয়-গর্ব কোথা থেকে আসবে ?"

ঠিক সেই কথাই হাক্‌স্‌লী বলছেন, "The present fashions in love making is likely to be short because love that is psychologically too easy is not interesting."

"আজকের ভালবাসা-বাসির মধ্যে কোন স্থায়িত্ব নেই, বড় অল্পতার আয়ু কারণ অতি সহজেই মন যা পায়, তাতে মন বেশীদিন খুশী থাকতে পারে না।"

প্রাচীন কালের বা মধ্যযুগের যেসব প্রেমকাহিনী মানুষের মনে রোমান্টিক প্রেমের অম্লান সুরভি নিয়ে আজও বিরাজ করছে, আজকের মানুষের জীবন থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কেন ?

কোথায় গেল সে-প্রেম ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, রোমান্টিক প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়···

প্রেমের পথে বাধা যেখানে সুকঠোর, যত সুকঠোর, বাধা ভেঙে প্রেমাস্পদের কাছে পৌঁছনোর তাগিদ ততই বেশী···

একদিকে কাঁচা আদিম প্রবৃত্তির সহজ আবেগ, অন্যদিকে

সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শের অনমনীয় শক্তির প্রভাব···

এই দুই প্রচণ্ড বিরোধী শক্তির সংঘর্ষে জন্মগ্রহণ করে প্রাচীন প্রেমের দুর্বার রোমান্টিক আবেদন, তার স্বর্গ-মর্ত্য-টলিয়ে দেওয়া আবেগের আকুলতা···

মধ্যযুগ পর্যন্ত নর-নারীর স্বেচ্ছামিলনে চারদিক থেকে ছিল প্রচণ্ড বাধা···

এই স্বেচ্ছাপ্রেমের বিরুদ্ধে ছিল ধর্মের ক্ষমাহীন রুদ্র অনুশাসন···

ধর্ম ও সামাজিক আচার সেদিন নারীকে, নারীর দেহ-শুচিতাকে বাইরের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার জন্যে নারীর মুখে দিয়েছিল অব-গুণ্ঠন, যে অবগুণ্ঠন মোচন করবার একমাত্র অধিকার ছিল বিবাহিত স্বামীর···

নারীকে ঘিরে রচনা করেছিল অন্তঃপুরের দুর্ভেদ্য দূরত্ব··· তিনমহলা বাড়ির অন্তঃপুর পেরিয়ে যে নারীর নূপুর নিক্কণ ক্বচিৎ বাইরের বৈঠকখানায় এসে যদি বা পৌঁছত, সে নারীর বাস্তব দেহ থাকতো, তিনমহলা দূরে নয়, তিন আশমান দূরে···

শুধু দেহের দূরত্ব নয়···মনের দিক থেকেও সেদিন নারী বাস করতো দূর গহন-লোকে···

আচারে, অনুষ্ঠানে, পুরাণের কাহিনীর অনুপ্রেরণায় দিনের পর দিন অন্তঃপুরচারিণীকে শেখানো হয়েছিল, নিজের লজ্জার অপ্রকাশ গহন-লোকে বাস করতে···

এবং এই শিক্ষার ফলে সেদিনকার নারী অন্তরের দীনতম সংগোপন বাসনাকেও প্রকাশ করতে পারতো না···যার জন্যে প্রবাদ দাঁড়িয়ে যায় যে নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না···

এই লজ্জার গহন-লোক-বাস আর অপ্রকাশের স্তব্ধতা সেদিন নারীর চারদিকে এক রহস্যের মায়ালোক সৃষ্টি করেছিল···তাই সেদিনকার পুরুষের কাছে এই রহস্যের আবরণ ছিন্ন করার একটা দুর্লভ আনন্দ ছিল···

নারীর মুখে স্তব্ধতার শূন্যতা ছিল বলেই পুরুষ তার অন্তরের আকুলতা দিয়ে সেই শূন্যতাকে নিজের মতন করে পূর্ণ করবার চেষ্টা করতো···

সর্বোপরি ছিল, ধর্ম ও সমাজের কঠোর অনুশাসন, দেহের শুচিতাকে ভঙ্গ করলে নারীকে ভোগ করতে হতো কঠিন দণ্ড···কারণ, সমাজ সেদিন ছিল ক্ষমাহীন শাস্তিদাতা···

বাইরের ও মনের এই কঠিন বাধাকে ভেঙে সেদিন প্রেমকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হতো, তাই প্রেম সেদিন ছিল সংগ্রাম···জীবনের কঠোর বাস্তবতার বিরুদ্ধে কঠিনতম সংগ্রাম···জয় বা পরাজয় যাই হোক, সে পুরুষ ও নারীকে দিতে হতো তার সর্বস্ব···

তাই প্রেম সেদিন ছিল সর্বগ্রাসী···

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়···

ঈশ্বরের মতনই সেদিন প্রেম ছিল দুর্লভ সাধনার ধন···

আধুনিক নর-নারীর কাছে প্রেম হলো জীবনের স্বাভাবিক একটা জৈব কর্ম···

তার ভেতর রহস্যের কিছু নেই···একান্ত বাস্তব একটা প্রয়োজন···জীবনের আর পাঁচটা জিনিসের মধ্যে একটা···

নারীর মুখে আজ অবগুণ্ঠন নেই···তাকে ঘিরে নেই অন্তঃপুরের অলঙ্ঘ্য বাধা···

লজ্জা আজ নারীর ভূষণ নয়···লজ্জা আজ তার কাছে পরম দৈন্য···

প্রেমিক বা প্রেমিকার কাছে দেহের রহস্যও কিছু নেই…

সেক্স্-সাইকলজী আজকের তরুণ-তরুণীকে বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ততায় বুঝিয়ে দিয়েছে যে সকল রকম যৌন ব্যবহারই হলো মানুষের একান্ত স্বাভাবিক একটা আবশ্যক…এর মধ্যে ধর্মের বিধি-নিষেধের কোন স্থান নেই…

সেক্স্-সাইকলজী পড়ে সে জেনেছে, যৌন-বাসনাকে লজ্জায়, সংকোচে বা নৈতিক বিধি-নিষেধের ভয়ে দমন করা (repression) দেহ-বিধির বা স্বাস্থ্যের বিরোধী কার্য…

নারীকে কামনা করবার আগেই

সেক্স্ আজ রহস্যের গহন-গভীরে নেই…সেক্স্ আজ চামড়ার সঙ্গেই স্বপ্রকাশ…

নারীকে কামনা করবার আগেই নারী আজ পুরুষকে কামনা করে…

আমেরিকায় যে কুমারী মেয়ে পুরুষ সতীর্থদের কাছ থেকে সব

চেয়ে বেশী date পায়, সে কুমারী মেয়ে বাড়িতে মা-বাপের কাছে ততই বেশী প্রশংসা পায়···

এবং অবিবাহিত তরুণ-তরুণী যেখানে সমাজের পূর্ণ সম্মতিতে স্বেচ্ছাবিহারের অবকাশ পায়, সেখানে একমাত্র বাধা যা থাকে তা হলো সন্তানসম্ভবা হবার ভয়···আজকের বৈজ্ঞানিক সভ্যতা তরুণ-তরুণীদের হাতে Preventive pill আর চেক পেসারী গুঁজে দিয়ে সে ভয় থেকেও তাদের মুক্ত করেছে···

আমেরিকার কথা বাদ দিয়েও, ইংলণ্ডের মতন কন্‌সারভেটিভ দেশে আজ যেসব ভ্রূণ-হত্যার ব্যাপার আইনের চোখে ধরা পড়ে তারই সংখ্যা বছরে পঞ্চাশ হাজার এবং প্রত্যেক কুড়িটি শিশুর মধ্যে একজন পিতৃ-পরিচয়হীন !

বন্ধু এন্‌ড্রুজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এন্‌ড্রুজ, তোমার এমন রূপ, এমন স্বাস্থ্য, বিয়ে করনি কেন ?

এন্‌ড্রুজ হেসে বলেছিল, যেখানে বাজারে ভাল গরুর দুধ টাকায় দেড় সের করে পাওয়া যায় সেখানে মাসে দেড়শো টাকা খরচ করে গরু পোষা মূর্খতার পরিচয় !

চেক-পেসারীর যুগে রোমাণ্টিক প্রেমের কথা ভাবা সেই মূর্খতারই পরিচয় !

আজকে ভদ্রভাবে কাউকে বোকা বলতে হলে লোকে বলে ভাল মানুষ···যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে কথার মানেরও পরিবর্তন ঘটে যায়···

আজকে যারা প্রেমে প'ড়ে হা-হুতাশ করে লোকে তাদের দেখে করুণা করে···

প্রেমে পড়ার সংজ্ঞা আজ বদলে গিয়েছে···

সিনেমার স্বনামখ্যাত হিরো গ্যারি কুপার এযুগের একজন নামকরা প্রেমিক···

স্ত্রীলোকের উৎপাতে কুপারের পক্ষে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে দোকানে কোন জিনিস কিনতে যাওয়া সম্ভব হয় না···

অবসর বিনোদনের জন্যে কুপার একটা স্টীমার কিনে জলপথে ঘুরে বেড়ায়···

এমনি একদিন নির্জন নদী দিয়ে কুপার চলেছে···তীর ঘেঁষে স্টীমার খুব আস্তে আস্তে চলেছে···

কেবিন থেকে ডেকে বেরিয়ে এসে কুপার দেখে দুটি তরুণী সাঁতার দিয়ে তার স্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে···

কুপারের মনে হলো, মেয়ে দুটি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে যেকোন মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে···

স্টীমার থামে···কুপারের নির্দেশে সারেঙ্গ জলে সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেয়···পূর্ণ নগ্ন দেহে তরুণী দুটি হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে ডেকের ওপর পৌঁছয়···কুপার বিস্ময়ে দেখে তাদের অঙ্গে কোথাও ক্লান্তির চিহ্ন নেই···জলের ওপর তারা ক্লান্তির অভিনয় করেছিল···

কুপারের হাত ধরে নাচতে নাচতে তারা কেবিনে ঢোকে··· কেবিনে ঢুকে দেখে, তাদের আগেই আর দুটি তরুণী সেখানে বসে আছে।

দুয়ের জায়গায় চার···খেলা একঘেয়ে হয়ে আসছিল, আবার নতুন করে জমে ওঠে···

আধুনিক প্রেম হলো নিছক amusement···

বিপদ হলো, নিরাবরণ সেক্স্ অচিরকালের মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে ওঠে···এবং এই একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে মানুষ যৌন-বিকৃতিকে অবলম্বন করতে বাধ্য হয়···

নীতির দিক থেকে নয়, সামনে সুসভ্য আধুনিক মানুষের

জীবনে এক মহা-দুর্ভিক্ষ এগিয়ে আসছে যখন সর্ব-রহস্য-মুক্ত এই অনায়াস যৌন-সম্ভোগ কোন তৃপ্তি তাকে দেবে না…

সেদিন সে বুঝবে রহস্যের আবরণ-হীন অনায়াস যৌন-সম্ভোগের চেয়ে ভয়াবহ নিরানন্দ আর কিছু নেই…

আনন্দের মর্মান্তিক তাগিদে সে তখন আবার নব-অতীন্দ্রিয়তার রহস্যে যৌনিকে আবৃত করে প্রেমকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবে…

লরেন্সের দেহ-বন্দনার পেছনে রয়েছে সেই নব অতীন্দ্রিয়তার অন্বেষণ !

যৌন-আবেদন

ইংরেজী Sex-appeal-এর বাঙলা অনুবাদ করা হয়, যৌন-আবেদন···

কিন্তু আজ ইংরেজী ভাষায় Sex বলতে যা বোঝায়, বাঙলায় অনুরূপ কোন প্রতিশব্দ নেই···

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকেরা আমাদের জীবনের প্রতিদিনের সামান্যতম কাজকেও "ধর্ম" কথাটার দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করেছি, ভিখিরীকে ভিক্ষা দেওয়া ধর্ম, ছেলেদের পড়াশোনা করাও ধর্ম, দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়াও ধর্ম···দুর্দিনের জন্যে কিছু কিছু সঞ্চয় করাও গৃহস্থের ধর্ম···আবার দেবতার পূজা করাও ধর্ম···

আজ তেমনি ইওরোপ ও আমেরিকায় 'সেক্‌স্' কথাটা তাঁরা তেমনি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করছেন···জীবনের প্রত্যেক কাজের মূলে রয়েছে সেক্‌স্···মার বক্ষলীন শিশুর স্তন্য-পিপাসা থেকে আরম্ভ করে মাথাধরা পর্যন্ত সব কিছুর পেছনে রয়েছে সেক্‌স্···দেশের জন্যে আত্মদান করা থেকে মস্তিষ্কবিকৃতি পর্যন্ত সমস্তই হলো Sex বা Sex repression-এর রকম-ফের!

মদনভস্মের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন,

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বমাঝে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

সে হলো পৌরাণিক যুগের কাহিনী···

কিন্তু এযুগে ফ্রয়েড সাইকো-অ্যানালিসিস্-এর তৃতীয় নয়নে নতুন করে মদনদেবকে ভস্মীভূত করে বিশ্বময় যেভাবে সেক্স্‌কে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আজ জীবিত থাকলে তাঁর কীর্তির পরিণাম দেখে তিনি নিজে সব চেয়ে বেশী বিস্মিত হতেন !

অ্যাটম্-বোম্-বিস্ফোরণের মতন, আজ বিশ্বের প্রত্যেক জিনিসের ওপর সেক্স্-এর রেডিও-অ্যাকটিভ্ কণা এসে পড়ছে···

সাহিত্য থেকে ইলেকট্রিক ফ্যানের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত···সিনেমা থেকে ঘটি-বাটি তৈরী পর্যন্ত···সব আজ যৌন-আবেদনের ক্ষেত্র··· জীবনের রহস্যের চাবি আজ একমাত্র যৌন-তত্ত্ববিদ্‌দের হাতে !

হনুমানকে জব্দ করবার জন্যে লঙ্কার রাক্ষসরা হনুমানের ল্যাজে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, তখন তারা ভাবতেও পারে নি হনুমানের ল্যাজের আগুনে তাদেরই স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে যাবে !

চিকিৎসা-শাস্ত্রের অঙ্গ হিসাবে ফ্রয়েড যৌন-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন কিন্তু তাঁর চেলাদের হাতে পড়ে এবং চেলাদের কাছ থেকে হাতুড়েদের কাছে এবং হাতুড়েদের কাছ থেকে আই-এ-পড়া কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছে এসে সেক্স্ আর সাইকো-অ্যানালিসিস্ আজ হিং টিং ছটের মতন বিশ্বের সব সমস্যার সমাধানের একমাত্র ফরমূলা হয়ে উঠছে !

ইওরোপ আর আমেরিকার, বিশেষতঃ আমেরিকার, সমসাময়িক জীবন ও সাহিত্যের দিকে চাইলেই দেখা যায়, এই যৌন-তত্ত্বের বাতিক কি মারাত্মক রূপে তাঁদের পেয়ে বসেছে ! হেন বিষয় নেই, যার রহস্য যৌন-তত্ত্ববিদ্‌রা জানেন না !

ডঃ পল্ শিল্‌ডার "Alice in Wonderland"-এর এক নতুন সমালোচনা করেছেন···শিশু অ্যালিসের চিরমধুময় এই রূপকাহিনীকে যৌন-তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করে শিল্‌ডার প্রমাণ করতে চেয়েছেন এই অমর কাহিনীর লেখক লিউইস্ ক্যারলের যৌন-অবদমনের জন্যে নানারকমের "কমপ্লেক্স্" ছিল···এই রূপকথায় তারা

নানা ছদ্মরূপে ফুটে উঠেছে…এই গল্পের মধ্যে শিশু অ্যালিস যে বার বার বিভিন্ন মূর্তিতে নিজেকে পরিবর্তিত দেখছে, তার মধ্যে রয়েছে "symbols for phallus"—যোনি-লিঙ্গের প্রতীক!

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব-বিশ্রুত সাইকলজীর অধ্যাপক Eyesenck তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখছেন, আমি কোন সরকারী দফতরের বিশেষ প্রয়োজনীয় তদন্ত-বিবরণীতে দেখেছি, সেই তদন্ত-বিবরণী যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা লিখছেন, কয়লার খনির শ্রমিকদের সঙ্গে সেই সব খনির মালিকদের যে ঝগড়া চলেছে, শ্রমিকদের পক্ষে সেই ঝগড়ার মূলে রয়েছে তাদের মনের ভেতর একটা সূক্ষ্ম যৌন-কম্‌প্লেক্‌স্…পৃথিবীর মাতৃ-দেহ খুঁড়তে খুঁড়তে এই কম্‌প্লেক্‌স্ তাদের মনে সৃষ্ট হয়েছে!

এর চেয়েও এক বিচিত্র সংবাদ তিনি দিয়েছেন…

বাসন-তৈরি-করা কোন কোম্পানি বিচিত্র-গড়নের একরকম বাসন তৈরি করে…সেই বাসন ইংলণ্ডে তেমন বিক্রি হলো না কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে তা আশাতীত প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হলো!

এই বাসন ইংলণ্ডে কেন বিক্রীত হলো না, আর যুক্তরাষ্ট্রেই বা কেন হলো তার কারণ অনুসন্ধান করবার ভার একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ বিশেষজ্ঞের ওপর দেওয়া হয়…

এই মনস্তত্ত্ববিদ্ তাঁর অনুসন্ধানে লিখলেন, এই বাসনের গড়নের মধ্যে যোনির গড়নের কিছুটা অনুরূপতা দেখা যায়…তাই ইংলণ্ডের অপেক্ষাকৃত কম যৌন-আবেগশীল নারীদের তা আকর্ষণ করতে পারে নি, অথচ আমেরিকার মেয়েদের তা তীব্রভাবে আকর্ষণ করে, কারণ আমেরিকার মেয়েরা যৌন-আবেদনে স্বভাবতঃই উষ্ণতর!

ফ্রয়েডের কবরকে ঘিরে এই যে প্রেত-যোনির নৃত্য শুরু হয়েছে, সব চেয়ে ভয়ের কথা আজ তারা ইওরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যকে পুরোমাত্রায় দখল করে নিয়েছে…

এই শতাব্দীর প্রথম পাদে ইওরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যে মানবীয় আদর্শের যে বিচিত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, আজ তা একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে···আজকের সাহিত্যে তার ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি কোথাও নেই···

মহাব্যাধির মতন দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ এবং প্রলয়ংকর তৃতীয় মহাযুদ্ধের মসীঘন ছায়ার আতঙ্ক নর ও নারীর সম্পর্ক থেকে সমস্ত পুরানো আদর্শবাদকে ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে···

আজকের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের গল্পে ও উপন্যাসে যে নতুন নায়ক ও নায়িকা দেখা দিয়েছে, তারা সম্পূর্ণ নতুন জাতের লোক··· তাদের কথাবার্তা নতুন···তাদের আচার-ব্যবহার নতুন···তাদের ভাষার ভঙ্গী পর্যন্ত নতুন···

অশোক যেমন এসেছিলেন প্রচারহীন বুদ্ধের বাণীকে জীবনে সত্য করে তুলে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে···আদি খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা যেমন এসেছিলেন জেরুজালেমের অজানা ত্রাণকর্তার বাণীকে সারা ইওরোপে ছড়িয়ে দিতে···আদি খলিফারা যেমন এ[illegible]ছিলেন হজরত মহম্মদের আদর্শকে আরবের ক্ষুদ্র মরুভূমির সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে···আজকের পাশ্চাত্ত্য জগতের সাহিত্যিকেরা তেমনি কলম ধরেছেন, Sex-এর taboo থেকে আধুনিক নর-নারীকে মুক্ত করে ফ্রয়েডের আংশিক সত্যকে বিশ্বজনীন সত্যে পরিণত করতে···

মাত্র এক যুগ আগে যখন Ibsen নোরার মধ্যে বিদ্রোহিণী নব-নারীকে সৃষ্টি করেন, ইওরোপ সন্ত্রস্ত হয়েছিল···

মাত্র চল্লিশ বছর পরে আজকের [illegible]শ্চাত্ত্য সাহিত্যিকেরা যে সব নারী-চরিত্র সৃষ্টি করছেন, তাদের তুলনায় নোরা একান্ত শান্তশিষ্ট, একান্ত নিরীহ নাবালিকা মাত্র !

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকায় থিওডোর ড্রেসার

যখন সিস্টার ক্যারীর চরিত্র সৃষ্টি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষিত লোকেরা এই বই বন্ধ করে দেবার জন্যে আদালতে আবেদন করেন…আর আজ সেই দেশেরই এক নারী-লেখক, গ্রেস্ মেটালিয়াস্, Peyton Place লিখেছেন! এই নারী একান্ত বাস্তবভঙ্গীতে একটা নগণ্য গ্রামের সাধারণ জীবনের আড়ালে যত-রকমের যৌন-বিকৃতি থাকতে পারে, তা অতি নিপুণহাতে লিখেছেন…যৌন-ব্যভিচার বলে একটা শব্দ ছিল কিন্তু আজকের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যৌন-ব্যভিচার বলে কিছু নেই…যা কিছুকে গত যুগের নীতিবাগীশ লোকেরা যৌন-ব্যভিচার বলেছেন, নীতির ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আজকের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিকেরা সেই সব ব্যভিচারের মধ্যেই দেখছেন জীবন-ধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশ! মোরাভিয়া ইতালীর কিশোরদের জীবন নিয়ে দুটি গল্প লিখেছেন, এবং সে বইয়ের যে নামকরণ করেছেন তাতে তিনি বলতে চেয়েছেন, আজকের কিশোরদের এই হলো জীবনের উন্মেষ…একটি গল্পের কিশোর নায়ক তার নিজের গর্ভধারিণী জননীর যৌন-জীবন দেখে যৌন-চেতনায় জেগে উঠছে, রাত্রিতে লুকিয়ে জননীর নগ্নদেহ দেখে কিশোর-পুত্রের যৌন-শিহরন জাগছে! এই গল্পেরই এক জায়গায় সমুদ্র-সৈকত-বিহারিণী জননী যখন কিশোর-পুত্রকে বুকে টেনে আলিঙ্গন করছে, মোরাভিয়া কিশোর-পুত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, মা, তুমি ভুলে যাচ্ছো, আমি আর শিশু নই! দ্বিতীয় গল্পে যে কিশোরের চরিত্র এঁকেছেন, তাতে দেখিয়েছেন, কি করে নিষিদ্ধ পল্লীর নারী-সঙ্গমের ভেতর দিয়ে কিশোরের যৌন-চেতনা অথবা জীবন-চেতনা জাগছে! আমাদের দেশের "প্রোগ্রেসিভ্" সাহিত্যিকেরা এই মোরাভিয়াকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, রবীন্দ্র-শত-বার্ষিকী উৎসবে পৌরোহিত্য করতে! এবং প্রচণ্ড দম্ভে মোরাভিয়া এই সভায় অকুণ্ঠ-ভাষায় ঘোষণা করেন রবীন্দ্রনাথের কোন লেখাই তিনি পড়েন নি!…

পড়লেও তিনি বুঝতে পারতেন না…

সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয়, আজ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে নর-নারীর সম্পর্কের যে ছবি ফুটে উঠছে, তাতে মনে হয় মানুষের দেহে মাত্র দুটো অঙ্গ আছে, একটা হলো উদর, আর একটা হলো লিঙ্গ···

ইতিহাসে পড়েছিলাম, আলেকজান্দার যখন পারস্য জয় করেন, তাঁর রণ-ক্লান্ত অসহিষ্ণু সৈন্যদের অবসাদ দূর করবার জন্যে তিনি একটি রাত্রিতে এক বিরাট যৌন-উৎসবের আয়োজন করেন···

মৃত পারসিকদের শবদেহ তখনো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে, গ্রামের পর গ্রাম দগ্ধ, বাড়ি থেকে তখনো আগুনের ধোঁয়া উঠছে, মৃত-পুত্র মৃত-স্বামী দশ হাজার পারস্যরমণীকে তিনি সেই একটি রাত্রিতে একজায়গায় এনে জড়ো করেন এবং হাজার মশালের আলোয় তিনি তাঁর দশ হাজার সৈনিকদের নিয়ে সমবেতভাবে সারারাত্রিব্যাপী যৌন-উৎসবের আদেশ দেন···

আজ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দিকে চেয়ে সেই নির্লজ্জ যৌন-উৎসবের দৃশ্য মনে জাগে···আজকের সমস্ত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য যেন একটা বিরাট যৌন-উৎসবের রাত্রি···

আঁন্দ্রে জিদের মতন মনীষি আজ উপন্যাস লিখছেন, homosexualityকে সমর্থন করবার জন্যে···

সাত্রের এপিক উপন্যাসের নায়ক ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কি করে কম খরচে নায়িকার গর্ভজাত শিশুকে নষ্ট করা যায় এবং তার ঠিকানা দিচ্ছে স্বয়ং নায়িকা···

সেদিন একটা নভেল পড়লাম, Mother had many lovers···কিশোর-পুত্র গর্ভধারিণী জননীর বিভিন্ন প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা করছে···

আজকের ইওরোপীয় সাহিত্যে নারী বা নারীত্ব প্রায় অদৃশ্য

হয়ে আসছে…তার স্থান সেখানে নিয়েছে সেক্স্…প্রেম বলতে যে বস্তু পড়ে আছে সে শুধু দেহের প্রয়োজন, যৌন-আবেদনের স্বাভাবিকতা…

উদাহরণ…

সম্প্রতি ইংলণ্ডে একজন ডাক্তার বিশেষ সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করছেন, তাঁর নাম রিচার্ড গর্ডন…একজন ডাক্তারকে নায়ক করে তিনি খান-পাঁচেক উপন্যাস লিখেছেন…

তাঁর 'Doctor in the house' নভেলের নায়ক ছাত্র-ডাক্তার চারিত্রিক দুর্বলতার দরুন যৌন-অতৃপ্তির জন্যে তখন পড়াশোনায় মন দিতে পারছে না…তার জন্যে একদিন একজন অভিজ্ঞ সতীর্থ তাকে ভৎর্সনা করে বলছে, তোর যে ব্যায়রাম হয়েছে তার নাম orchitis amorosa acuta অর্থাৎ lover's nuts ! এর ওষুধ কি জানিস্ তো ?

নায়ক উত্তরে বলছে, ওষুধ তো জানি কিন্তু পাচ্ছি কোথায় ? আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে এমন যদি কোন মেয়েকে পাই আমি স্বচ্ছন্দে আমার বেদাগ কুমারত্বকে বিসর্জন দিতে পারি !

তখন দুই বন্ধুতে মিলে পরামর্শ করছে, কুমারত্ব ভাঙবার সহযোগিতায় হাসপাতালের কোন্ নার্সের কাছে আবেদন করা যায় !

অবশেষে একটি নার্সের পরিচয় পাওয়া গেল, যার উদারতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। নায়ককে সাহস দিয়ে বন্ধু পরামর্শ দিল, কাল সন্ধ্যার পর এ ঘর খালি থাকবে…সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ তার সঙ্গে দেখা করবি, তারপর ঘণ্টা দুয়েক তাকে নিয়ে সিনেমা দেখবি …একটু গলা ভেজাবার অছিলায় তাকে সঙ্গে নিয়ে এই ঘরে আসবি …তারপর তোর কার্যোদ্ধারের জন্যে পুরো দুটো ঘণ্টা পাবি !

আজকের পাশ্চাত্ত্য নভেলে নর-নারী-মিলনের এই হলো স্বাভাবিক পরিভাষা !

প্রমথ চৌধুরী একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ইওরোপে যা মরে যায়, তা ভূত হয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপে…

আজ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যে উলঙ্গ যৌন-আরতি শুরু হয়েছে,

ভূত হয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপে

উলঙ্গতার স্বভাব-ধর্মেই অচিরকালের মধ্যে তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া শুরু হবে…

কারণ, যে বৈচিত্র্যের লোভে সেদেশের সাহিত্যিকেরা যৌন-

উলঙ্গতাকে অবলম্বন করেছেন, উলঙ্গতার মধ্যে সে-বৈচিত্র্য নেই···

আবরণ উন্মোচন করলেই উলঙ্গতার একটি মাত্র রূপ···এবং প্রথম পরিচয়ের উন্মাদনার পর তার মধ্যে যা পড়ে থাকে তা হলো বিরক্তি-কর একঘেয়েমির পুনরাবৃত্তি, যার জন্যে pornography-র বই দু'-চারখানা পড়বার পর আর পড়বার ইচ্ছাই থাকে না, কারণ সে-রাজ্যে যা ঘটে, তা একই ঘটনা···

কিন্তু বিপদ হবে আমাদের···

পাশ্চাত্ত্য জগতের সেই যোনি-নৃত্য প্রেতযোনির মতন আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ঘাড়ে এসে চাপবে···

ইতিমধ্যেই তার বোটকা দুর্গন্ধ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মেছোহাটায় চারদিক থেকে নাকে এসে লাগছে···

———

বিয়ে করা অথবা না-করা

সঞ্জীব চিঠি লিখেছে…

"একবার তুই যদি আসতে পারতিস্ বড় ভাল হতো…কাজের চাপে আমি নড়তে পারছি না…একটা বিষয়ের মীমাংসা কিছুতেই করতে পারছি না অথচ মন থেকেও তাকে দূর করতে পারছি না… এমন নিউরটিক হয়ে গিয়েছি যে লোকে ঠাট্টা করলেও সহ্য করতে পারছি না…একটা মীমাংসা আমাকে করতেই হবে…নইলে বোধহয় পাগল হয়ে যাবো…

…কথাটা হলো, বিয়ে করবো, না, করবো না ?

…যে মেসে থাকি, সবাই বিবাহিত, একমাত্র আমি ছাড়া…প্রথম প্রথম তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছিল তাদের কোন অবিবাহিতা আত্মীয়াকে আমার ঘাড়ে চাপাতে…তার জন্যে বহু চেষ্টা করে মেয়েকে এখানে আনিয়ে আমার সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিয়েছিল …আমার মতন পাত্র যদি অবিবাহিত থাকে, সমাজের নাকি সেটা একটা অকল্যাণ…এই কথা রাতদিন তখন তারা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে…

কিন্তু কোন মেয়েকে দেখেই মনে হলো না যে, এই নারীই আমার বিধি-নির্দিষ্ট অর্ধাঙ্গিনী…

একটা ক্ষেত্রে প্রায় মত দিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু এমনি আমার ভাগ্য যেদিন মত দেবো, সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফকরে মামার কথা মনে পড়লো…একবার নয়, ফকরে মামা তিন-তিনবার

বিয়ে করেছিলেন···তিনি একদিন নির্জনে আমার হাত ধরে সজল চক্ষে বলেছিলেন, ভাগ্নে, আমার কথা কোনদিন ভুলিস্ না···বিয়ের রাতে বেনারসী-চেলি-পরা চন্দনের গন্ধ-ভরা যে নিরীহ মেয়েটিকে পাশে পাবে, জেনে রেখো সেই বেনারসী চেলির আড়ালে আছে অন্ততঃ গুটি পাঁচেক জটিল স্ত্রীরোগ plus ছেলের হুপিংকাফ্, টাই-ফয়েড, নিউমোনিয়া, অন্ততঃ এক-একটি ছেলের দুবার করে হাত-পা ভাঙা, একবার অন্ততঃ ট্রাম থেকে পড়ে-যাওয়া multiplied by কালো মেয়ের বিয়ের ভাবনা divided by স্ত্রীর চির-অসন্তুষ্ট মুখের বচন, রীতিমত একটা জটিল vulgar fraction···এই দেখ না, এক মাস ছোট ছেলেটার জ্বর হয়েছে···বাধ্য হয়ে বড় ডাক্তার দেখিয়েছি···তার ফলে দু'ঘণ্টা ধরে ওষুধ খুঁজে বেড়াচ্ছি···খবরদার ভাগ্নে, বিয়ে করে এত সস্তায় নিজের সুখ-স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করো না···

ফক্‌রে মামার সেই শুকনো মুখ মনে পড়লো···ভদ্রলোকদের না করে দিলাম···

মেসের বন্ধুরা যখন বুঝলেন একে ছাদনাতলায় কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যাবে না তখন তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের বিবাহিত জীবনের হা-হুতাশ আমাকে ডেকে শোনাতে লাগলেন···দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার হাত মুঠো করে ধরে কাতর-কণ্ঠে বলেন, বড় হিংসে হয় ব্রাদার, ঠিক করেছ, আর গোটাকতক বছর চোখকান বুঁজিয়ে কাটিয়ে দাও, রোগের জড় মরে যাবে !

কিন্তু বন্ধু, রোগের জড় মরে কই ?

রোজ রাত্তিরে শোবার সময় মুখে একটু ক্রীম মেখে শুই, অনেকদিনের অভ্যেস, তা ছাড়া এখানে বেয়াড়া শীত, ভীষণ ঠোঁট ফাটে···ক্রীমের গন্ধে হঠাৎ বুকের ভেতরটা কি রকম মোচড় দিয়ে ওঠে···কে যেন ভেতর -থেকে শাসন করে, মূর্খ, বিয়ে-করা যদি একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হতো তা হলে সৃষ্টির আদি প্রভাত

থেকে বিশ্বসুদ্ধ লোক এমন হাসিমুখে বিয়ে করতে যেতো না! পৃথিবীতে কোন্ সুখ আছে যার সঙ্গে দুঃখের ভেজাল একটু নেই?

তবে একটা কথা বুঝেছি, বিয়েটা প্রথম যৌবনেই করে ফেলা উচিত···বয়স যত চল্লিশের দিকে এগোয় ততই কোথা থেকে একটা নার্ভাস্‌নেস্ আসে···

প্রত্যেক রাত্রিতে ভাবি, কাগজে পাত্রী চাই একটা বিজ্ঞাপন দেবো···নিশ্চয়ই দেবো···কিন্তু সকালে উঠে সূর্যের আলোয় দৈনন্দিন কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে হরিবাবু আর রামবাবুর আক্ষেপ শুনতে শুনতে নিজের একাকিত্বকে ভালই লাগে···বিজ্ঞাপন লিখতে যেন সময় পাই না···

কিন্তু দিনের কাজ আবার যখন শেষ হয়, হরিবাবু তাস নিয়ে বসেন···ডাকাডাকি করেন···যেতে ভাল লাগে না···অন্ধকারে বিছানায় একা শুয়ে থাকি···

খাওয়াদাওয়ার পর মেস নিশুতি হয়ে যায়···পাশের ঘর থেকে অনাদিবাবুর চোর-তাড়ানো নাক-ডাকার আওয়াজ আসে···আমি আবার কখন তলিয়ে যাই সেই এক-ভাবনায়···যে আসে নি তার অভাবে সমস্ত বিছানা অগ্নিকুণ্ড হয়ে ওঠে···আরো জোর করে প্রতিজ্ঞা করি, কাল সকালে উঠেই বিজ্ঞাপনটা লিখবো!

কিন্তু সে-বিজ্ঞাপন আজও লিখে উঠতে পারি নি···

তাই তোর শরণাপন্ন হচ্ছি, অনেক দেখেছিস্, অনেক বই পড়েছিস্···বিয়ে-করা সম্বন্ধে একটা memo আমাকে তৈরি করে দিতে পারিস্? Memo-র শেষে তোর স্পষ্ট মন্তব্য থাকা চাই··· জানবি, বিনা দ্বিধায় সেই মন্তব্য আমি মানবো···”

বন্ধুকে উত্তরে লিখলাম,—

মনে পড়ে, স্কুলে তুই সব সময় থার্ড হতিস্?

যে গোটা দশেক নম্বর বেশী পেলে সেকেণ্ড বা ফার্স্ট হতে পারা যায় কিছুতেই তা আর তোর ভাগ্যে ঘটে উঠতো না !

রেস্ খেলা জানিস্ ? একজাতের ঘোড়া আছে, তারা সারা পথ lead করে আসে কিন্তু ফিনিশের মুখে যে-আর-একটু-খানি dash দরকার, তা কিছুতেই তারা দিতে পারে না···ফলে জেতার মুখে এসে তারা neck-এ হেরে যায়···

তুই হলি তাদেরই জাতের···

বই পড়ে আর যাই করা যাক্, বিয়ে করা যায় না···আর বিয়ে যারা করে তারা বিনা উপদেশেই করে···

বিশ্বের সমস্ত বিবাহিত ও অবিবাহিত লোকের অভিজ্ঞতার ইতিহাস যদি তোর সামনে ধরি, তাতে তুই আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বি···

আশ্বাস দিয়েছিস্, আমার মন্তব্য মেনে চল্‌বি···

অর্থাৎ তুই চাস্ আমি যেন তোর হাত ধরে তোকে ছাদনাতলায় নিয়ে যাই···

দেখা যাক্···

বিবাহ সম্বন্ধে এই যে আতঙ্ক দেড়শো বছর আগে পৃথিবীতে ছিল না···

বিয়ে-করা নর ও নারীর পরম ধর্ম, এই বিশ্বাসই সভ্যতার গোড়া থেকে চলে আসছিল···এবং এই ধর্মের প্রেরণায় বহু দেশে পুরুষ একবার বিয়ে করেই সন্তুষ্ট হতে পারতো না···ধর্মের উন্মাদনায় বহু নারীরই পাণি-পীড়ন করতো···

বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও কোন জটিলতা ছিল না··· বিবাহের চরম ও পরম উদ্দেশ্য হলো সন্তান-উৎপাদন···হিন্দু শাস্ত্র-

কারেরা বলতেন, বিবাহের উদ্দেশ্য হলো পুত্র-লাভ, কন্যা নয়··· কারণ কন্যার দ্বারা বংশ রক্ষা হয় না···তা ছাড়া, পুৎ-নামক ভয়াবহ নরক থেকে উদ্ধার করতে পারে বলেই পুত্র পুত্র···

এর বেশী জটিলতা বিবাহের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না···

কিন্তু দেড়শো বছরের কিছু আগে ইংলণ্ডে এক কবি নর ও নারীর মিলনের মধ্যে শাস্ত্রের কথা বাতিল করে হৃদয়ের কথা নিয়ে এলেন···স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করলেন, বিবাহ হলো বন্ধন, যে-বন্ধনে মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্য অনুরাগ, যার নাম দিলেন Grand passion, তা নষ্ট হয়ে যায়···শাস্ত্রীয় বিবাহে শুধু পুত্র-উৎপাদনই সম্ভব হয় কিন্তু জীবনে যদি এই Grand passion-এর স্বচ্ছন্দ বিকাশ না ঘটে, জগতে কোন মহৎ সৃষ্টিই সম্ভব হয় না···বিবাহের বন্ধনে ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত ও ক্লান্ত হয়ে লোকাচারের ভয়ে স্বামী ও স্ত্রী শুধু পরস্পরকে বঞ্চিত করেই চলে···ইত্যাদি···

এই কবির নাম শেলী···দুর্দান্ত কবি···রোমাণ্টিক কবিদের রাজা ···দেশ-বিদেশের তরুণেরা তাঁর কবিতা প'ড়ে এক নতুন প্রেরণায় জেগে উঠলো···সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর এই বিদ্রোহের বাণীও তরুণ-তরুণীদের মনে সাড়া দিয়ে উঠলো···

বিয়ে ছিল এতদিন স্কুলের গ্রন্থ-তালিকায় অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ, এখন থেকে ক্রমশঃ তা অবশ্য-পাঠ্যের তালিকা থেকে বাতিল হতে লাগলো ···এতদিন বিয়ে ছিল জীবনে সব চেয়ে বড় ব্যাপার···এখন থেকে জন্মালো একটা নতুন কথা, বিয়ের চেয়ে বড়···

শেলী বললেন, বিয়ের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ হলো, বিয়ের বিধি-নিষেধের বাঁধনে প্রেম মরে যায়, প্রেম মরে গেলে জীবনে আর কি থাকে ?

শুধু মুখের কথায় নয়, নিজের জীবনেও শেলী তাঁর প্রচারিত তত্ত্বকে সত্য বলে গ্রহণ করলেন···এই সম্পর্কে শেলীর জীবনটা দু-চার লাইনে তোকে জানিয়ে রাখছি···

সেই সময় ইংলণ্ডে উইলিয়াম গড্‌উইন্ বলে এক দার্শনিক জন্মান ···রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ করে মানুষের চিন্তার জগতে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তিনি প্রচার করলেন···তিনি বললেন, শিশুদের যেমন একটা কাল্পনিক জুজুর ভয় দেখানো হয়, তেমনি মানুষকে ঈশ্বর ও স্বর্গ-নরকের ভয় দেখিয়ে আসা হচ্ছে···মানুষের মুক্ত-মনের কাছে ঈশ্বর বা স্বর্গ-নরকের কোন প্রয়োজন নেই···শেলী তখন Oxford-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, গড্‌উইনের এই মতবাদ তাঁকে আকর্ষণ করলো···দু'বেলা গড্‌উইন্‌দের বাড়ি যাতায়াত শুরু করলেন ···গুরুর প্রেরণায় ছাত্রাবস্থাতেই তিনি একটা পুস্তিকা ছাপালেন, নাস্তিকতার প্রয়োজন! Oxford-এর পরিচালকদের হাতে সেই বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শেলীকে Oxford থেকে বিতাড়িত করে দিলেন···তরুণ বিদ্রোহী তাতে উৎসাহিত হয়ে উঠলো···

এই সময় হ্যারিয়েট্ ওয়েস্টব্রুক নামে এক ধনীর কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়···কিন্তু মনের মিল হয় না···মনের মিল হলো গুরুকন্যা মেরী গড্‌উইনের সঙ্গে···যে আচার্য মনের স্বাধীনতার কথা প্রচার করেছিলেন তিনি একদিন একান্ত ব্যথিত চিত্তে দেখলেন, পূর্ণ-স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য তাঁর অবিবাহিত কন্যাকে নিয়ে ইংলণ্ড ছেড়ে একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন···

গুরু ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছিলেন, শিষ্য এক-পা এগিয়ে বিবাহকেও অস্বীকার করলো···কাব্যের নায়ক-নায়িকার মতন শেলী আর মেরী অবিবাহিত অবস্থায় ইওরোপ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন··· ইতিমধ্যে বিবাহিত স্ত্রী হ্যারিয়েট্ ওয়েস্টব্রুক আত্মহত্যা করে স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার অধিকার দিয়ে গেলেন···

এবং নোট করে রাখো বন্ধু, ইতিহাস বলে বিবাহ-দ্রোহী এই কবি একদিন গোপনে এক গ্রাম্য গির্জায় গিয়ে তাঁদের এই মিলনকে বিবাহ দ্বারা সিদ্ধ করেন···

এর পর ইওরোপে এক শতাব্দী ধরে যত নাটক লেখা হলো, সব এই সমস্যা নিয়ে। একদল প্রমাণ করতে চাইলেন, বিয়ের চেয়ে বড় আর কিছু নেই, আর একদল প্রমাণ করতে চাইলেন, বিবাহ পুরুষের পক্ষে গোপন ব্যভিচারের প্রেরণা, নারীর পক্ষে নারীত্বের বিসর্জন। দ্বিতীয় পক্ষরা বললেন, আরব্য-উপন্যাসের গল্পে দৈত্যকে আটকে রাখবার জন্যে বলা হয়েছিল, চুলকে টেনে সোজা করতে, বোকা দৈত্য সেটা খুব সহজ মনে করে যতই চুল ধরে টানে, ততই দেখে চুল কুঁকড়ে যাচ্ছে …বিবাহটাও সেই রকম একটা মন-ঠকানো অসাধ্য ব্যাপার…যে জিনিস কখনো চিরস্থায়ী হয় না, তাকে চিরস্থায়ী করবার জন্যেই সমাজ ও ধর্মকে সাক্ষী রেখে বর ও বধূকে মন্ত্র বলতে হয়…আজকে বিবাহের ভেতর দিয়ে আমরা যে মিলিত হচ্ছি, এ মিলন মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি জন্মান্তর পর্যন্ত চিরস্থায়ী রাখবো এই প্রচণ্ড মিথ্যা শপথ করে নর-নারী পরস্পর সহবাসের অধিকার পায়…এবং বিবাহের দু'তিন বছর যেতে না যেতেই স্বামী কখনো গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে এই শপথকে ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো করতে চেষ্টা করে, সামাজিক শাসনের ভয়ে স্ত্রীকে গোপন দীর্ঘশ্বাসে এই শপথের মর্যাদাকে সহ্য করতে হয়…অবশেষে একদিন আসে বিচ্ছেদ !

পুরুষের তৈরী বিবাহের এই বিধানে যেদিন নারী প্রথম উপলব্ধি করলো, তার ব্যক্তিত্ব, তার নারীত্ব কানাকড়িতে বিকিয়ে যাচ্ছে অথচ তাতে স্বামী বা স্ত্রী কোন পক্ষই লাভবান্ হচ্ছে না, তখন সে-ও এই বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো…জন্ম নিলো আধুনিক নারী…রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা…ইবসেন নোরার চরিত্রে জীবন্ত করে গড়ে তুললেন এই মনোময় নারী-মূর্তিকে…আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ গড়লেন কুমুদিনীকে…স্বামীর কাছে প্রথম দেহ-দানের প্রভাতে যার মনে অশ্রুবাষ্পে জেগে উঠলো প্রশ্ন, এ দেহ কাকে দিলাম ভগবান !

জটিলতর হয়ে উঠলো নর ও নারীর সম্পর্ক…

পরেশকে মনে আছে তোর? বিয়ের পর সে আড্ডাতে আসা একরকম বন্ধ করেই দিল…আজ শুনি রাত বারোটার আগে বাড়ি ফেরে না…

একদিন তাকে বলেছিলাম, মনে আছে, বিয়ের সময় অগ্নিসাক্ষী করে কি মন্ত্র পড়েছিলি?

নির্বিকার চিত্তে সে বললো, জানিস্ তো সংস্কৃততে আমি একটু weak…একটা মন্ত্রও আমি ভাল করে শুনতে পাই নি…উচ্চারণও করি নি! সুতরাং কোন moral obligation নেই!

শেলীর মতন যাঁরা রোমাণ্টিক, চারিদিকের বিবাহিত জীবনের চেহারা দেখে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন…

পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ চলে গেলেও, সামাজিকতার খাতিরে মৃত্যু পর্যন্ত সাত-পাকের লোক-দেখানো মর্যাদা দেখাতে গিয়ে, পুরুষকে ভেতর থেকে একেবারে শুকিয়ে যেতে হয়, নয়তো নিত্য-নতুন ছলনার আশ্রয় নিতে হয়…

মিথ্যা আর ছলনায় তিক্ত এই রিক্ততাকে পুরুষ ঢাকতে যতই চেষ্টা করুক না কেন, নারী তা বুঝতেই পারে এবং বুঝতে পেরে অতি সূক্ষ্ম কৌশলে তিক্তকে তিক্ততম করে প্রতিশোধ নেয়…

একটু কান পেতে থাকলেই অধিকাংশ ঘর থেকে শোনা যাবে, পুরুষ চিৎকার করছে, আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছি বিয়ে করে কি সাংঘাতিক ভুল করেছি…

নারী তার উত্তরে বলছে, আমি তোমাকে পায়ে ধরে সেধেছিলাম বিয়ে করতে?

আজ পাশ্চাত্ত্য দেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়, নব-দম্পতি যখন হনি-মুন অন্তে বাড়ি ফেরে, বাড়ি ফেরার পথেই তারা পরস্পরের দিকে ভীত চোখে চায়!

বিবাহ-বাসর আর ডাইভোর্স কোর্টের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃই কমে আসছে…

বার্নার্ড শ' তাঁর বিখ্যাত নাটক 'Man and Superman'-এ মধ্যযুগের প্রেমিক-প্রবর ডন জুয়ানের মুখে বিবাহের এই বিভীষিকাকে অতি স্পষ্টভাষায় রূপ দিয়েছেন...

ডন জুয়ান বলছেন, "বুঝতে পারলাম বিয়ে করতে হলে ভবিষ্যৎ স্ত্রী সম্বন্ধে ধর্ম সাক্ষ্য রেখে আমাকে কতকগুলি অসম্ভব শপথ করতে হবে...

"যথা, আমি স্বেচ্ছায় ও আনন্দে আমার স্ত্রীকে নিত্য সাহচর্য দান করবো, সব ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করবো, এবং বিশ্রম্ভালাপে যদি সুখ পেতে হয় একমাত্র তাঁর মুখের কথার দিকেই আমাকে চেয়ে থাকতে হবে...সর্বোপরি, যতদিন বেঁচে থাকবো তাঁর মুখ ছাড়া আর অন্য কোন স্ত্রীলোকের মুখ ভুলেও দর্শন করবো না... ভুলে যদি চোখে পড়ে, তখুনি মনে করবো, অতি কুৎসিত ওই মুখ...

"এরকম অসম্ভব আর যুক্তিহীন প্রস্তাব আমি জীবনে কখনো শুনি নি...

"কারণ, যাঁকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করছি যদি তাঁর চিন্তাশক্তি, মেধা, কথা-বলবার-ক্ষমতা ও রসবোধ আমার সমান অথচ আমার চেয়ে বেশী না হয়, তাহলে তো অল্পদিনের মধ্যেই আমার আলাপন-বাসনা, মেধা, আমার চিন্তাশক্তি আর রসবোধ স্বভাবতঃই শুষ্ক ও গণ্ডীবদ্ধ হয়ে আসবে...

"যদি একজন স্ত্রালোকের সঙ্গে আজীবন অষ্টপ্রহর পাশাপাশি থাকতে হয়, স্বাভাবিক নিয়মেই কিছুদিন পরে পরস্পরের সঙ্গ তিক্ত হয়ে উঠবে, অন্ততঃ আমি জানি আমার কাছে তা হবে...

"এক সপ্তাহ পরে আমার মনের অবস্থা কি হবে তা আজ আমি জানি না, সেক্ষেত্রে আমি কি করে প্রতিজ্ঞা করবো একজন

স্ত্রালোকের সঙ্গলাভের জন্যে নিখিলের স্ত্রীলোকের সঙ্গকে আজীবন বর্জন করবো ?

“তখন বাধ্য হয়েই সংগোপনতা আসবে…এবং তা কারুর পক্ষেই সুখদায়ক হবে না !…

“অতএব, ও প্রস্তাব আমার জন্যে নয়…”

মনে করো না বন্ধু, তোমার ভীত মনকে আরও ভয়াকুল করবার জন্যে এ সব কথা লিখছি…

দু’দিকের কথা তোমার শোনা দরকার, তাই লিখছি…

ডন জুয়ান আর শেলীর মতন বিয়ের বিপক্ষে যাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, মনে রেখো, পৃথিবী তাঁদের কথা মেনে নেয় নি, কারণ একটি বিয়ের বদলে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বহু-বিবাহই করে গিয়েছেন…‘দু’বিঘার পরিবর্তে’ তাঁরা ‘বিশ্ব-নিখিল’ই পেয়েছেন… খুব কম লোকের ভাগ্যে যা ঘটে…

কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক আছেন, যাঁরা বিবাহ-অনুষ্ঠান বর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে নারী-সঙ্গের বাসনাকেও বর্জন করেছেন…নিষ্ঠা-সহকারে আজীবন একক জীবনকে সগৌরবে বহন করে এসেছেন, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁদের উক্তিকে সমীহ করে চলতে …হয়

ঠাকুর রামকৃষ্ণ যদিও নিজে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু তাঁর চিহ্নিত পার্শ্বচরদের নির্বাচন করবার সময়, একটি প্রশ্নকে তিনি সব চেয়ে বেশী মূল্য দিতেন…তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, হাঁ রে, বিয়ে থা করেছিস্ নাকি ?

যদি শুনতেন আগন্তুক বিবাহিত, তাঁর মুখ থেকে আপনা হতে সভয় উক্তি বেরিয়ে আসতো, ওই যাঃ !

অবশ্য তাঁর গৃহী-ভক্ত অনেকেই ছিলেন, যাঁরা বিবাহিত···তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল, স্ত্রী বিদ্যা-রূপিণী তো ?

অর্থাৎ স্ত্রীর সেই ইচ্ছা ও শক্তি আছে কিনা, যা দিয়ে তিনি স্বামীর চলার পথকে আলোকিত করে আনন্দে চলতে পারেন !

অবশ্য বিবাহ সম্বন্ধে সাধু-সন্ন্যাসীদের সওয়াল-জবাবকে এখানে নথিবদ্ধ না করাই ভাল···

সংসারী লোকদের মধ্যে যাঁরা সযত্নে বিবাহের বন্ধনকে এড়িয়ে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে জগৎ-খ্যাত অনেক কৃতী লোকই আছেন··· বিবাহ সম্বন্ধে তাঁদের প্রধান আপত্তির কারণ হলো, জীবনের দুর্গম পথে বিবাহ এমন একটা বোঝা যা না বইলেও চলে···

রোমাঁ রোলাঁ প্রথম জীবনে এক মহীয়সী নারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন···তাঁর বিখ্যাত আত্মচরিত "The Journey Within"-এ এই অপূর্ব সম্পর্কের কথা তাঁর অপরূপ ভঙ্গীতে লিখে গিয়েছেন··· কিন্তু এই সম্পর্ক ছিল একান্ত দেহ-নিরপেক্ষ···জীবনে তিনি সযত্নে বিবাহকে এড়িয়ে গিয়েছেন,···কারণ, তাঁর মতে রোলাঁ লিখে গিয়েছেন, "A married man is no more than half a man"···'বিবাহিত মানুষ বড় জোর আধখানা মানুষের সামিল'···

কিপলিঙ্ তাঁর এক গল্পে দেখিয়েছেন, ক্যাপটেন গ্যাড্স্বি তাঁর রেজিমেণ্টের সেরা সাহসী সৈনিক ছিলেন···তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন···বিয়ে করার পর তিনি আদর্শ স্বামী হলেন কিন্তু সেনা-নায়ক হিসাবে তিনি নগণ্য হয়ে গেলেন···

আমাদের দেশে আমরা বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমারকে দেখেছি··· যোগাশ্রয়ী বারীন্দ্রকুমারকে দেখেছি···কিন্তু শেষ-জীবনে তিনি যখন কৌমার্য ভঙ্গ করে বিবাহ করলেন, তখন তাঁকে দেখলে মনে হতো মাঠ-জোড়া জালে কঠিনভাবে জড়িয়ে পড়া অসহায় পাখি, যত ডানা ঝাড়া দিচ্ছে ততই জালে জড়িয়ে পড়ছে···

ফ্রান্সের স্বনামখ্যাত রাষ্ট্রনেতা ব্রিয়াঁ আজীবন অবিবাহিত ছিলেন

…তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আপনার এই অসাধারণ পরিশ্রম করবার ক্ষমতা, অনমনীয় তেজ ও বুদ্ধির দীপ্তি, এর উৎস কোথায় ?

ব্রিয়াঁ একান্ত সহজভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, "দিনের কাজ সেরে যখন বাড়িতে ফিরতাম, কোন নারীর অকারণ প্রশ্নের জবার আমাকে দিতে হয় নি…সাধারণতঃ রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষীদের স্ত্রী স্বামীর আনন্দ ও প্রেরণার জন্যে সমাজের উচ্চস্তরে স্ত্রীমহল ঘেঁটে যেসব গুজব সংগ্রহ করতেন, স্বামীর আসরে পরিবেশন করবার জন্যে, আমাকে তা শুনতে হতো না…আমার কর্মজীবনের অন্তরঙ্গ কথাও কোন সহধর্মিণীর মনস্তুষ্টির জন্যে বানিয়ে মিথ্যে করে বলতে হতো না…একলা জীবনযাপন করার একটা স্বচ্ছন্দ শক্তি আছে…সেই হলো আমার সব শক্তির সংগোপন উৎস।"

টলস্টয়ের জীবনের মর্মান্তিক ট্রাজেডীর মূল ছিল তাঁর বিবাহিত জীবনের মধ্যে…যে লোকের লেখা থেকে পৃথিবীর লোক প্রেরণা ও আনন্দ পেয়েছে, তিনি তাঁর জীবনে, জীবন যতই এগিয়ে গিয়েছে ততই তিক্ততম বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন… এবং এই তিক্ততম বেদনা এসেছে বিবাহিত জীবনের বন্ধন থেকে, তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে…এবং একদিন তা এমন অসহনীয় হয়ে ওঠে যে শীতের রাত্রিতে ঘরের আশ্রয় ত্যাগ করে তিনি পথের ধারের এক রেল-স্টেশনে তুষার-আহত হয়ে নিঃসঙ্গ ভিখারীর মতন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন…

জগৎ-টলানো ব্যক্তিত্ব নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের পক্ষে বিবাহ অভিশাপই হয়…কারণ তাঁরা যে দ্রুত-ছন্দে পথ চলেন, তাঁদের পার্শ্বচারিণী স্ত্রীরা সে-ছন্দে চলতে পারেন না…

সেই সব কৃতী পুরুষদের জীবনীর মধ্যে যে অংশ আমরা লিখিত দেখতে পাই, তার সঙ্গে অলিখিত নিঃশব্দ একটা অংশ থাকে, তার কথা তাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্বের আড়ালে চাপা পড়েই

থাকে···সেই সব কৃতী পুরুষ তাঁদের বিরাট কর্মের মধ্যে কিংবা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে কিংবা বাইরের জগতের প্রতিনিয়ত সংযোগের মধ্যে অন্তঃপুরের বঞ্চিত জীবনের ব্যথা ভুলে থাকবার প্রেরণা খুঁজে পান কিন্তু সেই সব বিরাট পুরুষদের সহধর্মিণীদের মধ্যে অনেককেই টলস্টয়ের স্ত্রীর মতন আত্ম-নির্যাতন, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী-নির্যাতনের পথ গ্রহণ করতে হয়···কোন কোন নারী দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে আজীবন একটা মৌন পরাজয়কে নিঃশব্দে বহন করে চলেন···

ক্বচিৎ দু'একজন নারী আছেন, যাঁরা সেই দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়েও, আত্মচেষ্টায় সেই প্রচণ্ড স্বামীর পদক্ষেপের সঙ্গে চলবার শক্তি অর্জন করেন···মহাত্মা গান্ধীর প্রচণ্ড জীবনের পাশে আমরা সেইভাবে চলতে দেখেছি কস্তুরবাকে, নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে মথিত করে এক চেষ্টাকৃত নতুন ব্যক্তিত্বের নিঃশব্দ মর্যাদায়···

গান্ধীজী যখন প্রথম জীবনে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন, অন্য সব নিয়মের মধ্যে তিনি নিয়ম করলেন, আশ্রমবাসী প্রত্যেককেই মাসে অন্ততঃ একদিন করে সকল আশ্রমবাসীর পায়খানা পরিষ্কার করতে হবে···

সেই নিয়মের কথা শুনে সাধারণ হিন্দুঘরের আচার-নিষ্ঠ মেয়ে কস্তুরবা প্রমাদ গুনলেন···মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল, গান্ধীজীর স্ত্রী হিসাবে হয়ত তিনি এই আশ্রম-কর্ম থেকে অব্যাহতি পাবেন কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যাতে তিনি তাঁর স্বামীর বিচিত্র কঠোর মনের পরিচয় পেয়ে গিয়েছেন! অবশেষে কম্পিত-হৃদয়ে তিনি একদিন যথারীতি লিখিত নোটিস পেলেন, কাল রাত্রিপ্রভাতে তাঁকে যথাসময়ে আশ্রমের পায়খানা পরিষ্কার করতে হবে!

তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন, এবং গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই জানালেন, এই আচারবিরুদ্ধ কাজ তিনি কিছুতেই করতে পারবেন না!

এই বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে তীব্র বচসা হয়, গান্ধীজী অতিসংক্ষেপেই তার কথা লিখে গিয়েছেন…তাঁর নিজের লেখা থেকে এইটুকু জানা যায়, রোরুদ্যমানা কস্তুরবাকে তিনি শেষ কথা জানিয়ে গেলেন, হয় রাত্রিশেষে তাঁকে আশ্রমবাসী হিসাবে আশ্রমের নিয়ম পালন করতে হবে, নতুবা আশ্রমের বাইরে থাকবার ব্যবস্থা তাঁর জন্যে করতে হবে!

সারা রাত্রি ধরে কস্তুরবার সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব আমরা শুধু কল্পনাই করতে পারি…রাত্রিশেষে উষালগ্নে তিনি পায়খানা পরিষ্কার করতে বেরুলেন!

এই প্রচণ্ড অ-সাধারণ স্বামীর সহধর্মিণী হতে গিয়ে বা-কে নিঃশব্দে যে প্রচণ্ড আত্মচেষ্টা করতে হয়েছে, তার কাহিনী আমরা জানি না… শুধু দু'একটি ঘটনা গান্ধীজী যা নিজে লিখেছেন তাই থেকে অনুমান করতে পারি, অনুমান করতে পারি ভারত-নারীর পক্ষেই সম্ভব ছিল ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে এইভাবে স্বামীর ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করা…

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গান্ধীজী যখন আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে আসছেন, আফ্রিকা সম্বন্ধে ভারতের জনমতকে সজাগ করবার জন্যে…স্থানীয় প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁকে এবং তাঁর দলের লোকদের অভিনন্দন জানাবার বিরাট আয়োজন করেন…এই সভায় বহু প্রবাসী ভারতীয় পুরুষ ও নারী যে-যা পেরেছেন তা দান করেন …সেই সমস্ত উপহার পুঁটলি-বাঁধা অবস্থায় যখন গান্ধীজীর ঘরে এসে পৌঁছল, কস্তুরবা দেখলেন, তার ভেতর নানারকমের গয়না রয়েছে। তখন তিনি মা হয়েছেন, নারীর স্বভাব-ধর্মে তিনি গয়না-গুলো একটা আলাদা পুঁটলিতে নিজের কাছে রেখে দিলেন, পুত্রের বিয়ের সময় পুত্রবধূকে উপহার দেবার জন্যে…কারণ ইতিমধ্যেই তিনি ভাল করে বুঝেছিলেন যে তাঁর উন্মাদ স্বামী কোনদিনই পুত্রবধূর অঙ্গশোভার জন্যে গয়না গড়িয়ে দেবেন না…

যাত্রার আগের দিন হঠাৎ গান্ধীজীর নজরে পড়লো, সংগৃহীত

উপহার-সামগ্রীর মধ্যে একটাও গয়না নেই! গয়না কোথায় গেল?

কস্তুরবা দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, সে-সব গয়না তিনি রেখে দিয়েছেন!

গান্ধীজী বিস্মিত হয়ে গেলেন, বললেন, ওসব তো আমার সম্পত্তি নয়, আমার সম্পত্তি হলে তুমি রাখতে পারতে!

বা রুখে দাঁড়ালেন এবার, এসব ব্যক্তিগতভাবে তুমি উপহার পেয়েছো, অতএব তাতে আমার অধিকার আছে! একটা গয়নাও আমি ফিরিয়ে দেবো না, এসব থাকবে আমার ভবিষ্যৎ পুত্রবধূর জন্যে!

গান্ধীজী স্থির-কণ্ঠে কস্তুরবাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, এসব গয়না তিনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করবার জন্যে পান নি, এসব তাঁকে দেওয়া হয়েছে জনগণের সেবার কাজে লাগাবার জন্যে!

পরের দিন···জাহাজে ওঠবার সময় হয়ে আসে···কস্তুরবা গয়নার পুঁটলি কোলে নিয়ে বসে থাকেন···যখন বুঝলেন, জাহাজ ও যাত্রীর দল তাঁকে বাদ দিয়েও চলে যেতে পারে, অশ্রুস্তব্ধ মুখে গয়নার পুঁটলি স্বামীর হাতে তুলে দিলেন···

সেদিন কস্তুরবার এই পরাজয় কিন্তু সবটাই পরাজয় নয়···এই সব পরাজয়ের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে তিনি এক বিচিত্র মৌন শক্তি অর্জন করেন···পরবর্তী জীবনে যখন গান্ধীজী মহাত্মা গান্ধী, তখন আর পাঁচজন আশ্রমবাসীর মতন গান্ধীজীকেও এই নিঃশব্দচারিণীকে সময় বিশেষে সমীহ করে চলতে হতো···

বন্ধু, এই সব ঐতিহাসিক দম্পতির দাম্পত্য-জীবনের কথা শুনে ভীত হয়ো না···এতদিন পর্যন্ত যখন তুমি একটা পোস্টকার্ড ভাল

করে লিখতে পার নি, তখন টলস্টয় হবার কোন আশঙ্কাই নেই তোমার···একটি চাকরের চরিত্র-সংশোধন করতে পার নি যখন, গান্ধীজীর মতন ব্রিটিশচিত্ত-সংশোধনের দায় তোমাকে ভুগতে হবে না···

সুতরাং অ-সাধারণ পুরুষদের দাম্পত্য-জীবনের অন্তর্গূঢ় ব্যথা ও তিক্ততার দুঃস্বপ্ন তোমাকে যেন ব্যথিত না করে···

অল্পবয়সে, এমন কি মধ্যবয়সেও অনেক পুরুষের লোভ থাকে, Romantic Love অথবা Free Love-এর ওপর, যার জন্যে বিবাহিত জীবনের দায়-অদায়, ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট, অসুখ-বিসুখ, ছেলে-মেয়েদের দায়িত্ব, কেন-এত-দেরি-হলো-ফিরতে, ছুটির-দিনেও-বাড়িতে-থাকতে-পার-না-কেন, এই জাতীয় সমস্যা ও প্রশ্নকে ভয়াবহ লাগে···

একটা গল্প বলি···পুরীর কোন হোটেলে একবার এক বৃদ্ধায়মান উকিলকে দেখেছিলাম···ঈস্টারের ছুটি···দক্ষিণ সমীরের ও উন্মুক্ত সমুদ্র-সৈকতের স্বচ্ছন্দ জীবনের লোভে হোটেলের বারান্দা পর্যন্ত ভরতি···সাত থেকে আরম্ভ করে ষাট পর্যন্ত নারীরা যে-যাঁর বয়স-অনুপাতে দল গঠন করে স্বচ্ছন্দ আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন···কলকাতার একদিনের পরিচয় এখানে নিমেষে বহুদিনের আত্মীয়তায় পরিণত হচ্ছে···উকিল ভদ্রলোক দেখি আনন্দে মশগুল হয়ে যেচে অপরিচিতা তরুণীর দলকে ডেকে বলছেন, কি নাতনী, ক্যারম্ খেলবে নাকি? তরুণীরা অকারণে হেসে এ-ওর-ঘাড়ে-পড়ে চলে যায়! বৃদ্ধের খুশী ধরে না!

দু'দিন পরে দেখি, বৃদ্ধ মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন···রুপো-বাঁধানো হাতের লাঠিটা ঠুকে ঠুকে যেন অদৃশ্য কোন আক্রমণকারীকে তাড়াবার চেষ্টা করছেন···পাশ দিয়ে তরুণী নাতনীরা হেসে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে চলে যাচ্ছে, বৃদ্ধ চেয়েও দেখেন না···

নিঃশব্দে পাশের ইজিচেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করি, কি হলো দাদা? সে-হাসি-খুশী-মুখ কোথায় গেল?

গম্ভীরভাবে পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বার করে বললেন, এই দেখুন!

টেলিগ্রাম পড়ে দেখি, তাতে কোন বিপদের বা আপদের কোন কথা লেখা নেই, শুধু লেখা আছে, অনীতা আর তার স্বামী কাল যাচ্ছে, ইতি অনীতার মা!

মনে মনে ভাবলাম, হোটেলে হয়ত স্থান সংকুলান করতে পারেন নি, তাই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন···

বললাম, যদি বলেন, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি!

লাঠি ঠুকে বৃদ্ধ রেগে চিৎকার করে উঠলেন, আপনি কি চেষ্টা করবেন? এ টেলিগ্রামের মানে বুঝতে পারলেন? কত বড় শয়তানি এর ভেতর আছে তা বুঝতে পারছেন?

বিস্মিত হয়ে বলি, না!

—তবে শুনুন···বিয়ে যারা না করেছে, তারা সুখে আছে! সেদিন আপনি একদল ছেলেদের বলছিলেন, জীবনের খানিকটা সময় একলা থাকা দরকার! ঠিক কথা বলেছিলেন···টেলিগ্রাম করেছে কে? অনীতার মা অর্থাৎ আমার স্ত্রী! পুরীতে কয়েকদিন একলা বিশ্রাম করবো বলে অনেক কাণ্ড করে তাঁকে বাড়িতে রেখে আসি···কিন্তু এমনি তাঁর সন্দেহ-বাতিক, আমার ওপর স্পাইগিরি করবার জন্যে তিনিই উদ্যোগী হয়ে মেয়ে-জামাইকে পাঠাচ্ছেন! দেখবেন, এখানে যা-যা করবো, যা-যা বলবো ঐ মেয়ে সব মায়ের কাছে রিপোর্ট করবে···ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আমাকে বসে থাকতে হবে···my God!

খুব লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটিতে তিনবার সজোরে লাঠিটা ঠুকলেন···মনে হলো লাঠির একটা stroke তাঁর গুরুজনের ওপর যিনি তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন, দ্বিতীয় stroke পুরোহিতের ওপর

যিনি বিয়ের মন্ত্র পড়িয়েছিলেন, তৃতীয় stroke বৃদ্ধা সহধর্মিণী অনীতার মা-র ওপর !

Free love বা romantic love-এর একটা ক্ষীণতম বাসন্তী-কণার জন্যে, শুধু একমুহূর্তের কোন অপরিচিতার একটা মধুর কথার জন্যে বৃদ্ধের মন কত না স্বপ্ন দেখেছে…কিন্তু অনীতার মায়ের টেলিগ্রাম তা দুঃস্বপ্নে পরিণত করে দিল…

সাধারণ মানুষ একটা রূঢ় সত্যকে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না, সে সত্য হলো, আন্দ্রে মারোয়ার ভাষায়, Free love is never free, অর্থাৎ যাকে আমরা দূর থেকে ফ্রী লাভ্ বলি তার মধ্যে এতটুকু ফ্রীডম্ বা স্বাধীনতা নেই !

বিবাহিত জীবনের মধ্যে যেসব বন্ধন দেখে তোমার মতন বয়স্থ আইবুড়োরা ভীত হয়ে ওঠেন, বিশ্বাস কর বন্ধু, ফ্রী লাভের ভেতর প্রকারান্তরে বহু দৃঢ়তর বন্ধন আছে, পড়ে-আর্তনাদ-করবার মতন বহু গভীরতর গহ্বর আছে…এবং বিশ্বাস কর, সে গহ্বর থেকে কেউ হাত ধরে তুলবে না…

কোন কোন পুকুরের পাড়ের কাছে চোরা গর্ত থাকে, সে গর্তে পড়লে আর মাথা তুলে উঠতে হবে না…তাই অনেকক্ষেত্রে সেখানে বাঁশ পুঁতে সাইন-বোর্ড দেওয়া থাকে, সাবধান, এখানে স্নান করবেন না !

Free love-এর পুষ্করিণী এমনি মারাত্মক চোরা গর্তে ভরা…

দর্পী দুর্যোধনকে জব্দ করবার জন্যে ময়-দানবের তৈরী মায়া-প্রাঙ্গণ…খটখটে শুকনো পাথর কিন্তু মনে হবে হাঁটুজলে ভরতি ; সকলের সামনে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে হেঁটে অপদস্থ হতে হবে… আবার যেখানে বুক পর্যন্ত জল সেখানে মনে হবে পরিষ্কার স্ফটিক পাথর, স্বচ্ছন্দে চলতে গিয়ে জলে ডুবে নাকানিচোবানি খেতে হবে…

একটা কথা ভুলো না বন্ধু, মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও আত্মসুখ-প্রয়াসী জীব…নারী ও প্রেমকে নিয়ে সে একটার পর একটা বহু

পরীক্ষা করে দেখেছে···সব পরীক্ষায় হতাশ হয়ে তবে সে এক-পাকের জায়গায় সাত-পাকে নিজেকে নারীর সঙ্গে বেঁধেছে···

যদি কোনদিন অবিবাহিত একক জীবনের স্বচ্ছন্দ অরণ্য-বিহারের স্বপ্ন মনে জাগে, বাঘের-মুখ-থেকে-ফিরে-আসা নিতান্ত ভাগ্যবান দু'চারজন শিকারীর অভিজ্ঞতার কথা বারান্তরে বলবো···

ইতিমধ্যে 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনটা লিখে ফেলতে পার !

ফ্রী লভ্ বনাম বিবাহ

আজ গোড়াতেই অতি স্পষ্টভাষায় আমার মন্তব্য তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি বন্ধু,—

আদিকালের গান্ধর্ব বিবাহ থেকে আরম্ভ করে আজকালকার কালীঘাটে মালা-বদল-করা পর্যন্ত নর ও নারীর সম্বন্ধ নিয়ে যতরকমের পরীক্ষা হয়েছে, তার মধ্যে বিধি-বিধান-সম্মত এবং শুধু সাত-পাকের নয়, সাত-সাতে উনপঞ্চাশ পাকের বিয়েই হলো পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ এবং সব চেয়ে কম বেদনাদায়ক সম্বন্ধ···

বন্ধনহীন সুখের লোভে মানুষ বিয়ের বাঁধনকে যত আলগা করতে গিয়েছে, তত বেশী দুঃখের বাঁধনে আর্তনাদ করেছে···এর চেয়ে বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য আর কিছু নেই···

রাজনীতির উত্তেজনায় আজ অনেকেই হয়ত ভুলে গিয়েছেন, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেই রাশিয়াতে এই নিয়ে একটা বিরাট পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল···

জার ও জার-তন্ত্র সমূলে ধ্বংস করে বোলশেভিক রাশিয়া নব-বিজয়-উল্লাসে আর দুটি অতি-পুরানো জিনিসকে নিঃশেষে ধ্বংস করবার জন্যে কাস্তে ও কুড়ুল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে···

একটি হলো ঈশ্বর, আর একটি হলো বিবাহ···

ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ এখনো চলছে কিন্তু সাত-পাকের বিয়ে ভাঙতে গিয়ে তার কাস্তে কুড়ুল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়···

শাসনদণ্ড হাতে-পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনকার বোলশেভিক বিপ্লবীরা গির্জার আওতা থেকে বিবাহকে টেনে বাইরে এনে এমন

সহজসাধ্য করে দিল যে জৈব-প্রয়োজনে মিলন ছাড়া বিয়ের মধ্যে আর কোন বাঁধন রইলো না…

দু'তিন বছর এই বন্ধনহীন সুখ ভোগ করার পরই বোলশেভিক রাশিয়ার ভেতর থেকে উঠলো এক তীব্র আর্তনাদ…বিবাহের এই গণতান্ত্রিক রূপের বিরুদ্ধে আর্তনাদ করে উঠলো, রুশ-পুরুষেরা নয়, রুশ-নারীরা…

জৈব-প্রয়োজনের তাগিদে বিয়ের বাঁধনের কঠোরতা ভাঙতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, জৈব-প্রয়োজনের মূল জিনিসকেই তাঁরা ভেঙে ফেলছেন…

সেদিনকার সেই আর্তনাদের স্মৃতি এক রুশ-তরুণীর লেখায় দেখতে পাওয়া যায়…তরুণী তার প্রেমাস্পদকে লিখছে, "তুমি বুঝতে পারছো না, আমার প্রতিবাদ কোথায়! বিয়ের ভেতর দিয়ে আমি চাই আমার একান্ত নিজস্ব একটু তৃপ্তি…বৃহৎ কিছু নয়…কিন্তু যা বিধিসম্মত, legitimate…শুধু একটা নিভৃত কোণ যেখানে তুমি ছাড়া আর কারুর প্রবেশাধিকার থাকবে না…এবং এই নিভৃতির পবিত্রতাকে বিধিসম্মতভাবে স্বীকার করে নিতে হবে…"

সোভিয়েট রাশিয়ার শাসকেরা বিপ্লব-মুহূর্তের সেই ভুলকে এমনভাবে সংশোধন করেছেন যে সেখানে ডাইভোর্স পাওয়া আজ রীতিমত কঠোর ব্যাপার…ডাইভোর্স থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী জুড়ে আজ monogamus বিবাহই হলো নর-নারী-মিলনের সব চেয়ে বড় আদর্শ…

আমাদের দেশে এবং প্রাচ্য জগতের বহু দেশে এখনো পর্যন্ত বিয়ের ব্যাপারে প্রেম আসে বিয়ের পরে, বিয়ের আগে নয়। কারণ, বিয়েটা ঘটে অভিভাবকদের চেষ্টায়। আমাদের দেশে

এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকেরাই বিয়ে দেন, পাত্র ও পাত্রীকে অভিভাবকদের নির্বাচনকে স্বীকার করে নিতে হয়।

এ থেকে মনে করো না যে আমাদের দেশে প্রেমে-পড়ে-বিয়ে-করা ছিল না বা এখন নেই···

আমাদের বাঙলা দেশের গত একশো বছরের গল্প ও উপন্যাস পড়লে দেখা যায় যে, বিগত একশো বছর ধরে আমাদের গল্প ও উপন্যাসের মূল বিষয়-বস্তু ছিল, প্রেমে-পড়ার বিরুদ্ধে অভিভাবকদের নির্দিষ্ট বিয়ের সংঘর্ষ ও সংঘাত···

এবং এই সংঘর্ষে সাহিত্যিকরা ক্রমশঃ যতই আধুনিক কালের দিকে এগিয়ে এসেছেন ততই অভিভাবক আর ঘটকদের বিয়ের ব্যাপার থেকে সরিয়ে দিয়েছেন···সাহিত্যে এবং সমাজে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ে হয়ে গেলে পর অভিভাবকেরা জানতে পারেন···কোন অভিভাবক নিমন্ত্রণের চিঠি পান, কেউ কেউ তা-ও পান না···

তবুও সংখ্যা হিসাবে ধরলে, আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত বেশির ভাগ বিয়েই অভিভাবকেরাই ঘটিয়ে থাকেন···

এবং এই অভিভাবকদের নির্দিষ্ট বিয়ে প্রেমদায়ক হয় না এবং তা হৃদয়-ধর্মের বিরোধী, এই জাতীয় একটা ধারণা আমাদের অনেকের আছে···এই ধারণার জন্যে দায়ী সাহিত্যিকেরা এবং আধুনিকতম কালে সিনেমা-ওয়ালারা···

ঘটক আর অভিভাবকদের বিয়ের আসর থেকে তাড়াতে সাহিত্যিকরা অনেক তত্ত্ব-কথা বলেছেন, বহু বিচার-বিতর্ক করেছেন কিন্তু সিনেমা-ওয়ালারা এসে একেবারে তাঁদের ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছেন···

আজকের তরুণ-তরুণীরা সিনেমার ছবির কাছ থেকে তাঁদের প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বাস্তব-জীবনে সেই ছবির প্রেমকেই খুঁজে বেড়ান···

জগৎ জুড়ে সিনেমার এই মারাত্মক প্রভাব নর ও নারীর সম্বন্ধের স্বাভাবিক ঐশ্বর্যকে ভেঙে চুরমার করতে চলেছে···

সিনেমা সাহিত্যের মতন criticism of life নয়···একমাত্র

আজকের তরুণ-তরুণীরা সিনেমার ছবির কাছ থেকে তাদের প্রেমের···

সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া সিনেমা হলো মূলতঃ একটা ব্যবসা, যে ব্যবসার একমাত্র লক্ষ্য হলো, মানুষের মনের নিষ্পেষিত কামনার ছবিকে রঙীন করে দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পয়সা অর্জন করা···

একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া, এই ব্যবসা এমন লোকদের হাতে পরিচালিত হয় যাঁরা ছবি তৈরি করতে যে পয়সা খরচ করেন, ছবি দেখিয়ে তার দশগুণ, পারলে একশোগুণ পয়সা রোজগার করতে চান এবং তাঁরা জানেন average মানুষের মনের ক্ষুধা না মিটোলে সে টাকা ফিরে আসবে না! মুখে তাঁরা যাই বলুন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার risk তাঁরা নিতে পারেন না···তাই বাইবেলের কাহিনী ছবিতে রূপায়িত করলেও তার ভেতর পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য শার্দূলের জন্যে কাঁচা মাংসের জোগান তাঁরা ঠিকই দেবেন···

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হলো এই ছবির ব্যবসায়ে অগ্রণী··· ভারতবর্ষের গৌরব যে ভারতবর্ষ এই ব্যবসায়ে আমেরিকার মাত্র এক ধাপ নীচে আছে এবং ভারতের সিনেমা-অধিনায়কেরা যুক্তরাষ্ট্রকেই অনুসরণ করে চলেছে···

এ কথা এখানে উত্থাপন করছি, তার কারণ আমেরিকার সমাজ-জীবনে, সেখানকার তরুণ-তরুণীদের জীবনে এই সিনেমার ছবি যে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তার ফলে তরুণ আমেরিকার যৌন-জীবন এক ভীতিজনক অতৃপ্তির চোরাবালির মধ্যে অসহায়ভাবে ডুবে চলেছে···বিবাহিত জীবনের মধ্যে sex আর glamour এমনভাবে এসে পড়েছে যে নব-বিবাহিত দম্পতি হনিমুন-অন্তে পরস্পরের দিকে ভীতিজনকভাবে চেয়ে ভাবে, সব ফুরিয়ে গেল কি?

বাসর-রাত্রিতে যে বিয়ে ফুরিয়ে যায়, সে বিয়ের প্রয়োজন কি?

Roussy de Sales আমেরিকার সামাজিক জীবন সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যে বহুদিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছেন···যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ-তরুণীদের ওপর সিনেমার এই প্রভাব সম্বন্ধে তিনি লিখছেন,—

—আমেরিকার তরুণদের মধ্যে অনেকেই দেখেছি, বিয়ের ব্যাপারে খুব উৎসুক কারণ তাঁদের ধারণা বিয়ের মধ্যে, তাঁদের

নির্বাচিত প্রণয়িনীর মধ্যে, অন্তরের ঈপ্সিত পূর্ণ প্রেমকে তাঁরা পাবেন···

বিয়ের আগে তাঁরা দুজনে মিলে যখনই সুযোগ পেয়েছেন পাশাপাশি বসে সিনেমার পর সিনেমা দেখেছেন···

ছবির পর ছবি দেখতে দেখতে প্রেম সম্বন্ধে তাঁদের বিচিত্র ধারণা জন্মেছে···প্রেম হলো সুবেশা তরুণী নারীকে নিয়ে এক সুন্দর দেশ থেকে আর এক সুন্দর দেশে, অরণ্যে, সমুদ্র-সৈকতে, পর্বতশৃঙ্গে, আদিম শিশুর মতন ঘুরে বেড়ানো···

মাঝে মাঝে কলহ হবে···কিন্তু প্রত্যেক কলহের অবসান হবে দীর্ঘ চুম্বনে···

যখনই প্রেয়সীর দিকে চেয়ে দেখবেন, তখনই ফুটে উঠবে অনবদ্য একটুকরো দেহ-রেখা···

দুঃখের বিষয় কোন ছবি থেকে তারা জানতে পারে না যে, দেশ বেড়াতে গেলে প্রচুর খরচ লাগে, পথে বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আছে ক্লান্তি আর অবসাদ···ছবির পর্দায় যত শীগ্‌গির এক সুন্দর জায়গা থেকে আর এক সুন্দর জায়গায় যাওয়া যায়, ছবির বাইরের জগতে তত শীগ্‌গির কোথাও যাওয়া যায় না···যে সুবেশা নারী পাশে থাকেন, তাঁর সব জায়গা পছন্দ না হতে পারে, সব সময় তিনি না-ও হাসতে পারেন এবং দরকার হলে রীতিমত বিরক্তও হতে পারেন···

ছবিতে যে নায়িকাকে সব সময় সুন্দর দেখায়, পাশের প্রেয়সীকে সব সময় তেমনি সুন্দরী লাগতে পারে না···কারণ ছবির নায়িকার প্রত্যেক ছবির পেছনে আছে রঙ আর তুলি আর পাউডার নিয়ে দশজন মেক্-আপের লোক, তৈরী-করা ভ্রূ একটু ভেঙে গেলেই তখনি এসে তারা ভ্রূ মেরামত করে দেয়···

যে প্রেয়সী হবে ঘরের ঘরনী, দিনের মধ্যে বহুবার দেখতে

হবে তার পাউডারহীন মুখ, একটু এদিকওদিক হলে শুনতে হবে তার মুখে অতি তিক্ত কথা···

নব-বিবাহিতা তরুণী স্ত্রীও দু'দিন পরেই জানতে পারবে, যতই glamour থাকুক না কেন, পুরুষরা আসলে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ···প্রেমের মুহূর্তে সে প্রেয়সীকে নক্ষত্রের হার পরিয়ে দিতে পারে কিন্তু খাবার সময় পুডিং-এ একটু কম মিষ্টি হলে মুখভার করে টেবিল থেকে উঠে যেতে পারে···

ফলে কি দাঁড়ায়? বিয়ের অল্প দিন পরেই স্বামী স্ত্রী দুজনেই মনে মনে ভেঙে পড়ে···পৃথিবীতে একেবারে-তৈরী সম্পূর্ণ কোন জিনিসই হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না, একথা তারা কেউই ভাবে না···

উলটে প্রথম যে কথা তাদের মনে জাগে তা হলো, নিশ্চয়ই নির্বাচনে ভুল হয়েছে···যাকে মনের মতন মনে হয়েছিল, আসলে সে মনের মতন নয়···এ ভুল যখন সংশোধন করা যায়, তখন আর কিসের ভাবনা? তারা ডাইভোর্সের আবেদন করে···ডাইভোর্স পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু হয় মনের মতনের অনুসন্ধান··· এইভাবে চলে অনুসন্ধান আর বর্জনের পালা···অবশেষে একদিন আসে নিরুত্তর জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতন বার্ধক্য···শত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তখন মনে পড়ে বহুদূরে-ফেলে-আসা প্রথম প্রেমকে, যদি তখন একটু মানিয়ে নিয়ে চলতে পারতাম!

বহু গ্রহণ ও বর্জনের পর নিষ্ফলা বার্ধক্যে তারা বুঝতে পারে,

একমাত্র বিবাহিত প্রেমই বার্ধক্য ছাড়িয়ে বাঁচতে পাবে···

এবং তার জন্যে একটি বিবাহই যথেষ্ট···

কারণ পৃথিবীতে কোথাও দুটি প্রাণী নেই, যাদের অভ্যাস, আচরণ, মতামত, রীতিনীতি একেবারে সমান···

এই অ-সমানতাকে স্বীকার করে নিয়েই বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়,

আমাদের দুজনের মিলিত চেষ্টায় আমাদের লক্ষ্য এক হোক, জীবন এক হোক···

মৃত্যু পর্যন্ত পরস্পর বহু আপসের ভেতর দিয়ে এই শপথকে আমরা মেনে চলবো···

এই হলো বিবাহের শপথ···

অন্যথায়,—

"If separation is made easy, the slightest discussion can cause it."

"বিবাহ-বিচ্ছেদের উপায় যদি সহজ-সাধ্য হয়, তাহলে সামান্য একটা বিতর্কেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতে পারে"—

পুরুষ ও নারীর স্বাতন্ত্র্যকে নিক্তির পাল্লায় ওজন করে আজকে যাঁরা ডাইভোর্সকে মেনে নিয়েছেন, এ হলো বহু অভিজ্ঞতার পর সেই পাশ্চাত্ত্য সমাজের মতামত···

বিয়ের বেদীতে ওঠবার সময়ই পাত্র বা পাত্রীর চেতন বা অবচেতন মনে যদি এই ধারণা থাকে, যদি সঙ্গী-নির্বাচনে ভুলই হয়ে থাকে, ডাইভোর্স কোর্ট তো খোলাই আছে,

এবং এটা শুধু কাল্পনিক অনুমান নয়, যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য-অনুসন্ধানের ফলে এর বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে,—

তাহলে বিবাহটা দাঁড়ায়, কিছুকাল একত্রে সহবাস করবার সামাজিক অনুমোদন মাত্র···

এবং তাতে নর-নারীর সম্পর্কের সমষ্টিগত দুঃখ ও বেদনাই গভীরতর, সূক্ষ্মতর, এবং ব্যাপকতরই হয়···

তখন বিবাহিত জীবন সমস্যা-সংকুল আর ভয়াবহ হয়ে উঠবেই···

তাই আজ আমেরিকায় বিবাহ-রোগের চিকিৎসার জন্যে পাড়ায় পাড়ায় ম্যারেজ-বুরো খোলা হচ্ছে···

আমাদের দেশেও হবে···তার লক্ষণ সুস্পষ্ট···

ঘটকের পরিবর্তে আসবে psychiatrist...

দরিদ্র দেশ...ঘটক বিদায়ের চেয়ে সাইকিঅ্যাট্রিস্টের দক্ষিণা ঢের বেশী দিতে হবে...

কথায় কথায় অন্য কথায় এসে পড়েছি...বয়স হচ্ছে, তার প্রমাণ...

যে কথা পরিশেষে তোমাকে বলতে চাই তা হলো,—

সাধারণ বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা দেখে তুমি এখনো পর্যন্ত একক জীবনের কণ্টকশয্যায় যে কষ্ট পাচ্ছো, এবার তার অবসান হোক...

ভীষণ প্রেমে-পড়ে যারা বিয়ে করেছে, একটি একটি করে পাত্রী নেড়ে-চেড়ে দেখে-শুনে যারা বিয়ে করেছে, তাদের মধ্যে অসংখ্য উদাহরণ আছে, যেখানে বছর ঘুরতে না ঘুরতে কর্পূরের মতন প্রেম উবে গিয়েছে...

আবার অভিভাবকদের কথায় চোখে কাপড় বেঁধে যারা শুভ-দৃষ্টির সময় প্রথম পাত্রীর মুখ দেখেছে, তাদের মধ্যে বহু উদাহরণ আছে, যেখানে বিয়ের পর প্রেম এসে সারা জীবনকে সার্থক করে গিয়েছে...

রোমান্টিক প্রেমের যত বয়স বাড়ে, ততই তা ক্ষীণ-আয়ু হয়ে আসে...মাঝরাতেই তার প্রদীপের সলতে পুড়ে যায়...

জীবনের সবটাই যৌবন নয়...অমোঘ অনিবার্য নিয়মে আসে বার্ধক্য...

"Marriage is the only bond which time can strengthen,"—

জীবনকে যিনি বহুভাবে দেখেছিলেন সেই ফরাসী ব্যালজাকের এই সিদ্ধান্ত...

শাস্ত্রের দোহাই দিলাম না, কারণ শাস্ত্রের বাজার-দর এখন পড়তির মুখে…

বিয়ের বাইরে যারা অবাধ দেহ-সম্ভোগের ভেতর দিয়ে নিত্য-রতি-সুখের উল্লাসকে খোঁজে, আজকের যুগের দুজন সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, Aldous Huxley আর Ernest Hemingway তাঁদের দুটি বিখ্যাত বই-এ তাদের চরিত্রকে নিখুঁতভাবে রূপ দিয়েছেন …দুটিই নারী-চরিত্র, একজন হলো Lady Brett আর একজন হলো Lucy Tantamount…দুজন লেখকই দেখিয়েছেন, জীবনের অপরাহ্ণে এই দুই নারীর জীবনের ভয়াবহ রিক্ততার বিষণ্ণতা…

কিন্তু বিবাহিত প্রেমকে সার্থক করতে হলে স্বামী ও স্ত্রী দুজনকেই সজ্ঞানে তার সাধনা করতে হবে…

বিবাহ প্রেমের পরিণতি নয়, বিবাহ হলো প্রেমের সূচনা…এবং এই প্রেম মানুষকে দুর্লভ আনন্দের অধিকারী করতে পারে…

তবে শাস্ত্রে যেমন বলেছে, সস্ত্রীকম্ ধর্মমাচরেৎ, স্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে ধর্ম আচরণ করবে,

তেমনি কাম-শাস্ত্রের শাস্ত্রকারেরাও বলেন, স্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে কাম-শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করবে…

তবেই Browning-এর মতন বৃদ্ধ বয়সেও বলতে পারবে,

"Ah love ! Grow old with me,
The best is yet to be…"

সর্বশেষে এই যুগল-প্রেমের একটা পুরানো কবিতা তোমাকে শোনাচ্ছি…প্রাচীন চীনের এক বিদুষী কবি, ম্যাদাম কুয়ান্ এই কবিতাটি তাঁর স্বামীকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন,…

"হাতে তুলে নাও
এক তাল মাটি…
জল দিয়ে তাকে ভাল করে ভিজিয়ে রাখ,
একটি একটি করে কাঁকর বাদ দিয়ে তাকে নরম কর,

তারপর সেই মাটির তাল দিয়ে দুটো পুতুল তৈরি কর,
একটা হবে তোমার মূর্তি,
আর একটা হবে আমার মূর্তি···
তারপরে দুটো পুতুলকেই ভাঙো,
ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো কর,
আবার তাতে জল দিয়ে
একসঙ্গে মিশিয়ে নরম করে
একটা কাদার তাল কর,—
সেই কাদার তাল দিয়ে
আবার দুটো পুতুল তৈরি কর,
একটা হবে তোমার মূর্তি
আর একটা হবে আমার মূর্তি···
তখন আমার মূর্তির পুতুলের কাদার সঙ্গে
মিশিয়ে থাকবে তোমার মূর্তির কাদার খানিকটা,
তোমার মূর্তির কাদার সঙ্গেও মিশিয়ে থাকবে
আমার মূর্তির কাদার অনেকখানি···
আর কেউ আমাদের আলাদা করতে পারবে না···
তোমার মধ্যে আমি থাকবো মিশিয়ে,
আমার মধ্যে তুমিও থাকবে মিশে,
মৃত্যু এলে, একই মাটিতে দুজনে
যাবো মিলিয়ে···

এই ছোট কবিতার মধ্যে বিবাহিত প্রেমের এক-লাইব্রেরি-ভরা সাইকলজির বই-এর সমস্ত তত্ত্বকথা লুকিয়ে আছে···

তোমার বিয়ের দিনে এই কবিতাটা ছাপিয়ে তোমাদের দুজনকে উপহার দেবো···

বিয়ের নিমন্ত্রণের আশায় অপেক্ষা করে রইলাম···

———

বাঙালীর মন
এখনো সবুজ আছে !

সবাই বলে, বাঙলা দেশের আজ বড় দুর্গতি···

প্রথম প্রথম কথাটা বাঙালীর আত্মম্ভরিতায় লাগতো···বাঙালী রেগে প্রতিবাদ করতো···

কিন্তু ইদানীং বাঙালী নিজেও স্বীকার করে নিয়েছে, এদেশের মাটিতে মাটি কমে এসেছে, কাঁকরই বেড়ে চলেছে···

গাছের ফল ছোট হয়ে এসেছে···তাতে আর সে স্বাদ নেই··· টক হয়ে আসছে···

পুকুরের মাছ কমে এসেছে, যা মাছ আছে তাতে পেঁকো গন্ধ···

গোলাপ গাছ আছে কিন্তু তাতে গোলাপ আর ফোটে না··· যদিও বা ফোটে তাতে নেই গোলাপের গন্ধ···

যে দেশ দেড়শো বছর ধরে জীবনের দিকে দিকে দিকপালদের সৃষ্টি করে গিয়েছে, আজ সে দেশে মহড়া আগলাতে পারে এমন একটা মানুষকে খুঁজে বার করতে হয়···

অতিকায়দের জায়গায় লিলিপুটরা ঘুরে বেড়াচ্ছে···

বাঙলার দেহ চুপসে আধখানা হয়ে গিয়েছে, জরাগ্রস্তের দেহের মতন···

বাঙালীর মনেও কি জরা ধরেছে ?

দেশ যখন পরাধীন ছিল, বাঙলা তখন বেঁচে ছিল…
দেশ যখন স্বাধীন হলো, বাঙলা মরে যাবে ?

দেশের ভালো-মন্দ যাঁরা অঙ্ক কষে বার করেন, তাঁরা বলছেন, এ আশঙ্কা মিথ্যা !

স্বাধীন ভারতের অন্য প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাঙলাও এগিয়ে চলেছে…

তার মাথাপিছু লোকের আয় বেড়েছে…আয়ু বেড়েছে…

তার জঙ্গল কেটে নতুন শহর গড়ে উঠছে…শহরে শহরে নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠছে…দূরতম গাঁয়েও বিদ্যুৎ-শক্তি রণ-পা ফেলে এগিয়ে চলেছে…

ধাপার পচা মাঠে, সুন্দরবনের জঙ্গলে, ময়লা-ফেলা লোনা হ্রদের ধারে বাঙলার তরুণতম প্রাচীন প্রধানমন্ত্রী নব-নব নগরীর পত্তনের জন্যে বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন…তাঁদের আমন্ত্রণ করে বাঙলায় নিয়ে আসছেন…নব-সমৃদ্ধির নকশা তৈরী হচ্ছে…

কোথায় বাঙালীর জরার লক্ষণ ?

কিন্তু আমি সে-জরার কথা বলছি না…

প্রত্যেক জাতকে যান্ত্রিক যুগের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে…

ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম…

ইওরোপ বহুদিন হলো সেই পথে এগিয়ে আছে…

পরাধীন থাকার দরুন ভারতবর্ষে আমরা বিংশ-শতাব্দীতে বাস করলেও যন্ত্রহীন মধ্যযুগে পড়ে ছিলাম···

স্বাধীন ভারত আজ সেই ত্রুটিকে সংশোধন করবার দ্রুত চেষ্টা করছে···

যার ফলে মাথাপিছু ভারতবাসীর বার্ষিক আয়ের অঙ্ক বাড়ছে, অশিক্ষার হার কমে আসছে···

দূরতম গ্রামে গিয়েও শোনা যায় রেডিও বাজছে···

ভারতের অঙ্গ হিসাবে বাঙলা দেশও এই যান্ত্রিক উন্নতির অংশ পাচ্ছে ও পাবে···

আমার প্রশ্ন সেখানে নয়···

যতই আমরা এক-মানব-জাতি আর এক-পৃথিবীর কথা বলি না কেন, প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের একটা বিশেষ স্বতন্ত্র রূপ আছে···বিশ্বের আলোর উৎসবে তার নিজের-হাতে-জ্বালা একটা স্বতন্ত্র দীপ সে জ্বালিয়ে রাখতে চায়···সেইখানেই তার প্রাণ, তার মন, তার আনন্দ, তার সত্যিকারের আয়ু···

বহু নির্যাতন, বহু নিপীড়ন, বহু মারী আর মৃত্যুভয়ের ভেতর দিয়ে বাঙালী তার সেই স্বতন্ত্র দীপের শিখাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে···

সে-দীপ হলো তার কবিতা, তার গান, তার কাহিনী, তার সাহিত্য···

বাইরের সব আলো যখন নিবে নিবে এসেছে তখনও এই দীপের আলোটুকুকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে বা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে···

এইখানেই তার অস্তিত্বের পরিচয়, তার আয়ুর আনন্দ··· এইখানেই তার প্রাণের স্পন্দন···

সে চলছে, কি থেমে গিয়েছে, এইখানেই তার সঠিক সংবাদ পাওয়া যাবে···

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে এসে বাঙলা-সাহিত্য একটা বিরামের জায়গা পায়···

লিরিক কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাস-রচনায় সেদিনকার বাঙালী বিশ্বের দিকে চেয়ে খানিকটা যেন আত্মতৃপ্তির গৌরব অনুভব করে···

এর পর যদি থেমেও যাওয়া যায়, লজ্জার কিছু নেই···এইরকম একটা আত্মপ্রসাদ পেয়ে বসে···

কিন্তু এই জাতীয় বিরামের জায়গাগুলো হলো গতির সব চেয়ে বড় শত্রু···মনে হয়, এই তো পথের শেষ···

রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের পর আর কিছু নেই···এইখানেই রচনা কর তাঁদের মন্দির···প্রতিষ্ঠা কর তাঁদের বিগ্রহ···নিত্য কর তাঁদের স্তব···

যে-অর্বাচীনেরা বলে, এর পরেও আছে পথ, বহু পথ, বহু দূর পথ তাদের উলটো গাধায় চড়িয়ে রাস্তায় ছেড়ে দাও···

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর বিশ কি ত্রিশ বছরের মধ্যে কোন বাঙালী ঔপন্যাসিক উপন্যাস ও ছোটগল্প-রচনায় তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, একথা বিশ্বাস কোরো না···বিশ্বাস করলেও মুখে উচ্চারণ কোরো না···

কিন্তু আজকের বাঙলা-সাহিত্যে তা উচ্চারণ করে বলবার সময় এসেছে···

দুই প্রচণ্ড অতিকায় প্রতিভার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে আজকের বাঙালী কাহিনীকাররা বাঙলার কাহিনী-সাহিত্যকে তার বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে সগৌরবে নিয়ে চলেছেন···

স্কুলের ছাত্রদের মতন কে-বড় কে-ছোট এ আলোচনা আজকে অচল···অপ্রয়োজনীয়···

তারাশঙ্কর বা বনফুলের চেয়ে শরৎচন্দ্র বয়সে বড়, একথা

স্বীকার করতে ভাবতে হয় না কিন্তু উপন্যাস বা কাহিনী-রচনার ব্যাপারে কে ছোট, কে বড়, কে মেজো, একথা আজকে বলতে গেলে অনেকখানি ভেবে বলতে হয়…

তার প্রধান কারণ হলো, এইভাবে নম্বর দিয়ে সাহিত্যিকদের ছোট-বড় হিসাবে দাঁড় করানোর প্রথা আজ চলে গিয়েছে…

আজকের মানুষ সাহিত্যকে বিচার করে বিশ্বমানবের সমষ্টিগত মানসিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে…

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় উপন্যাস-রচনার বিষয় ও ভঙ্গী আলোচনা করলেই দেখা যাবে, এই মানসিক অভিজ্ঞতার ক্রমের তফাত…

আজকের মানুষ হলো বিশ্বের নাগরিক…বিশ্বের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার সে হলো direct উত্তরাধিকারী…সেখানে শৈশব ও যৌবন পেরিয়ে সাহিত্য আজ adulthood-এ প্রবেশ করছে…

আজকের সাহিত্য হলো মানুষের সেই adult মানসিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ…

অবশ্য ধরে নিতে হবে, প্রকাশ মানে সার্থক প্রকাশ…

সেখানে যদি দেখি আজকের বাঙলা উপন্যাস-রচয়িতারা এগিয়ে চলেছেন অর্থাৎ তাঁদের লেখায় বিশ্বের সমষ্টিগত মানসিক অভিজ্ঞতার সার্থক প্রকাশ ঘটছে, তাহলে নিশ্চয়ই বলতে হবে, তাঁরা শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের জগৎকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছেন…

এবং এই এগিয়ে-চলার জন্যে যে কৃতিত্ব সে কৃতিত্ব তাঁদের দিতেই হবে…

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাহিনী রচনা যে-মানসিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, আজকের বাঙালী কাহিনীকাররা সেই সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বাঙলার ছোটগল্প ও উপন্যাসকে নতুন দিগন্তের দিকে দুঃসাহসিক অভিযানে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন

…তাঁদের কলমে ভর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে বাঙলা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরবর্তী স্তর…

এখানে ভাল-মন্দের কথা নেই…ছোট-বড়র কথা নেই…

বিশ্বের সমষ্টিগত মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটা জাতের মন এগিয়ে চলেছে, তার সাহিত্যে মানুষের মনের নব নব দিগন্ত আবিষ্কৃত হচ্ছে…এইটেই সব চেয়ে বড় কথা…সব চেয়ে গৌরবের কথা…

সে গৌরব যাদের জন্যে তাদের জয়গান গাইতে হবে বইকি!

বাঙলা-সাহিত্যে আজ একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছে…

যা থেকে বোঝা যায় বাইরের সমস্ত দৈন্য ও রিক্ততা সত্ত্বেও বাঙালীর মন এখনও সবুজ আছে…

অন্নের দুর্ভিক্ষ আজও তার চিত্তের দুর্ভিক্ষ আনতে পারে নি…

বাঙালী তরুণ আজ জীবনের কর্ম হিসাবে বলিষ্ঠভাবে সাহিত্যকে গ্রহণ করেছে…

বঙ্কিমের যুগে যা সম্ভব হয় নি, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের যুগে যা সম্ভব হয় নি, আজ তা সম্ভব হয়েছে, বাঙালীর জাতীয় চেতনা আজ আত্মপ্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে…

অরণ্যে গুটিকতক মহীরুহের জায়গায় আজ সমগ্র অরণ্য জেগে উঠেছে…

কাল যার নাম ছিল অপরিচয়ে ঢাকা, আজ বিস্ময়ে দেখি সাহিত্যিক-সমাজে সে বরণীয় স্রষ্টার আসনে বসে…

যে পথে একদিন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের চৌঘুড়ি একা-একাই পথ জাগিয়ে চলেছিল, আজ সেই পথ চলমান পথিকে ভরে গিয়েছে—

বহু সাহিত্যিকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আজ বাঙলা-সাহিত্যের রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠেছে···

সামনে নব-অরুণোদয়···

এই যে উন্নতি, এটা শুধু সংখ্যার উন্নতি নয়···এটা হলো প্রাণবন্ত সাহিত্যের অনিবার্য দ্বিতীয় স্তর···যে স্তরে এসে জাতির চেতনা সৃষ্টির রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে ওঠে···বহু মানুষের অভিজ্ঞতার দানে যেখানে বিচিত্র নব নব রূপের প্রকাশ ঘটে···

···যেখানে প্রত্যেক মানুষই মনে করতে সাহস পায়, তাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব কাহিনী আছে, গুছিয়ে বলতে পারলে যা সাহিত্য হতে পারে···

এই স্তরের মূলমন্ত্র হলো, প্রত্যেক মানুষই, তা সে যে কাজই করুক না কেন, তার নিজস্ব একটা কাহিনী বলবার আছে···

কল্পনার দরজায় যাবার দরকার নেই, কারুর অভিজ্ঞতা ধার করবার দরকার নেই, পেছনের দিকে চাইবার কোন কারণ নেই, তার নিজস্ব জীবন-কর্ম ও অভিজ্ঞতার মধ্যেই আছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উপযোগী, অন্ততঃ একটি প্রাণবন্ত কাহিনী···

সেই কাহিনীটিকে সত্য রূপ দিতে পারলেই হয় সাহিত্য-সৃষ্টি···

বাঙলার কাহিনী-সাহিত্যে আজ তাই বহু নতুন নামের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে নব নব বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি···

যে লোক আদালতে কাজ করে, যে লোক কারা-প্রহরী, যে লোক কেরানী, যে লোক মজুর, যে লোক কারখানা চালায়, যে লোক ধর্ম নিয়ে থাকে, যে লোক অধর্মের ব্যবসা করে, যে লোক রাত জেগে পাহারা দেয়, যে লোক ছাত্রদের নিয়ে জীবন কাটায়, যে লোক হোটেল চালায়, প্রত্যেকের অভিজ্ঞতারই সমান সাহিত্য-মূল্য আছে

…এবং সত্যনিষ্ঠভাবে সেই সব অভিজ্ঞতাকে যখন রূপ দেওয়া হয়, তখনই বিচিত্র সৃষ্টির সমৃদ্ধি দেখা যায়…

আজ বাঙলার কাহিনী-সাহিত্যে সেই বিচিত্র সমৃদ্ধির যুগ শুরু হয়েছে…

এবং এই যুগের শেষে আসবে কাহিনী-সাহিত্যের তৃতীয় যুগ বা শেষতম যুগ…যখন এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার থলি খালি হয়ে যাবে অথবা পুনরাবৃত্তিতে প্রাণহীন হয়ে যাবে…

তখন সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যে সাহিত্যিককে নিজের ভদ্রাসন ছেড়ে গল্পের কাছে এগিয়ে যেতে হবে…

বিশ্বের পথে-প্রান্তরে প্রতিনিয়ত গল্পের ফুল ফুটছে, ঝরে যাচ্ছে…

সাহিত্যিককে যেতে হবে সেই ফুল-ফোটার সন্ধানে…

যেতে হবে রণক্ষেত্রে, যেতে হবে দূর দক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপে, যেতে হবে দেশে-বিদেশে, যেতে হবে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বের পথে-প্রান্তরে-অরণ্যে, শিকারীর মতন অরণ্য থেকে নিজে শিকার করে আনতে হবে সজীব গল্পের উপাদানকে…

সেদিন সাহিত্যিককে নব নব অভিযানে বেরুতে হবে গল্পের উৎস-মুখে…

সেদিন কাহিনীকারকে হতে হবে বিশ্বের পথে পরিব্রাজক…

ওদের দেশে কাহিনী-সাহিত্য আজ এইজাতীয় পরিব্রাজক-সাহিত্যিকদের দানে বিশ্ব-গ্রাহ্য হয়েছে…

একদিন বাঙলার কাহিনী-সাহিত্যও বিশ্ব-গ্রাহ্য হবে—

আজকের কাহিনীকাররা সেই অনাগত পরিব্রাজক-সাহিত্যিকদেরই পথ তৈরি করছেন…

———

আদিখ্যেতা

আদিখ্যেতা কাকে বলে কোন বাঙালীকে তা বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না···

আদিখ্যেতা করা বাঙালী-চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য···

তবুও একটা জ্যান্ত উদাহরণ, ঐতিহাসিক উদাহরণও বলা যায়, এখানে দিচ্ছি···

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্তরে সত্যিই একটা গভীর জীবপ্রেম ছিল, নইলে তিনি মহেশ লিখতে পারতেন না···

তাঁর সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমি দেখেছি, রাস্তার ধারে কোন বড়লোকের বাড়ি থেকে ছিকলি-বাঁধা কাকাতুয়া যদি চিৎকার করে উঠতো, তিনি থেমে যেতেন···কলকাতার পথের প্রচণ্ড ঘড়ঘড়ানির ভেতর থেকে সেই শব্দ বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর মনে গিয়ে বিঁধতো···ব্যথিত শুষ্ককণ্ঠে বলে উঠতেন, ছিকলি দিয়ে বেঁধে রেখেছে !

একবার আমি দেখেছি, অজানা বড়লোকের বাড়িতে ঢুকে পড়ে গৃহস্বামীকে ভর্ৎসনা করতে, আপনারা বড়লোক···শখ মেটাবার অনেক জিনিসই আপনাদের আছে···বনের পাখিকে আমরণ ছিকলিতে বেঁধে রাখার এ শখ কেন ?

এহেন শরৎচন্দ্রকে দেখেছি এবং আমার মতন তাঁর অনুগৃহীত অনেকেই দেখেছেন, কুকুর নিয়ে চরম আদিখ্যেতা করতে…

অপরের চরিত্রে আদিখ্যেতা দেখলে যিনি খেপে উঠতেন, তাঁর উপন্যাসে গল্পে বহু জায়গায় বহুভাবে ধর্মের আদিখ্যেতা, আচারের আদিখ্যেতাকে তীব্র কশাঘাত করে গিয়েছেন,…ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজে কিন্তু হাস্যকর আদিখ্যেতা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না…

আদিখ্যেতার মজাই তাই…যে করে সে বুঝতে পারে না…

আদিখ্যেতার মধ্যে যে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি থাকে, সেটা যে হাস্যকর যে আদিখ্যেতা করে সে তা বুঝতে পারে না!

যাকে আমরা নেড়ী কুকুর বলি, শরৎচন্দ্র সেই জাতীয় একটি কুকুর পুষেছিলেন। তার নাম ছিল ভেলি…

ভেলিকে তিনি ভালবাসতেন…এতে আপত্তি করবার কারুর কিছু ছিল না।

দামী বিলিতী কুকুর না পুষে তিনি রাস্তার অবজ্ঞাত একটা কুকুরকে পুষেছেন, সে তাঁর মহানুভবতা…

লোক দেখলেই ভেলি কামড়াবার জন্যে চিৎকার করে তেড়ে আসতো, তাতেও ক্ষুণ্ণ হবার কিছু ছিল না…অ্যালসেশিয়ান কুকুরও তো তা করে…!

কিন্তু…

বাজেশিবপুরে তাঁর পুরানো বাড়িতে শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধানিবেদন করবার জন্যে বহুদূর থেকে দুজন ভদ্রলোক এসেছেন…

শরৎচন্দ্র ভেতরে বিশ্রাম করছেন…ভদ্রলোকেরা আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন, কখন তিনি আসবেন…

ঘণ্টাখানেক পরে শরৎচন্দ্র এসে ইজিচেয়ারে বসলেন···মুখ গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট···

কি করে আলাপ আরম্ভ করবেন তা ঠিক করতে না পেরে ভদ্রলোক দুজন নার্ভাস হয়ে মাঝে মাঝে গলা থেকে নানারকম আওয়াজ বার করেন···

শরৎচন্দ্র স্থিরদৃষ্টি নির্বাক, দূরের দিকে চেয়ে যেন কোন্ মহা-ভাবনায় ডুবে গিয়েছেন···

ভদ্রলোক দুজন নীরবে চোখের ভাষায় বলাবলি করেন, নিশ্চয়ই কোন নতুন গল্পের প্লট ধ্যান করছেন···

গলার আওয়াজ করতেও আর তাঁরা সাহস পান না···

এমন সময় শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন, শুষ্ক বেদনার্ত কণ্ঠে, কাল সারারাত ঘুমোয় নি !

কে ঘুমোয় নি ? কেন ঘুমোয় নি ?

ভদ্রলোকেরা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পান না···

ঠিক তেমনি শুষ্ককণ্ঠে শরৎচন্দ্র বলেন, বোধহয় মশার জন্যে ঘুমোতে পারছে না মনে করে মাঝরাতে উঠে মশারি ফেলে দিলাম···কিন্তু মশারির ভেতর শুয়েও আরও ছটফট করতে লাগলো···

ভদ্রলোক ক্ষীণ ভীত কণ্ঠে এবার বললেন, কারুর বুঝি অসুখ করেছে ?

—অসুখ···হাঁ···মানে···পেট গরম হয়েছিল···খানকতক পরোটা খেয়েছিল···ঘি-টা বোধহয় ভাল ছিল না।

ভদ্রলোক দুজন হাঁ করে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন··· এতগুলো ক্রিয়াপদ, তার কর্তা কোথায় ?

কে সারারাত ঘুমোয় নি ?

কার জন্যে বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিককে মাঝরাতে উঠে মশারি ফেলতে হয়েছে ?

খারাপ ঘি-এর পরোটা খেয়ে কার পেট গরম হয়েছিল, যার জন্যে শরৎচন্দ্র এখনও দুশ্চিন্তায় ডুবে আছেন ?

তিনি এলেন সব-শেষে···

ভদ্রলোক-দুজনের দিকে চেয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, ভেলির জন্যে যে কি দুর্ভাবনায় পড়ি মাঝে মাঝে··· !

এটা ভেলিকে ভালবাসা নয়···ভেলিকে নিয়ে আদিখ্যেতা···

এবং সে-সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ভেলিকে নিয়ে তাঁর এই জাতীয় আদিখ্যেতা বহুলোককে শুনতে হয়েছে···

আর একটা উদাহরণ দি···

এক বৈষ্ণব শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন···

পরনে পুজো করবার জন্যে মটকার কাপড়···খালি গা···গলায় তুলসীর মালা শরৎচন্দ্র বাইরে এসে বসলেন···

সঙ্গে সঙ্গে ভেলি এসে বৈষ্ণব-ঠাকুরটিকে দেখে আমন্ত্রণ করে উঠলো, গ্-র্-র্-র্···

ভেলিকে শান্ত করবার জন্যে শরৎচন্দ্র তার কাছে বসে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন···গলার তুলসীর মালা ভেলির নাকের কাছে ঝুলতে থাকে···ভেলি লোভ সংবরণ করতে পারে না···দীর্ঘ জিহ্বা বার করে সে তুলসী-মালার স্বাদ গ্রহণ করতে থাকে···

বৈষ্ণব আর্তনাদ করে ওঠেন···

শরৎচন্দ্র হেসে তাঁর দিকে চেয়ে বলেন, আপনাদের জীবপ্রেম বুঝি কুকুর পর্যন্ত পৌঁছয় না।

এটা জীবপ্রেমের পরিচয় নয়···এটা জীবপ্রেম নিয়ে আদিখ্যেতা···

ভেলিকে নিয়ে তাঁর এই আদিখ্যেতা সম্পর্কে আরও উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু তার প্রয়োজন নেই···

বই লিখতে গিয়ে যাঁর স্টাইলে বিন্দুমাত্র অতিরিক্ততা ছিল না, ব্যক্তিগত জীবনে সে-হেন শরৎচন্দ্র কুকুর নিয়ে এই হাস্যকর আদিখ্যেতা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না।···

শরৎচন্দ্র তাঁর ভেলিকে নিয়ে যে আদিখ্যেতা করতেন, বাঙলার ঘরে ঘরে শিশু ও বালকদের নিয়ে সেই জাতীয় আদিখ্যেতা আমরা জাতিগতভাবে অনাদিকাল থেকে করে আসছি এবং আজও করি· ·

সৌভাগ্যবানদের ঘরে চাঁদ-চাওয়া ছেলের আদরের মাত্রা আরও বেশী···

হয় রক্তচক্ষু নয় আদিখ্যেতা, এই দুই অতিরিক্ততার মধ্যে বেশির ভাগ বাঙালী ছেলে ছোট থেকে বড় হয়, তাই তারা বয়সে বড় হলেও মনের গড়নের দিক থেকে নাবালকই থেকে যায়···

আমাদের পারিবারিক জীবনে শিশুপালন নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে নানারকমের আদিখ্যেতা আছে কিন্তু সে সব আ: :খ্যতার কথা এখানে আমার বক্তব্য নয়···

পারিবারিক জীবনের বাইরে এই আদিখ্যেতা আমাদের সামাজিক জীবনে, আমাদের জাতীয় জীবনে, আমাদের জীবনের নানা কর্মে ও চিন্তায় এমন সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে যে তার হাস্যকরতা, তার বিসদৃশতা আজ আমরা অনুভবই করতে পারি না···

বাঙালী-চরিত্রে যে দৃঢ়তার অভাব, ়য balance-এর অভাব তার মূলে অনেকখানি আছে এই আদিখ্যেতার প্রভাব···

তাই দুঃখ পেলে আমরা সহজে ভিখিরী হয়ে যাই···প্রশংসা

করতে গিয়ে আমরা balance হারিয়ে অতিরিক্ততার ভাঁড়ামি করি …মতের অমিল জানাতে গিয়ে অনায়াসে কুৎসা করি…মিল হলে উচ্ছ্বাসের ধোঁয়ায় বক্তব্যকে হারিয়ে ফেলি…অতিরিক্ত এবং অযথা ব্যবহারে আমাদের ভাষায় "সর্বশ্রেষ্ঠ" কথাটার কোন ভার বা ধার নেই…

চরম দুঃখের বিষয়, এই অকারণ অতিরিক্ততার আদিখ্যেতা অশিক্ষিতদের মধ্যে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনি দেখা যায় আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে…হয়ত শিক্ষিতদের মধ্যে বেশী দেখা যায়…

আমাদের জাতীয় জীবনে এই আদিখ্যেতার সব চেয়ে লজ্জাকর প্রকাশ ঘটে কৃতী-পুরুষদের বন্দনায়…

জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রে কেউ যদি কৃতী হন, তাঁর দেবতা হতে অথবা ঋষি হতে অথবা কর্মযোগী হতে বিশেষ কিছুই আর লাগে না শুধু সময় বুঝে তাঁকে মরতে হয়…মরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেবত্ব বা ঋষিত্ব পেয়ে যান…

ভাল লণ্ঠন তৈরি করেও আমাদের দেশে লোকে দেবতা বা ঋষি হয়ে যেতে পারেন…

এবং তখন তাঁর জীবন-চরিত পড়ে স্পষ্ট জানা যায় যে মাতৃ-গর্ভ থেকেই তিনি তাঁর সেই বিশেষ লণ্ঠনটি হাতে নিয়েই জন্মেছিলেন…

তাই আমাদের ভাষায় বহু ঋষির, বহু মহাপুরুষের, বহু অবতারের জীবন-কাহিনী আছে, একটিও সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষের জীবনচরিত নেই…

কৃতী-পুরুষদের নিয়ে এই নির্লজ্জ আদিখ্যেতার ফলে আমাদের ইতিহাস আজও রচিত হতে পারলো না…

দূর ইতিহাসের কথা বাদ দিলেও, যে সমসাময়িক ইতিহাসের সন্তান আমরা, তার কথাও আমরা জানি না…

আমরা রামমোহনের বন্দনা করি, কিন্তু আসল রামমোহনকে জানি না…

আমরা নিয়মিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতিথি পালন করি, কিন্তু তাঁকে চিনি না—

এক বছর ধরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্মৃতিপূজার চরম আদিখ্যেতা করলুম…আজও করছি…কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কোথায় ?

এই আতিশয্যের আদিখ্যেতায় আমরা নেতাজীকে নিয়ে যতখানি উচ্ছ্বাস দেখিয়েছি এবং এখনো দেখাই, তার একটা কণাও যদি আজকের বাঙালীর জীবনে সত্য হয়ে উঠতে পারতো !

এই আতিশয্যের আদিখ্যেতায় ব্যথিত হয়েই একদিন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, রেলগাড়ির সব steam যদি গাড়ির whistle দিতে ফুরিয়ে যায়, চাকা চলবে কিসে ?

এই আদিখ্যেতার একটা মারাত্মক দিক আছে…

যে জাত তার কৃতী পুরুষদের সম্মান করতে জানে না, সে জাত ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য নয়…

কিন্তু প্রশংসা করা বা সম্মান দেখানোর একটা dose বা মাত্রা আছে যার মধ্যে তা স্বাস্থ্যকর, আনন্দদায়ক, উৎসাহবর্ধক…কিন্তু সেই মাত্রা ছাড়িয়ে যখন আদিখ্যেতা করি, তখন সেই স্বাস্থ্যকর বস্তু হয়ে ওঠে বিষ…

অনেক ওষুধ আছে যার মাত্রা অতিরিক্ত করলে ওষুধ বিষে

পরিণত হয়···আইন-অনুসারে তখন সেই ওষুধের শিশির গায়ে লিখতে হয়, বিষ···

কৃতী ব্যক্তিকে প্রশংসা করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় এমন আতিশয্যের আদিখ্যেতা করি যে সেই প্রশংসার চাপে পড়ে প্রশংসনীয় ব্যক্তি মারা পড়বার দাখিল হয়···

সম্প্রতিকালে ঠিক এইরকম একটা প্রশংসার আদিখ্যেতা চলেছে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে···

সত্যজিৎ রায় প্রতিভাবান্ ছবির ডিরেক্টর, ছবির প্রযোজনায় তিনি স্বতন্ত্র এবং স্বকীয় একটা নতুন ভাষা ও ভঙ্গী প্রবর্তন করবার চেষ্টা করছেন···তাঁর একটি ছবি আমেরিকায় বহু সপ্তাহ ধরে সগৌরবে চলেছে, এর আগে আর কোন ভারতীয় ছবি সে গৌরব পায় নি···

কিন্তু একশ্রেণীর সমালোচক এই উদীয়মান প্রতিভার যে-জাতীয় প্রশংসা শুরু করেছেন, তাতে তাঁর পরবর্তী ছবি সম্বন্ধে আর কোন বিশেষণই সমালোচকেরা খুঁজে পাবেন না···অমরতা থেকে অপার বিস্ময় পর্যন্ত বাঙলা-ভাষায় যত ধোঁয়াটে শব্দ ছিল সবই তাঁরা ব্যবহার করে ফেলেছেন···

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অতন্দ্র ও বহুমুখী সাধনায় চার্লি চাপলিন বিশ্বের লোকের অযাচিত স্বীকৃতিতে আজ এই শিল্পের সর্বোচ্চ-শিখরে স্থান পেয়েছেন···

তিন-চারখানা ছবির প্রযোজনা করতে না করতেই আমাদের সমালোচকেরা সত্যজিৎ রায়কে চার্লির সেই উত্তুঙ্গ শিখরে বসিয়ে দিয়েছেন···

বন্ধু, বড় দুর্গম শিল্পের সর্বোচ্চ শিখর···এত অনায়াসে সেখানে কাউকে তুলো না!

একথা কখনো প্রচার কোরো না, মই দিয়ে এভারেস্টে ওঠা যায়···

হয়ত তুমি জান, সত্যি সত্যি মই দিয়ে কোন জন এভারেস্টে উঠেছে, তবুও সেকথা প্রচার কোরো না…

মানুষের মন বড় দুর্বল…দেখবে তখন দলে দলে লোক চলেছে মই কাঁধে এভারেস্টের দিকে…তারা কেউ আর ফিরে আসবে না… এ সব অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যুর জন্যে তখন ইতিহাস তোমার দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলে দেখাবে…

যত বড়ই প্রতিভা হোক, তোমার কলমকে তাঁর পায়ের ওপর অঞ্জলি দিয়ো না…

একটা জাতির শিল্পবোধকে আদিখ্যেতার উচ্ছ্বাসে ছোট কোরো না…

প্রতিভার সন্ধান যদি পেয়ে থাকো, সুকঠোর সমালোচনার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার প্রতিভাকে সদা-জাগ্রত করে রাখবার প্রেরণা দাও…

আদিখ্যেতার বালিশ তার মাথার তলায় গুঁজে দিয়ো না… ঘুমিয়ে পড়বে…এইভাবে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে…

এই আদিখ্যেতার ভাব আজ আমাদের সমাজ-জীবনে নানাভাবে নানাদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে আমাদের জাতীয় চরিত্র দানা বাঁধতে পারছে না…

আলগা পাকের দড়ি একটুতেই খুলে খুলে যাচ্ছে…

আমার অসুবিধে হবে বলে, আমি রেল-এঞ্জিনের সামনে শুয়ে সমস্ত রেল-চলাচলের systemকে বন্ধ করে দেবো…

ঘোড়ার গাড়ি চালকের নির্দেশে চলবে না…চলবে ঘোড়ার খামখেয়ালিতে…

স্কুল-কলেজকে চলতে হবে ছাত্রদের নির্দেশে…

সেদিন আসছে যেদিন আমাদের দেশের ছাত্ররা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিক্ষা-সংস্কারের জন্যে প্রস্তাব করবে, আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আমরাই তৈরি করবো ! নতুবা···জান্ দেগা !

ইতিহাস বলে, কোন জাত দারিদ্র্য বা অভাবে মরে যায় না··· মরে যায় আদিখ্যেতায়···

না খেয়ে যত লোক মরে, তার চেয়ে ঢের বেশী লোক মরে খাওয়ার আতিশয্যে···

ওদের দেশের ছেলেরা চাঁদে গিয়ে পৌঁছবে···

আমাদের দেশের ছেলেরা ঠাকুমা-ঠাকুরদার কোলে বসে শুনবে, আয় চাঁদ, আয় চাঁদ, জাদুর কপালে টিপ দিয়ে যা !

শেলাই বু-রুগ্

বহু মাসের বহু বছরের চেষ্টার পর ব্রজেনদা বিরাট সাহিত্য-পরিষদ লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা তৈরি করে ছাপালেন···

এ পরিশ্রম, এ ধৈর্য তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল···

সাহিত্য পরিষদে গিয়ে যাঁদের গবেষণা করতে হতো, এই ছাপানো ক্যাট্যালগ পেয়ে তাঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন···

ক্যাট্যালগ-হীন লাইব্রেরি পথহীন অরণ্যের মতন···

যাঁরা শুধু নভেল পড়বার জন্যে লাইব্রেরিতে যান, তাঁদের কাছে ক্যাট্যালগের কোন দাম নেই, কিন্তু যাঁদের সত্যিকারের পড়াশোনা করতে হয় ক্যাট্যালগ হলো তাঁদের সব চেয়ে বড় সহায়···

আর এই ক্যাট্যালগ যাঁরা তৈরি করেন, সাধারণের কাছ থেকে কোনই স্বীকৃতি তাঁরা পান না···

বড় বড় লাইব্রেরির ক্যাট্যালগ যাঁরা তৈরি করে গিয়েছেন, তাঁদের নাম সাধারণের কেউ জানে না পর্যন্ত, কিন্তু এই সব ক্যাট্যালগের পেছনে বহু প্রতিভাধর ভাষাবিদ্ ও পণ্ডিতদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে···

আজকের ন্যাশানাল লাইব্রেরির নতুন ধরনের card catalogue তৈরী হয়েছে বটে কিন্তু তার প্রথম অবস্থায় নানা ভাষার নানা পুঁথি ও বই-এর সেই বিরাট সংগ্রহকে ক্যাট্যালগে সুনির্দিষ্ট করে রাখবার জন্যে হরিনাথ দে-র মতন বিস্ময়কর পণ্ডিত ও ভাষাবিদের প্রয়োজন হয়েছিল···

তিরিশটা ভাষায় যাঁর অনায়াস অধিকার ছিল, সেই হরিনাথ দে-র বিস্ময়কর প্রতিভার একমাত্র নিদর্শন পড়ে আছে সেই ক্যাট্যালগের মধ্যে···এবং এ সংবাদও খুব অল্পসংখ্যক লোকেরই জানা আছে···

ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কীর্তির কথাও একদিন লোকে বিস্মৃত হয়ে যাবে···

তাঁর ক্যাট্যালগ থেকে যাঁরা উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের একজন হিসাবে এখানে তাঁর নামোল্লেখ করে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলাম···

শুনেছিলাম, এই ক্যাট্যালগের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে···কিন্তু উৎসাহদাতা সজনীকান্তও নেই, ব্রজেনদাও নেই···

দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে হয়ত বহুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে···

বই যেমন পড়তে হয়, বই-এর ক্যাট্যালগও তেমনি পড়তে হয়···

অন্ততঃ আমাকে পড়তে হতো এবং এখনও পড়তে হয়···

একদিন এই ক্যাট্যালগ পড়তে পড়তে হঠাৎ এক বিচিত্র অনুভূতি আমার মনে জেগে ওঠে···

সেদিন হঠাৎ নজরে পড়লো, ক্যাট্যালগে বহু গল্পলেখক ও বহু সাহিত্যিকের নাম রয়েছে, কেউ একশোখানা বই লিখেছেন, কেউ পঞ্চাশ, কেউ ত্রিশ···সে সব সাহিত্যিক আজ কোথায়? তাঁদের লেখা সেই সব বই আজ কোথায়? অথচ মাত্র ত্রিশ কি চল্লিশ বছর আগে সেই সব বই ও লেখক জনপ্রিয় ছিলেন!

ক্যাট্যালগে উল্লিখিত সেই শত-সহস্র বই-এর মধ্যে কখানা বই আজ পুনর্মুদ্রিত হতে পারে?

সেই সঙ্গে মনে পড়লো, আজ বাঙলা সাহিত্যে প্রতিদিন

নতুন নতুন লেখক আবির্ভূত হচ্ছেন···চায়ের দোকানের মতন বই-এর দোকাম বেড়ে চলেছে এবং প্রত্যেক দোকান থেকে চমকপ্রদ সব গল্প, উপন্যাস ও রম্যরচনা প্রকাশিত হচ্ছে···জনপ্রিয়তার দিক থেকে মাসে মাসে বহু বই-এর সংস্করণ হচ্ছে···প্রকাশকেরা প্রত্যেক বই-এর বিজ্ঞাপনে লিখছেন, রসোত্তীর্ণ অবিস্মরণীয় সৃষ্টি!

মনে প্রশ্ন জাগলো, ত্রিশ বছর পরে, কি পঞ্চাশ বছর পরে, এই অসংখ্য অবিস্মরণীয় সৃষ্টির মধ্যে কখানা বই সেই নিকট ভবিষ্যতের পাঠকের হাতে পৌঁছবে?

এই অসংখ্য 'রসোত্তীর্ণ' কাহিনীর মধ্যে কটা কাহিনী "কালোত্তীর্ণ" হবে?

সেদিন সাহিত্য-পরিষদের ক্যাট্যালগে বিস্মৃত-স্মৃতি সাহিত্যিকদের নামের তালিকা দেখতে দেখতে মনে এক ছবি জেগে উঠলো···

পঞ্চাশ বছর পরে আর এক ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় এসে এই ক্যাট্যালগের দ্বিতীয় খণ্ড তৈরি করেছেন···আমারই মতন আর এক পাঠক সেদিনকার সেই ক্যাট্যালগে আজকের প্রোগ্রেসিভ লেখকদের নামের দীর্ঘ তালিকা দেখছেন আর বিস্ময়ে ভাবছেন, এঁদের বই পুনর্মুদ্রিত হয় না কেন?

কোন্ বই কালোত্তীর্ণ হয়ে থাকবে, কোন্ বই বা কপিরাইট-আয়ু শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলৎশক্তিহীন হয়ে লাইব্রেরির থাকে হারিয়ে যাবে, আজ তা অনুমান করা চরম দুঃসাহসিকতার কাজ···

প্রত্যেক লেখকের মনে কালজয়ী হয়ে বেঁচে থাকবার একটা সংগোপন দুরাশা বা আশা থাকে, সে আশা যদি সফল না-ই হয়, কি যায় আসে?

সমসাময়িক মনকে হর্ষ-বেদনায় দুলিয়ে আমার সৃষ্টি যদি একদিন অকস্মাৎ কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়, অনুতাপ করবার কি আছে?

আকাশে সূর্য আছে বলে আমার একটি-রাতের সন্ধ্যা-প্রদীপের আলোর শিখার প্রয়োজনীয়তা কি কিছু কম?

আজ তাঁর নাম মনে পড়ছে না, একজন বড় লেখকের লেখায় পড়েছিলাম, যে পাখি সুকণ্ঠ যদি তারই একমাত্র অধিকার থাকতো অরণ্যে গাইবার, তাহলে অরণ্য নিস্তব্ধ হয়েই থাকতো…

বাক্‌দেবীর বিরাট অঙ্গন খালি পড়ে থাকতো যদি সেখানে শুধু কালিদাস আর সেক্‌স্‌পীয়ারদের প্রবেশাধিকার থাকতো…

যে সৃষ্টির ফুল আজ সকালে ফুটে আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝরে হারিয়ে গেল, কে বলতে পারে তার ফোটা ব্যর্থ হয়েছে?

ক্ষীণ-আয়ু মানুষ অমরত্বের লোভে সাময়িকতার মূল্য দিতে ভুলে যায়, ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানতাকে অতি-তুচ্ছ করে…অমরত্বের নেশায় ভুলে যায় বর্তমান ছাড়া আর কোন কালে তার অস্তিত্ব নেই…

ভুলে যায়, বর্তমানের একটা প্রকাণ্ড চাহিদা আছে, যে চাহিদা না মিটোলে গতির ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়…তাই সাময়িকতার ক্ষুধা যারা মিটোয়, তারাও মহাকালের সেবা করে এবং দীর্ঘায়ু না হলেও তাদের সেবার মূল্য কম নয়…

ভবিষ্যৎকে তারা হয়ত আনন্দ দিতে পারবে না…কিন্তু বর্তমানকে আনন্দ দেওয়া কম দুরূহ ব্রত নয়…রীতিমত তা সাধন-সাপেক্ষ…

প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে ঋষি দুর্বাসার মতন বর্তমান প্রত্যক্ষ সামনে দাঁড়িয়ে আছে…সে ফিরে যাবে না…বিলম্ব তার সয় না…ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করা চলে না…তার দাবি মেটাতে গিয়ে যদি ভবিষ্যতের ভাঁড়ার ভেঙে যায়, নিরুপায়!

এই নিরুপায়তা দৈন্যের ব্যাপার নয়, এই নিরুপায়তা হলো চরম ট্রাজেডি, যে ট্রাজেডি মানুষের মনকে সকরুণ করে তোলে…

নজরুল তখনও অসুস্থ হয়ে মূক হয়ে যায় নি…তখনও সে সমানে

কবিতা ও গান লিখে চলেছে···সেই সময় একদল সহযাত্রী লেখক হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে নজরুলের লেখার মধ্যে কাল-জয়ের লক্ষণ নেই, সে লেখা সাময়িকী···শুধু বর্তমানের জন্যে···কবিতার মধ্যে তিনি পলিটিক্স্ ঢুকিয়ে কবিতার ধর্মহানি করেছেন···আজকের মানুষকে তা নন্দিত ও উত্তেজিত করছে বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনার মতন অনাগতকালের হৃদয়-হরণ করবার মতন কোন উপাদান তাতে নেই··· তাই নজরুলকে নিয়ে যাঁরা বাড়াবাড়ি করছেন তাঁরা অন্যায় করছেন, ভুল করছেন ইত্যাদি···

ব্যথিত হয়ে নজরুল সেদিন তার এই সমালোচক বন্ধুদের আক্রমণের উত্তরে একটা কবিতা লিখেছিল···বাঙলার সমসাময়িক সাহিত্যে এক অপূর্ব রচনা···আমার কৈফিয়ত নামে সে কবিতা মুদ্রিত হয়···

তাতে কোন প্রতি-আক্রমণ নেই, আত্মপক্ষ-সমর্থনের ক্ষীণতম চেষ্টা নেই···কারুর প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই···

তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সে যদি প্রত্যক্ষ কালের সেবা করে থাকে, তার মধ্যে কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই···তার নির্দিষ্ট কাজ তার শক্তি অনুযায়ী সে করে গিয়েছে এবং তাতে কোন আন্তরিকতার অভাব ঘটে নি···তাই সে বলেছে,

বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই নবি
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঁজে
তাই সই সবি!
কেহ বলে, তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে!
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে
বাণী কই কবি?
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু
প্রভাতের ভৈরবী!

চিরকালের বাণী যাঁর বীণাযন্ত্রে বেজে উঠলো, তিনি ধন্য···কিন্তু আজকের একটি প্রভাতের ভৈরবী যার বীণাযন্ত্রে বেজে উঠলো, সেও কম ধন্য নয়! তাই নজরুল অকুণ্ঠ চিত্তে বলেছিল,

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি
যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি,
রয়েছে সোনার শত ছেলে।

গোলাপ ফুল নারকেলের মতন শাঁসালো হলো না, কিংবা নারকেলের জলে কেন গোলাপের সুবাস হলো না,—এ আক্ষেপ করে কোন লাভ নেই, প্রকৃতির রাজ্যে গোলাপ ফুল ও নারকেলের পৃথক আবেদন থাকবেই···

আর, বস্তুর জগতে হোক বা রসের ক্ষেত্রে হোক এই আবেদনের পৃথকত্ব আছে বলেই বিরাটের দেহ ভরাট হয়ে আছে···

সমগ্রতার মধ্যে প্রত্যেকেরই স্থান আছে···শুধু সেনাপতিকে নিয়ে যুদ্ধ হয় না, যুদ্ধের ক্ষেত্রে সেনাপতি ও সৈনিক দুজনেই সমান প্রয়োজনীয়···

বর্তমানের কবি আর চিরকালের কবি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়েই আছে···

তাই নজরুল অভিমান করে বলেছিল,

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না,
বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি,
তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

মাইকেল প্রার্থনা করেছিলেন, রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে···

নজরুল বলেছে,

প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায়
তাদের সর্বনাশ।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা রসের ক্ষেত্রে তখুনি বিভ্রাট ঘটে যখন দেখি, এ-র চেয়ারে ও বসবার চেষ্টা করছে···যে তবলা বাজানো শিখলো, সে চেষ্টা করছে সারেঙ্গীওলা হতে···যার করতাল বাজাবার কথা, সে এসে বসেছে গায়কের আসনে···যার গান গাইবার কথা, সে লেগে গিয়েছে আসর সাজাতে···

রসের ব্যাঘাত তখুনি ঘটে যখন মুচিতে মন্ত্র পড়ে· আর পুরোহিত রাস্তা দিয়ে হেঁকে চলে, শেলাই বু···রুশ্ !

———

"খোলা আছে দ্বার যাওয়ার আসার"

একটা ঘর…দুটো দরজা…

একটা দরজা দিয়ে মানুষ ঘরে ঢোকে…আর একটা দরজা দিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে হয়…

যে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়, সে দরজার বাইরে কি আছে, ঘরে ঢুকে তা জানবার আর কোন উপায় নেই…

আবার যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়, বেরিয়ে যেতেই হবে এই নিয়ম…যে বেরিয়ে গেল বেরিয়ে সে কোথায় গেল তাও জানবার কোন উপায় নেই…

একটা দরজা হলো জন্ম…আর একটা দরজা হলো মৃত্যু…

চিরকাল-খোলা অর্গলহীন এই দুই দরজাকে নিয়ে মানুষের সব ধর্মতত্ত্ব, সব দার্শনিক চিন্তা…

কিন্তু এই নিয়ে কোন দার্শনিক আলোচনা এখানে করতে চাই না, করবার যোগ্যতাও আমার নেই…

তবে এই ঘরের বাসিন্দা হিসাবে দরজা দুটো বারে বারে চোখে পড়ে…কার না পড়ে ?

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে হঠাৎ চোখে পড়ে, একেবারে মাথার শিয়রে দেয়াল-জোড়া এই খোলা দরজা…এই দরজা দিয়েই

আমাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে। মনের মধ্যে আপনা থেকে কে জিজ্ঞাসা করে ওঠে, কোথায় যাবো? কোথা থেকেই বা এসেছিলাম? যেখান থেকে এসেছি, সেখানকার কোন স্মৃতি, কোন চিহ্ন মনের কোথাও কি পড়ে নেই? যেখানে যাবো, এখানকার কোন স্মৃতি কি সেখানে নিয়ে যেতে পারবো না?

এই ক্ষণ-অস্তিত্ব, এর পূর্বাপর কিছু নেই?

জীবাণুর বুদ্বুদের তবে কেন অমৃতত্বের আকাঙ্ক্ষা?

কোটি কোটি লোক নিত্য যাওয়া-আসা করে···কিন্তু তাদের কোন চিহ্ন পড়ে থাকে না···

কিন্তু এই অসংখ্য চিহ্নহীনদের মধ্যে মাঝে মাঝে দু'চারজন আসেন, যাঁরা চিহ্ন রেখে যান···

তাঁদের জন্ম, তাঁদের মৃত্যু ইতিহাসের খাতায় লেখা থাকে—

এই বিচিত্র জন্ম-মৃত্যুর খাতাটা উলটিয়ে পালটিয়ে দেখি···

উত্তর কিছু পাওয়া যায় না—

কিন্তু সেই সব জন্ম আর মৃত্যুর বিচিত্র লগ্নের ভেতর থেকে একটা অব্যক্ত কথা, অর্ধ-উচ্চারিত ইঙ্গিতের মতন যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে···

ভাবতে ভাল লাগে, জন্ম-মৃত্যুর সেই সব বিচিত্র পরিবেশ সবটাই আকস্মিক নয়—দম ফুরিয়ে-যাওয়া ঘড়ির কাঁটার থেমে যাওয়ার মতন অথবা দম-দেওয়া ঘড়ির কাঁটার চলার মতন অত সহজে যেন ব্যাখ্যা করে চলে না···

স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ—সবটা জড়িয়ে যেন একটা সূক্ষ্ম পরিকল্পনার, একটা অশরীরী ইচ্ছার, একটা সত্তার ছেদহীনতার ইঙ্গিত বহন করে···

আজ জন্মাষ্টমী···একটি অবিস্মরণীয় জন্মের স্মরণ-তিথি···

এই কৃষ্ণা-তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন···জন্মগ্রহণ করেন কারাগারে, চরম-অত্যাচারী শত্রুর কারাগারে···যে অত্যাচারীকে তিনি পরে নির্মূল করবেন, জন্মালেন তারই সুরক্ষিত কারাগারে···

বন্দীশালায় মুক্তিদাতার এই যে জন্ম, এ কি শুধু একটা আকস্মিক ঘটনা? না, বিরাট কোন ইচ্ছার সজ্ঞান পরিপূর্তি?

অবিশ্বাসী বলেন, পৌরাণিক কাহিনী, লিখিত ইতিহাসের নজিরের বাইরে!

কিন্তু যীশুর জন্ম? সে তো লিখিত ইতিহাসের নজিরের মধ্যে···আর সে নজির লিখে রেখে গিয়েছেন কোন অন্ধ ভক্ত নয় ···বিদেশী বিধর্মী ঐতিহাসিক। যীশুর জন্মের সন-তারিখ তো পৌরাণিক অন্ধকারে ঢাকা নয়···সমস্ত পৃথিবী সেই জন্মের দিন থেকে তারিখ গুনে চলেছে···

যারা বঞ্চিত, যারা রিক্ত, সহায়-সম্বলহীন তাদের হয়ে যিনি আত্মদান করলেন, তিনি জন্মালেন পথের ধারে পরিত্যক্ত এক জীর্ণ আস্তাবলে···অতিদরিদ্র ছুতোর-মিস্ত্রী মা-বাপের কোলে···

যে ছন্দে যীশুর সারা জীবনের কাব্য গাঁথা, যে ছন্দে তাঁর জীবনের শেষ, জেরুজালেমের পথের ধারে সেই পরিত্যক্ত জীর্ণ আস্তাবলে তার সূচনা না হলে যেন ছন্দ মেলে না···

এ ছন্দ কার?

সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, যীশুর জন্মাবার কয়েক বছর আগে আর একজন উদ্‌ভ্রান্ত বাউল জন্মগ্রহণ করেন···রাজার আসবার আগে যেমন ঘোষক আসে···জন তাঁর নাম···

নির্জন মরুভূমির ভেতর তিনি চলে গেলেন ধ্যান করবার জন্যে।

ধ্যানের মধ্যে তিনি জানতে পারলেন, যে রাজাধিরাজের আগমন-বার্তা ঘোষণা করবার জন্যে তিনি জন্মেছেন, তিনি এসেছেন···

মরুভূমির স্বেচ্ছাবৃত আত্ম-নির্বাসন থেকে জন লোকালয়ে আবার ফিরে এলেন···

প্রত্যেক কিশোরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন···তুমি নও, তুমি নও···আমি যাকে খুঁজছি সে তুমি নয়!

হঠাৎ একদিন কিশোর যীশুর সঙ্গে দেখা···নিমেষে চিনলেন, তুমি! তোমাকেই আমি খুঁজছি···তুমি আসবে বলে, তোমার আগে আমি এসেছি!

জর্দন নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে জন যীশুকে দীক্ষা দিলেন···

জন্মান্তরের রুদ্ধ-দরজা খুলে গেল···যেখান থেকে এসেছেন, সেখানকার কথা মনে পড়লো!

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলে, এসব পরবর্তী কালের কাল্পনিক রচনা··· তোমার মন যাকে ভালবাসতে চায়, তোমার কল্পনা দিয়ে, তোমার নিজের ইচ্ছা দিয়ে, তোমার মনের কথা দিয়ে তাকে সাজিয়েছ!

কিন্তু একবারই তো এ ঘটনা ঘটে নি···বার বার ঘটেছে। এই সেদিন, বহু লোকের সামনে, ঠিক অনুরূপ ঘটনাই ঘটে···যাদের সামনে ঘটে, তারা ডায়েরিতে লিখে রেখেছে···যাঁর জীবনে ঘটেছে তিনি নিজেই বলছেন,

—আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, কোন বুজরুকি বিশ্বাস করি না, কোন ভণ্ডামি সহ্য করতে পারি না···

তখন আমার বয়স আঠারো···লেখাপড়া করি, শরীর-চর্চা করি, আনন্দে গান গেয়ে বেড়াই—

কে এক সাধু এসেছে, গান শুনতে নাকি খুব ভালবাসে··· তাই আমাকে এসে সুরেশবাবু ধরলেন, সাধুকে দুটো গান গেয়ে শোনাতে হবে:

সাধুর নাম শুনেই পিত্তি জ্বলে উঠলো···সাধু যদি তার গান শোনবার এত ভড়ং কেন ?

তবুও যেতে হলো···সাধুর দিকে ফিরেও তাকালাম না···গম্ভীর-ভাবে আসরে গিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে গাইতে শুরু করলাম···

একটা, দুটো, তিনটে···অনুরোধ বেড়েই চলেছে···রুখে দাঁড়ালাম আর গাইবো না···

চলে আসছি, দেখি আমার পিঠে কার হাত পড়লো···দেখি, সেই সাধু !

—হাঁরে, চলে যাচ্ছিস্ ?

রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠলো···জানা নেই, শোনা নেই, একেবারে তুই-তোকারি !

বললাম, কাজ আছে !

সাধু সামনে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলে উঠলো, তোর সঙ্গে আমারও যে কাজ আছে, তোর জন্যেই যে আমি বসে আছি ! আমার কাছে তুই আসবি, এই চুক্তি করেই যে দুজনের আসা !

উন্মাদ, বাতুল ! কিসের চুক্তি ? কার সঙ্গে চুক্তি ?

—আমি তো আপনাকে চিনি না !

—আমি কিন্তু তোকে দেখেই চিনেছি ! তুই একদিন আয় দক্ষিণেশ্বরে···মার সামনে তোকে নিয়ে যাব···তুই-ও চিনতে পারবি ! বল্, কবে আসবি ?

শীর্ণ সাধু আমার হাত চেপে ধরে···

মুখের দিকে চেয়ে দেখি, সাধুর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে···স্ত্রীলোকের মতন কাঁদছে···চারদিকে লোক চেয়ে আছে··· লজ্জায়, বিরক্তিতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যাই—

এটর্নী বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, জেনারেল অ্যাসেম্বলীর ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই প্রথম দেখা···এ তো দূর

ইতিহাসের নেপথ্যে ঘটে নি···সাক্ষী-সাবুদ-সমেত প্রত্যক্ষ বর্তমানে ঘটেছে···

কোটি নামহীনের ভেতর থেকে ঠাকুর এক নিমেষের দর্শনে অভ্রান্তভাবে সম্পূর্ণ অজানা সেই তরুণকে আঁকড়ে ধরলেন, আমি তোকে চিনি ···তোর জন্যেই আমি এসেছি!

ঠাকুর দিবাস্বপ্নও দেখেন নি, কল্পনার বিলাসিতাও করেন নি ···জন্মান্তরের যবনিকা ভেদ করে তিনি দেখেছিলেন, সব ঘটনার মূল উৎসকে···অনন্ত ধারাবাহিকতাকে···

চলে যাবার সময়, ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময়···

কঠিন ক্যানসারে অস্থিসার ঠাকুর বিছানায় শুয়ে, সামনে দাঁড়িয়ে সেই নরেন দত্ত···এখন বলিষ্ঠদেহ যুবক···

সেই অস্থিসার শীর্ণ-জীর্ণ দেহের খোলসের দিকে নরেন দত্ত একদৃষ্টিতে চেয়ে তখনও মনে মনে ভাবছে, ঠকিয়ে গেল না তো?

অস্থি নড়ে ওঠে···

—নরেন, এখনও সন্দেহ?

ভেতর থেকে নরেন দত্ত চমকে ওঠে···

—দেখি···কাছে আয়···!

অস্থিসার আঙুল দিয়ে নরেন দত্তের হৃদ্‌কেন্দ্র স্পর্শ করেন···

—আমার যা কিছু ছিল, উজাড় করে সব তোকে দিয়ে গেলাম— তুই জগৎ টলাবি, মা আমাকে বলেছে! যা!

বর্ষণলঘু মেঘের মতন নিজেকে রিক্ত করে ঠাকুর চলে গেলেন···

এই অপূর্ব চলে যাওয়ার মুহূর্ত যেন চির-নিস্তব্ধতার অন্ধকারকে বিদ্যুৎ-আঘাতে দীর্ণ করে চলে গেল···

সেই বিদ্যুৎ-দীর্ণ মুহূর্তের বুকে ঝলকে ফুটে ওঠে এপার-অন্ধকার আর ওপার-অন্ধকারের মাঝে আলোর সেতুর আভাস···

বহু প্রাচীন কাল থেকে একটা পৌরাণিক প্রবাদ আছে, দিব্য-পুরুষেরা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নির্দিষ্ট কর্ম-সহচরগণও জন্মগ্রহণ করেন···

বিভিন্ন জায়গায় জন্মগ্রহণ করলেও এই সব কর্ম-সহচর এক বিচিত্র নিয়মের নির্দেশে কেন্দ্র-পুরুষের সঙ্গে সম্মিলিত হন এবং যখনই তাঁদের সংযোগ হয় তখনই পরস্পরের মধ্যে এমন বিচিত্র নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে সে নিবিড়তার কোন জাগতিক কার্য-কারণ-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না···তাই এই সম্পর্ককে mystic বলা হয়। সেই বিচিত্র নিবিড় সম্পর্ক সুগভীর উৎসের জলের মতন বহু জন্মের অদৃশ্য স্তর থেকে অফুরান যোগান নিয়ে সমসাময়িক কালে অজস্র উচ্ছলতায় আর প্রচণ্ড গতিবেগে প্রকট হয়ে ওঠে···

জনহীন দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর্তকণ্ঠে ডাকতেন, ওরে, তোরা আয়! তোরা আয়!

কাদের ডাকছেন এই নিঃসঙ্গ ব্রাহ্মণ?

কে বা শুনছে তাঁর এই আহ্বান?

কত দূরই বা যাবে এই ক্ষীণ কণ্ঠ?

গ্রামের কোন গৃহস্থবধূ বা বৃদ্ধা ঘাটে জল নিতে এসে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো···পাগল মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যেতো···

কিন্তু আমরা জানি, পাগল অরণ্যে রোদন করে নি···

জনহীন অরণ্যের ভেতর থেকে পাগলের সেই ক্ষীণ কণ্ঠ বন্ধ দরজা খুলে ইতিহাসের হৃদ্‌কেন্দ্রে পৌঁছেছিল···পরিচয়হীন বিপুল জনতার ভেতর থেকে তার নির্দিষ্ট লোকদের বিদ্যুৎ-আকর্ষণে টেনে নিয়ে এসেছিল···

দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে মুখে ফুটে ওঠে বহু-পূর্ব-পরিচয়ের জ্বলন্ত চিহ্ন···

এমনিভাবে জন চিনেছিলেন কিশোর যীশুকে···অদ্বৈত আচার্য চিনেছিলেন দুরন্ত নিমাইকে···বুদ্ধদেব চিনেছিলেন আনন্দকে··· ঠাকুর চিনেছিলেন নরেন দত্তকে···চিনেছিলেন পাঁচ বছরের মেয়ের ছদ্মবেশে দেবী সারদাকে···

পালি-শাস্ত্রে কথিত আছে, যে বৈশাখী পূর্ণিমাতে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন, সেই তিথিতেই একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর ভাবী পত্নী যশোধারা, ভাবী অনুচর আনন্দ এবং তাঁর রথের ভাবী সারথি ছন্দক !···শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, যে পুণ্যবৃক্ষের তলায় বসে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমও মাটির বক্ষ বিদীর্ণ করে সেই পূর্ণিমাতে আত্মপ্রকাশ করে···

যদি কেউ বলেন, প্রমাণ কি ?

ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই···প্রমাণ দেখা দেয় ধ্যানসিদ্ধ মানুষের মনে···সত্য যেখানে প্রমাণাতীতভাবে স্বয়ং উদ্ভাসিত হয়···

রামের জন্মের সত্যতার প্রমাণ অযোধ্যার ইতিহাসে নয়, তার প্রমাণ বাল্মীকির অন্তরে···

তাই যাওয়া আর আসার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে দেখি মানুষের অনন্ত গতায়তির বিচিত্র সমারোহ···

দেখি, জন্ম আর মৃত্যুলগ্নের বিচিত্র পরিবেশ···

সেইসব জন্ম আর মৃত্যুর বিচিত্র পরিবেশের ভেতর থেকে, যে এলো বা যে গেলো তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে আর

একটা স্বতন্ত্র ইচ্ছার ইঙ্গিত লিপিহীন বর্ণমালায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে···

বোধিসত্ত্ব রাজার ঘরে এলেন কিন্তু রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করলেন না···

পৌরাণিক ভারত জন্মগ্রহণ করে তপোবনে···বৌদ্ধ ভারত জন্মগ্রহণ করে ভারতের অরণ্যে···বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন অরণ্যে, অথচ রাজা শুদ্ধোদনের এত সাধের পুত্রের জন্ম অরণ্যে হবার কোন কারণই ছিল না···বহু-আকাঙ্ক্ষিত সেই পুত্রের আবির্ভাবের জন্যে তিনি রাজপ্রাসাদের একটা বিশেষ অংশকে আগে থাকতেই রাজ-আবির্ভাবের উপযুক্ত করে সাজাচ্ছিলেন—

হঠাৎ মায়া দেবীর ইচ্ছা হলো পুত্র-প্রসবের আগে তিনি একবার পিতৃরাজ্যে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আসবেন···

পত্নীর বাসনাকে চরিতার্থ করবার জন্যে রাজা শুদ্ধোদন রাজ-সমারোহে তাঁকে পিতৃরাজ্যে পাঠালেন।

হিমালয়ের পাদদেশে কোলিয় রাজ্য···মায়া দেবীর পিতৃভূমি···

বসন্তকাল···শ্যাম অরণ্য চারদিকে অপরূপ পুষ্প-শোভায় সেজেছে···লুম্বিনী গ্রামের প্রবেশমুখে চারদিকের সেই অরণ্যশোভা দেখে মায়া দেবী পালকি থামাতে বললেন···সমস্ত অরণ্য সুরভি হয়ে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালো···অনুচরবর্তিনীদের নিয়ে সেই অরণ্যে আনন্দ-বিহার করতে নামলেন···

অরণ্যপথের ধারে পুষ্পিত শালতরুর ছায়ায় সহসা তাঁর সারা দেহ অবশ হয়ে এলো···

জনহীন অরণ্যপথের ওপর শালতরুর ছায়ায়, সর্ব-কোলাহল থেকে দূরে নির্জনতার ধাত্রী-অঙ্কে জন্মালেন বোধিসত্ত্ব···।

পুষ্পিত শালতরুর মাথায় উঠলো বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ···

বুদ্ধের আবির্ভাবের জন্যে যে নিপুণ শিল্পী সেই জনহীন অরণ্যপথকে পুষ্পে আর পূর্ণিমায় সাজিয়েছিলেন, সেই একই

নিপুণ হাত দেখি, যীশুর জন্যে জেরুজালেমের পথের ধারে পরিত্যক্ত আস্তাবলকে ভাঙা গামলা আর শুকনো খড়ে সাজিয়ে রেখেছেন···

ঘটনার আকস্মিকতা নয়···বারে বারে চিহ্নিত পুরুষদের সূতিকাগারের আশেপাশে দেখি অদৃশ্য নেপথ্য-বিধানের চিহ্ন···

মুঘল-সম্রাট্ শাহ্জাহানের বিরাট বাহিনী চলেছে দক্ষিণ-ভারতে বিজাপুরকে শায়েস্তা করতে···

পথে পড়লো মারাঠা জায়গিরদার শাহাজীর জায়গির···শাহাজী বিজাপুরের অনুগৃহীত···শাহাজী বাধা দেবার চেষ্টা করলেন···ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে মুঘলবাহিনী তাঁর জায়গির ভেঙে চুরে ভূমিসাৎ করে দিলো···শাহাজী পালাতে বাধ্য হলেন···

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী জীজাবাঈকে বিশ্বস্ত অনুচরের হাতে দিয়ে শাহাজী আত্মগোপন করলেন···

শাহাজী কিংবা তাঁর স্ত্রীকে ধরবার জন্যে চারদিকে সশস্ত্র মুঘল-সৈন্য হানা দিয়ে বেড়ায়···

মারাঠার পথে-প্রান্তরে গ্রামে গ্রামে তখন একধরনের চারণেরা গান গেয়ে বেড়াতো, এই ধ্বংসের ভেতর দিয়ে, এই মৃত্যু-কণ্টকিত অত্যাচারের ভেতর দিয়ে আমরা শুনতে পাচ্ছি তাঁর চরণধ্বনি··· তিনি আসছেন, ভারতের নব-মুক্তিদাতা···

মুঘল-সৈন্যদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে জীজাবাঈ মাত্র একজন পুরুষ-অনুচর নিয়ে জঙ্গলে, পাহাড়ে, গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন···এক অজানা গর্বে তাঁর মাতৃহৃদয় দুলে ওঠে, চারণেরা যে মুক্তিদাতার গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, কে জানে সে মুক্তিদাতা তাঁর দেহাভ্যন্তরে রয়েছে কি না! নিজের জন্যে নয়, স্বামীর জন্যে নয়, সমগ্র মারাঠা জাতির জন্যে তাঁর গর্ভস্থ অনাগত শিশুকে রক্ষা করতে হবে!

নেকড়ে-আর-হায়না-ডাকা অরণ্যের ভেতর দিয়ে অসহায় দেহ-

ভার নিয়ে জীজাবাঈ হেঁটে এগিয়ে চলেন···দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় শিউনার দুর্গ···

বিকেল না হতে শিউনার দুর্গের দরজা বন্ধ হয়ে যায়···নেকড়ের ভয়ে দুর্গ-রমণীরা বিকেল থাকতেই দুর্গের বাইরের ঝরনা থেকে জল ভরে নিয়ে যায়···

দুর্গ-রমণীরা জল নিয়ে দুর্গে চলে গিয়েছে···প্রহরীরা দুর্গের দ্বার বন্ধ করছে···এমন সময় প্রাণ-মাত্র-অবশেষ জীজাবাঈ দুর্গদ্বারে এসে বসে পড়লেন···প্রহরীরা অর্ধ-অচেতন নারীকে দুর্গের ভেতরে নিয়ে যায়···

সেই পরিত্যক্ত প্রাচান দুর্গে, প্রান্তর-থেকে-ভেসে-আসা শত্রুদের রণ-চিৎকারের মধ্যে শিবাজী জন্মগ্রহণ করলেন···শাঁখের আওয়াজের বদলে রাত্রি-অন্ধকারে ডেকে উঠলো নেকড়ের দল···

এ পরিবেশকে আকস্মিক ভাবতে মন কিছুতেই চায় না···

জাতির মুক্তিদাতা শস্ত্রপাণি বীরের আবির্ভাব-লগ্নকে ঘিরে এমন নিখুঁত প্রস্তুতির পেছনে কোন শিল্প-চতুর ঘটয়িতার হাত নেই, একথা ভাবতে গেলে আত্মবঞ্চনা করতে হয়···

দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে বদলে যায়—কিন্তু আসার পথে পথে সেই এক নিপুণ প্রস্তুতি···

বিরাট ধোবি-তলাও···ধোপারা কাপড় কাচে সেখানে, তাই লোকে বলে ধোবি-তলাও···স্রোতহীন জলের ধারে ধারে পাঁক আর শ্যাওলা কঠিন হয়ে জমে জমে আসছে···

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে···একজন ধোপার* কাজ সারতে সেদিন দেরি হয়ে গিয়েছে···সন্ধ্যার অন্ধকারে আধ-শুকনো কাপড়গুলো পুঁটলি বেঁধে ধোপা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে···

* কেউ কেউ বলেন তাঁতি

ধোবি-তলাওএর ধার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সেই সন্ধ্যার নিশুতি অন্ধকারে ধোপার কানে এলো সদ্যোজাত শিশুর কান্না !

এই জনহীন পরিত্যক্ত পুকুরের ধারে নবজাত শিশু কাঁদে কোথা থেকে ?

পুঁটলি নামিয়ে ধোপা দেখে, পুকুরের ঘন শ্যাওলার ওপর পড়ে পরিত্যক্ত এক মানবশিশু···অসহায়ভাবে সে কাঁদছে···

কুন্তী-মা তাকে লজ্জায় ত্যাগ করে গিয়েছে···পিতৃ-পরিচয়, সর্ব-পরিচয় থেকে সে বিচ্ছিন্ন···

ধোপা বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে ভাবে, এই শিশুর জন্যেই কি আজ তার ফিরতে দেরি হলো ? যদি সে তাকে এমনি ফেলে চলে যায়···?

সেই নামহীন পরিচয়হীন সামান্য ধোপা যদি সেদিন সেই শিশুকে বুকে তুলে ঘরে না নিয়ে যেতো, ভারতের সাধনার ইতিহাসে কবীরের আবির্ভাব ঘটতো না···

সর্ব-সংস্কার-মুক্ত সর্ব-বন্ধন-মুক্ত মানুষের জয়গান যে গেয়ে গেল, জন্মসূত্রেই সব পরিচয়ের অহমিকা ঘুচিয়ে ধোবি-তলাওএর পাঁকের পথ দিয়ে সে এলো দীনহীন ধোপার ঘরে···

এ কি আকস্মিক সংযোগ ?

কুঁড়েঘরের এক পাশে মাটির দাওয়া···সেই দাওয়াকে ঘিরে হয়েছে সূতিকাগার···

একধারে একটা ঢেঁকি···তার কাছে একটা মাটির উনুন, ধান সেদ্ধ করবার জন্যে···তিন চার দিন সে উনুনে কোন কাজ হয় নি··· রাজ্যের ছাই জমা হয়ে আছে উনুনের মুখে···

সারা রাত প্রসূতি যন্ত্রণায় কাত্‌রেছেন···সাহায্য করবার জন্যে একমাত্র একটি মেয়ে এসেছে, ধনি কামরানী···

ভোরের দিকে পাখি-ডাকা আলোয় প্রসূতি ভার-মুক্ত হলেন··· ধনি কামরানী সদ্যোজাত ব্রাহ্মণ-শিশুকে ন্যাকড়া জড়িয়ে কাছেই মাটিতে শুইয়ে রেখে প্রসূতির সেবায় ব্যস্ত হলো···

প্রসূতির তত্ত্বাবধান করে ধনি কামরানী সদ্যোজাত শিশুকে মার কোলের কাছে দিতে গিয়ে দেখে, শিশু সেখানে নেই···

ভয়ে আকুপাঁকু করে ধনি চারদিকে দেখে···কোথাও কিছু দেখতে পায় না···হঠাৎ নজরে পড়লো শিশু গড়াতে গড়াতে সেই উনুনের মুখে গিয়ে পড়েছে···উনুনের জমানো ছাইতে শিশুর সারা দেহ ভরে গিয়েছে···

সর্ব-অঙ্গে বিভূতি মেখে আমার ঠাকুর এলো মার পাশে···

এ কি শুধু আকস্মিকতার রূপকথা ?

ঠিক এই একই প্রশ্ন জাগে, যখন দেখি একের পর এক চলে-যাওয়ার দৃশ্য···

ঘরে ঢোকার সময়েও যেমন, ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময়েও তেমনি দেখি বিচিত্র এক রহস্য-ঘন মুহূর্ত···যে মুহূর্তের ছোট্ট ফাঁক দিয়ে ঝিলিক দিয়ে ওঠে মৃত্যুহীন ছেদহীন এক বিরাটের আভাস···

———

মামার বাড়ি

বাঙলাদেশে একটা স্বর্গলোক ছিল, তার নাম মামার বাড়ি···

মামারা আছেন কিন্তু সে মামার বাড়ি আর নেই···

জমিদারী-প্রথা আর মামার বাড়ি একই চিতায় সহমরণে পুড়ে নিলিয়ে গিয়েছে।

শাস্ত্র ও বিজ্ঞান, দুই-ই বলে, মৃত্যু নেই···শুধু এক রূপ থেকে আর-এক-রূপে রূপান্তর···

জমিদারি মরে ব্যবসাদারি হয়েছে।

আমার মামার বাড়ি, আপনার মামার বাড়ি, সকলের মামার বাড়ি রূপান্তরিত হয়ে হয়েছে একটি বৃহৎ সার্বজনীন মামার বাড়ি···

সেই বৃহৎ মামার বাড়ির নাম হলো, পশ্চিম বাঙলা···

এমন মামার বাড়ি ত্রিভুবনে আর নেই।

এখনও শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মামার বাড়ির সুখ-স্মৃতি···

বাড়ির শাসনের হাত থেকে, সবরকম বাঁধা-ধরার অত্যাচার থেকে হঠাৎ কিছুকালের মতন মুক্তি পাবার এমন শান্তিপ্রদ জায়গা আর কোথাও ছিল না···

মামার বাড়ি যাওয়ার সময় বাড়ির অভিভাবক ব্যর্থ জেনেও

গম্ভীর ভাবে আদেশ করতেন, সারাক্ষণ সেখানে হইহই করা চলবে না···ইংরেজী আর বাঙলা টেক্স্ট্ বই দুটো অন্ততঃ নিও, হোম্-টাসক্-এর খাতাটা নিতে ভুলো না।

ঘটা করে অভিভাবকদের দেখিয়ে ইংরেজী আর বাঙলা বই-এর সঙ্গে অঙ্কের বই পর্যন্ত নিতাম···বেশ মোটা দেখে একটা হোম্-টাস্কের খাতাও নিতাম···

নির্ভাবনায় নিতাম···কারণ নিঃসংশয়ে জানতাম মামার বাড়ির জুরিস্ডিকশনের মধ্যে গিয়ে পড়লে এসব বই-এর পাতা আর খুলতে হবে না। কোন বাবা-কাকা বা দাদার কোন শাসন সেখানে কার্য-করী হবে না। সেখানে যদি তাঁরা আমাকে শাসন করতে আসেন, উলটে তাঁরাই শাসিত হবেন!

মামীমা, নয় ত দিদিমা তর্জন করে উঠবেন, রেখে দে তোর বই!

তারপর বাবার দিকে চেয়ে বলবেন, দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে···এখানে আর ওসব কেন? খাক্, দাক্, ঘুরুক, ফিরুক, পড়াশোনা তো আছেই! আয়, দুধ জ্বাল দিচ্ছে, সরের চাঁচি তুলে দেবো!

নতমুখ হতবাক্ অভিভাবকের সামনে দিয়ে বীরদর্পে দিদিমার হাত ধরে রান্নাঘরের দিকে চলে যাই···

ঠাকুমা তবুও মাঝে-মধ্যে শাসন করেন, অনেক ঠাকুমা রীতিমত কড়া শাসকও, কেন না শাসিতের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ দায়িত্ববোধ আছে। কিন্তু দিদিমা, কভু নয়, কভু নয়। কারণ, শাসিত সম্পর্কে তাঁর দায়িত্ব কম, তাই তাঁর স্নেহের ফুলে কোথাও থাকে না শাসনের কাঁটা···ওই জন্যে বিদ্যাসাগর মশাই পিসীমার কান কামড়ানোর কথা লেখেন নি, লিখেছেন মাসীর কান কামড়ানোর কথা। বাঙলা ভাষায় সেইজন্যে চোরে চোরে পিসতুতো ভাই হয় না, হয় মাসতুতো ভাই···

দিদিমা, মামা, মামী, না হয় মাসী, যে-কোন অন্যায়ের জন্যে একজনের না একজনের কাছে প্রশ্রয় পাওয়া যাবেই···

সারা দুপুর নিশ্চিন্ত মনে পুকুরের জলে দৌড়ঝাঁপ কর···বার বার পাড়ের দিকে ভীত দৃষ্টিতে চাইবার কোন দরকার নেই···ওই চারজনের মধ্যে একজন কেউ না কেউ তোমার অভিভাবককে আটকে রাখবেনই।

—আহা! সেই তো কলকাতার কলের সুতোর মতন জলে পক্ষীস্নান করা। একটু প্রাণ খুলে বুক-জলে ভেসে বেড়াক না! কিচ্ছু হবে না!

কেস্ট মোড়ল এসে নালিশ করে, কই, এতোদিন তো বলতে আসি নি মাঠাক্‌রেন···অ-তো খাজুর গাছ···একটা ভাঁড়ে যদি এত্তুটুকু রস থাকে!

দিদিমা উলটে ধমক দিয়ে ওঠেন, বলি তাতে কি হয়েছে? কলকাতায় ওরা ওসব খেতে পায় নাকি? ওর জন্যেই তো মামার বাড়ি এসেছে···দুদিন পরেই তো চলে যাবে···

—তাহলে ভাঁড়েতে এবার নিম-নিসুন্দি পাতা আর···

দিদিমা গর্জন করে ওঠেন, খবরদার কেস্ট! ·ার যা ক্ষতি হবে, তুই আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যাবি!

কেস্ট মোড়ল বিড়বিড় করতে করতে চলে যায়।

পেছন থেকে দিদিমাকে আবেগে জড়িয়ে ধরি!

হায় দিদিমা! হায় মামার বাড়ি!

কিন্তু আক্ষেপ করবার কিছু নেই!

ছোট্ট দু'বিঘার মামার বাড়ির বদলে আজ বিধাতাপুরুষ সারা পশ্চিম বাঙলাকে মামার বাড়িতে পরিণত করে দিয়েছেন···

এমন মামার বাড়ি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই !

অভিভাবক কেউ নেই···সবাই হয় দিদিমা, নয় মামা, নয় মামী, নয় মাসী ! নয় দাদামশাই !

একজন কড়া ঠাকুরদা ছিল···কিন্তু অ-পুত্রক···উত্তরাধিকারী-হীন···

মরবার সময় তাই দাদামশায়ের হাতে নাবালকদের ভার দিয়ে গেলেন···

চারদিকে মামা, মামী আর মাসীর দল···

এ-জাতের বাপ, খুড়ো বা জ্যাঠামশাই কেউ নেই যে বেত তুলে বলবে, অন্যায় আবদার করেছ তো বেতিয়ে ঠিক করবো !

কেউ যদি মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে ছেলেকে শাসন করতে যায়, ছেলে উলটে রুখে বলে, চোখ রাঙাচ্ছো আমাকে ! মনে থাকে সকাল হলেই প্রফুল্লদাকে গিয়ে বলে আসবো !

পথে, ঘাটে, চায়ের দোকানে, বাজারে আলুর স্টলে, কাপড়ের দোকানে, জলযোগে, গাঙ্গুরামে, সর্বত্র কান পেতে রাখলেই শুনতে পাবেন, প্রফুল্লদার সঙ্গে কথা হলো···প্রফুল্লদা বললেন···কালই প্রফুল্লদার সঙ্গে দেখা করে সব বলছি···ভাবনা কি, প্রফুল্লদাকে গিয়ে বলুন···

পশ্চিম বাঙলার আকাশে-বাতাসে আজ মামার বাড়ি মামার বাড়ি গন্ধ !

এ জাতের অভিভাবক কেউ নেই, এই মারাত্মক সত্য সন্দেহাতীত-ভাবে আমরা জেনে গিয়েছি···

নইলে, দিন দুপুরে শহর-ভরতি লোক আর পুলিসের সামনে সম্পূর্ণ অকারণে তেরো-তেরোটা ট্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারতো না !

এবং দাদামশাই থেকে ছোটমামা পর্যন্ত সবাই বললেন, ও

আমাদের ছেলেদের কাজ নয়···বদমায়েশ লোকেরা এ কাজ করেছে!

এই নামহীন সংজ্ঞাহীন বদমায়েশের দল কারা? তারা পশ্চিম বাঙলার লোক? না, শুক্র-গ্রহের লোক?

যারা সেদিন আগুন লাগিয়েছে, আর যারা দাঁড়িয়ে সেই অগ্নি-উৎসব দেখেছে, বা দেখে পালিয়েছে, তাদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা কোথায়?

যত বড় অন্যায় আমাদের চোখের সামনে ঘটুক, আমরা শুধু দর্শক সেজে বসে থাকবো···কি দরকার ঝামেলায়? দু'দিন মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি, খেয়ে দেয়ে চলে যাব···কি কাজ বাদ-প্রতিবাদে?

এই মনোভাব আজ সমগ্র জাতিকে পেয়ে বসেছে···

এ যেন আমাদের দেশ নয়···আমরা যেন দু'দিনের জন্যে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি···এখানে আবার পড়াশোনার কথা কেন? কি দরকার হোম্-টাস্কের খাতা খোলবার? শাসন যারা করবে বা করতে পারে তারাও মামা-মামীদের মুখ চেয়ে উদ্যত শাসন-দণ্ড নামিয়ে নেয়···

চায়ের দোকানে বসে পাড়ার মস্তান সকলকে শুনিয়ে বলে, থানার বড়বাবু ক্যাবলাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে···মামা একটা ফোন করলে ছেড়ে দিতে পথ পাবে না!

পুলিসের লোকও আজ ভাবতে আরম্ভ করেছে, ভালো রে ভাল, পুলিস বলে কি শুধু আমাদেরই মামার বাড়ি থাকতে নেই?

সবাই ভাঁড় ভেঙে রস খাচ্ছে, আমরাই শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢিল খাবো?

দশটা লোক রাস্তায় পটকাবাজি করে, সঙ্গে সঙ্গে একশোটা দোকান ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি পালায়···

দোকান পড়ে থাকে, মালপত্র পড়ে থাকে লুটেরাদের দয়ার ওপর…

পুলিস আসে কিন্তু পুলিসও তো মানুষ…হাত বাড়ালেই যেখানে ফল পাওয়া যায়, কার না হাত সেখানে নিশপিশ করে!

সেদিনকার ঘটনায়, কাগজে খবর বেরিয়েছিল, একজন পুলিস নাকি ফলের দোকান ভেঙে ফল লুট করছিল…বেচারা ধরা পড়েছে…!

কমিটি বসেছে, কমিটি বসবেই, সেদিনকার অঘটনের পেছনে আমাদের ভাগ্নেরা ছিল, না শুক্র-গ্রহের অধিবাসীরা ছিল, সেটা তদন্ত করে দেখবার জন্যে…

আমাদের গর্ব আমরা এক নতুন গণতন্ত্র গড়ে তুলছি।

কিন্তু আমরা ভুলে যেতে বসেছি, মেরুদণ্ডহীন সুবিধাবাদীদের নিয়ে গণতন্ত্র গড়া যায় না…

তাদের নিয়ে একমাত্র যে জিনিস গড়া যায়, সে হচ্ছে মামার বাড়ি…

গণতন্ত্রের নামে সেই মামার বাড়িই আমরা গড়ে তুলছি।

বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর স্বজাতিদের চিনতেন…তাই দ্বিতীয় ভাগে তিনি ভুবন আর তার মাসীর গল্পের ছলে অনেকদিন আগেই আমাদের সতর্ক করে গিয়েছিলেন…

"ভুবন কহিল, মাসী! এখন আর কাঁদিলে কি হইবে? নিকটে আইস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর ভুবন তাহার একটি কান কাটিয়া লইল।…কহিল, মাসী, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ। প্রথম প্রথম যখন আমি চুরি করিয়া তোমায় পয়সা আনিয়া দিতাম, তখন যদি তুমি আমায় শাসন

করিতে, আজ আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, তজ্জন্য তোমার এই পুরস্কার হইল।”

মাসীর আদরে লালিত-পালিত ভুবনের সংখ্যায় আজ দেশ ভরতি হয়ে যেতে চলেছে…

কার কান কামড়াবে জানি না, কিন্তু প্রফুল্লদা সাবধান !

যেরকম কান পেতে তুমি লোকের ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ শুনছো, লোকে ধন্য ধন্য করছে বটে কিন্তু দাদা আমার ভয় করছে, ব্যক্তি-রাক্ষসকে কেউ কখনও সন্তুষ্ট করতে পারে নি…

বাঙালী এমন একটা জাত, যার দ্বারা উপকৃত হয় ব্যক্তিগত ভাবে তার বিরুদ্ধেই সব চেয়ে বেশী তার আক্রোশ !

প্রমাণ ? সেই বিদ্যাসাগর মশায়ের অমর উক্তি, অমুকে আমার কেন নিন্দে করছে ? আমি তো তার কোন উপকার করি নি !

বড় দুঃখে আজ এই কথা লিখছি…নজরুল বলেছিল, তলোয়ার নেই তাই কলম নাড়ছি !

আমি সে-কথাও বলতে পারি না…যে হাতে পড়লে কলম তলোয়ার হয়, সে হাত আমার নেই…আজ বাঙলাদেশে একটা কলম নেই যা রক্ত ঝরাতে পারে, আগুন জ্বালাতে পারে, আবর্জনাকে পুড়িয়ে ছাই করতে পারে, ঘুমন্তকে জাগাতে পারে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিধাতার বজ্র হয়ে ফেটে পড়তে পারে…

বাঙলাদেশে আজ সব soft হয়ে আসছে…soft হয়ে আসছে বাঙালীর মেরুদণ্ড…

রবীন্দ্রনাথ বৃথাই বিধাতার দ্বারে বার বার আর্জি করে গেলেন, দাও আমাদের দুঃখের দীক্ষা, দুঃখের মধ্যে দাও বীর্যের দীক্ষা…

বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে যাতে আমরা পথ চলতে পারি!

বিবেকানন্দ চিৎকার করে করে হতাশ হয়ে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলেন…

বাঙালীর জীবনে দুঃখ আছে কিন্তু দুঃখকে তপস্যায় রূপান্তরিত করার মন্ত্র আজকের বাঙালীরা ভুলে গিয়েছে…

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, Ease makes children, difficulties make the man…

আবদার দরকার শিশুর…প্রাপ্তবয়স্কের দরকার, আঘাত!

প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও আমরা শিশুর মতন আবদার করি…এবং আবদার না মিটলে শিশুরই মতন অর্থহীন আচরণ করি…এবং সেই শিশু-সুলভ লজ্জাকর আচরণকে মনে করি বীরত্ব, বিদ্রোহ, বামপন্থিতা…

প্রত্যেক মানুষের তথা প্রত্যেক জাতের ভেতরকার শক্তির একমাত্র পরিচয় হলো দুঃখের সময়, সংকটের সময় সে কি রকম আচরণ করে, তার ওপর…

এইখানেই ইংরেজ আজও পৃথিবীর সেরা জাত…সংকট যত তীব্রতর হয়, ইংরেজের দুঃখ-সহন-শক্তি যার অপর নাম হলো বীর্য, ততই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়…এবং যে ভয়াবহ দুর্বিপাক ও দুঃখে মানুষ নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে ভুলে যায়, সেই প্রচণ্ড দুর্বিপাক ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজকে সত্যিকারের gentleman করে তোলে। gentleman কথার মানে হলো, যে লোক নিজের স্বার্থকে ছাড়িয়ে অপরের স্বার্থের কথাও ভাবে…

যে দুঃখে যে সংঘাতে ইংরেজ gentleman হয়ে ওঠে, সেই দুঃখের সংঘাতে আমরা, হয় অন্ধ স্বার্থপর হই, নয় হীন ভিখারী হই …এই দুঃখ-গ্রহণের পরীক্ষায় আমরা পৃথিবীর নিম্নতম চরিত্রহীন এক জাত।

কোথায় এ জাতির ত্রাণকর্তা ?

কোথায় সে রুদ্র-নেতা জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে যে দণ্ডদাতা হতে বিমুখ হবে না ?

কোথায় সে বজ্রপাণি নিঃসঙ্গ পথ চলবার ভয়ে যে অন্যায়ের সঙ্গে গোপন আপস করবে না ?

দলের স্বার্থকে বজায় রাখতে গিয়ে যে জাতির স্বার্থকে ভুলে যাবে না ?

কোথায় সে, যে বলবে, বাঙলা যদি মরে যায়, বেঁচে থেকে কি লাভ ?

ভারতের কথা বলতে পারি ন', তবে একথা জানি আজ বাঙলায় একটি লোকেরই প্রয়োজন ছিল, তাঁর নাম সুভাষচন্দ্র···নেতাজী···

তাঁর আসন শূন্যই পড়ে আছে···

তাঁর জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো···

কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছে···সুভাষচন্দ্র সামরিক পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে গড়ে তুলেছেন···নিজে সেই বাহিনীর জেনারেল অফিসর-ইন্-চীফ্ হয়েছেন···কোন কোন রসিক লোক বললো G. O. C. নয়···গক্ !

পার্ক সার্কাস মাঠে কংগ্রেস বিরাট একজিবিশন খুলেছে···

সারারাত্রি জেগে স্বেচ্ছাসেবকরা সামরিক পোশাকে এক্‌জিবিশনের মণ্ডপকে সামরিক পদ্ধতিতে পাহারা দিচ্ছে···

সুভাষচন্দ্র সেই ভাবেই স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষা দিয়েছিলেন···

সেবার দুরন্ত শীত···মাঝরাতে উঠলো হাওয়া···সেই খালি জায়গায় টহল দিতে দিতে একদল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শীতে ভেঙে

পড়লো। জাতির স্বভাব অনুযায়ী তারা ঠিক করলো, এই নিশুতি রাত, জনপ্রাণী কোথাও নেই···কিছু শুকনো কাঠ যোগাড় করে আগুন জ্বালা যাক···কে দেখছে ?

আগুন তৈরী হলো···আগুনকে ঘিরে সৈনিকরা আরাম করে বসলো···দূরে কোথাও ঘড়িতে রাত দুটো বাজলো···

বাইরে চূর্ণ বরফের মতন হাওয়া বইছে···এরকম চুপ করে বসে থাকা যায় কাঁহাতক ! একজন সৈনিকের পোশাকের ভেতর এক-জোড়া তাস ছিল···তাস দেখে তারা উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো···

আগুন পোয়াতে পোয়াতে তারা তাস খেলা শুরু করলো···

টু ডায়মণ্ডস্···টু হার্টস···টু নো ট্রাম্পস্···

এমন সময় সেই নিশুতি রাতের বুকে এক-জোড়া ভারী বুটের শব্দ ছন্দ-তাল বজায় রেখে এগিয়ে আসে···এমন শীতের রাতে নিদ্রাহীন কে ঘুরে বেড়ায় ?

শব্দ কাছে এগিয়ে আসে···

তাঁবুর বাঁক থেকে বেরিয়ে আসেন জি, ও, সি, সুভাষচন্দ্র !

—অ্যাটেনসন্ !

সৈনিকেরা উঠে দাঁড়ায়···আপনা থেকে পায়ে পায়ে ঠোকা লেগে যায় !

একদৃষ্টিতে তাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে একান্ত ব্যথিত কণ্ঠে তিনি বললেন, আজ তোমরা যে অপরাধ করেছ, দেশ যদি স্বাধীন হতো, তোমাদের কোর্ট-মার্শালের হুকুম দিতাম ! সৈনিকের পোশাক সকালে খুলে ফেলবে !

গম্ভীরভাবে সামরিক ছন্দে পা ফেলে সেই শীতার্ত অন্ধকারে সুভাষচন্দ্র মিলিয়ে গেলেন।

দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে···অর্থাৎ বেপরোয়াভাবে অপরাধ করবার স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি···

শাস্তিদাতা কোথায় ?

দেশ আজ কয়েদখানা হোক, তা কেউ চায় না···কিন্তু তার জায়গায় সারা দেশটা একটা সার্বজনীন মামার বাড়ি হয়ে উঠবে, এটা কেমন কথা ?

লক্ষ্মীমন্ত
সাহিত্যিকদের কথা

হুগোর 'লা মেসারেব্লে', Les Miserables পড়ে গোঁকুর্ (*) বলেছিলেন, বইটা পড়া শেষ করে আচ্ছন্নের মতন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি …রাস্তায় বেরিয়ে চারদিকের লোকজনের দিকে চেয়ে মনে হলো, প্রত্যেক মানুষ যেন একহাত মাথায় বেড়ে গিয়েছে, আশে-পাশে চারদিকে অতিকায় মানুষের দল…

আজকের ইওরোপীয় তথা আমাদের দেশের নভেল পড়ে রাস্তার দিকে চাইলে মনে হয়, আশে-পাশে চারদিকে শুধু পথ-কুক্কুরের দল কুক্কুরীর যোনি-গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে…

লিঙ্গ ছাড়া মন্দিরে আর কোন বিগ্রহ নেই… আর সে-লিঙ্গ কোন সৃজন-বাসনার প্রতীক নয়, নিতান্ত স্থূল biological লিঙ্গ।

যে সাহিত্যিকের লেখায় এই জাতীয় যৌনকর্মের যত স্থূল ও স্পষ্ট প্রকাশ, সেই সাহিত্যিকের বই-এর চাহিদা তত বেশী।

এই কুণ্ঠাহীন যৌন-প্রকাশকে আজকের লেখকেরা মানসিক বলিষ্ঠতা ও নির্ভীকতার লক্ষণ বলে মনে করেন…

সম্পাদক ও প্রকাশকেরা তাঁদের লেখা ছাপতে পেলে নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করেন…

পাঠকদের চাহিদার জন্যে এক এক লাইব্রেরিতে এই জাতীয় বই-এর পাঁচখানা কি ছ'খানা করে কপি কিনতে হয়…

* ফরাসী কথা-সাহিত্যে বাস্তব-ধর্মিতার অন্যতম অগ্রণী।

আধ-ইঞ্চি বড় টাইপে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এক মাসের মধ্যে এই বই-এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে…

বই যে সত্যি সত্যি hot-cake বা গরম পেঁয়াজী-ফুলুরির মতন খোলা থেকে নামতে না নামতেই বিক্রি হয়ে যায়, এ যুগ তা দেখিয়ে দিল…

বই-এর সংস্করণ-সংখ্যা যত বেশী, বই-এর লেখকের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তত অকাট্য…

সাহিত্যিকের প্রতিভার বিচার করতে হলে আজ আর সাহিত্য-দর্পণ বা অলংকার-শাস্ত্রের নজির দরকার হয় না…কার বই-এর ক'টা edition, বিজ্ঞাপনে তার সংখ্যা দেখলেই অতি-সহজে প্রতিভার বিচার নিষ্পন্ন হয়ে যায়…

কতদিন কতবার চায়ের দোকানের মজলিসে শুনেছি,—আরে রেখে দে তোর থাকহরি সান্যালের কথা! তার বই-এর ক'টা edition হয়েছে? রাখহরি মজুমদারের বই-এর সতেরোটা edition হয়ে গিয়েছে খবর রাখিস?

সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আজ সমালোচনা-কর্মও সহজ-সাধ্য হয়ে এসেছে…

রেসের ঘোড়ার বিচার যেমন তার হ্যাণ্ডিক্যাপের সংখ্যা দেখে করা হয়, সাহিত্যিকের প্রতিভার বিচারও আজ তেমনি তাঁদের বই-এর সংস্করণ-সংখ্যা দেখেই নির্ধারিত হয়…

বাঙলা সাহিত্যের আজ পাঠক-সংখ্যা বেড়েছে, তার ফলে লেখকেরা উচ্চহারে দক্ষিণা পাচ্ছেন, তাদের বাড়ি ও গাড়ি হচ্ছে, এবং বাড়ি ও গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মর্যাদাও বাড়ছে।

আজ বাঙলাদেশে লিখে জীবিকা-অর্জন করতে হলে দুঃসাহসের

প্রয়োজন হয় না···আজকের শরৎচন্দ্রকে চল্লিশ টাকায় বই-এর কপি-রাইট বিক্রি করতে হয় না।

মাত্র দু'যুগ আগে এই কলকাতা শহরে বাঙালী বাড়িওয়ালা বাঙালী সাহিত্যিককে বাড়িভাড়া দিতে চাইতেন না···আজ লেখকেরা বাড়িওয়ালা হচ্ছেন।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, ভবানীপুর অঞ্চলে মাত্র পঁচিশ বছর আগে, বাড়িভাড়ার জন্যে হয়রান হয়ে অবশেষে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কি করুণা হলো, তিনি বাড়িভাড়া দিতে রাজী হলেন···কিন্তু বললেন, আমার বড় ছেলে বাড়ি নেই এখন, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার, আপনি টাকা নিয়ে কাল সকালে একবার আসবেন!

সকালে হাজির হলাম, বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেক ডাকাডাকির পর বেরিয়ে এলেন···

—দেখুন, আমার ছেলেকে আপনার নাম বলাতে ছেলে আপনাকে চিনতে পারলো।

মনটা আশায় দুলে উঠলো···

—আপনি কাগজে লেখেন, তা তো কই কাল বললেন না!

—যাক্, বাড়িটা পাওয়া যাবে তাহলে!

—আমার ছেলে আপনার লেখার প্রশংসাই করছিল···!

অন্তর থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এলো!

—কিন্তু দেখুন, সাহিত্যিককে বাড়িভাড়া দিতে ছেলের মত নেই ···ছেলের অমতে আপনাকে বাড়িভাড়া দিতে আমি পারবো না! মাফ করবেন!

বৃদ্ধ বাড়ির ভেতর চলে গেলেন···

জ্বলন্ত অঙ্গারের মতন কথাগুলো আজও মনে জ্বলছে···

এই অস্তিত্বের লাঞ্ছনা থেকে আজকের সাহিত্যিকরা যে মুক্ত হতে চলেছেন, এর চেয়ে আনন্দকর আর কিছু হতে পারে না।

যেদিন কাগজে পড়ি, নোবেল প্রাইজ বক্তৃতায় পার্ল বাক বলেছেন, আমেরিকায় আমরা সাহিত্যিকরা জানি না অর্থনৈতিক কষ্ট কাকে বলে···আমাদের যেকোন চলতি সাহিত্যিকের শহরে নিজস্ব বাড়ি ছাড়া সাগর-কূলে বিশ্রামের জন্যে নিজেদের আলাদা করে একটা বাড়ি আছেই···

সেদিন অন্তরে এই কথাই জেগে উঠেছিল, বাঙালী সাহিত্যিকের জীবনে কবে সে দিন আসবে?

সে দিন যদি আজ আগতপ্রায় হয়ে থাকে, নতমস্তকে কাল-পুরুষকে অন্তরের নতি নিবেদন করি।

বাঙলা সাহিত্যে আজ পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে। পাঠকের সংখ্যা বাড়া মানেই বেশী বই বিক্রি হওয়া। বই বেশী বিক্রি হলেই লেখকের মুনাফা বাড়ে···এবং বাঙালী সাহিত্যিকের মুনাফা রীতি-মত বেড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই মানবীয় ব্যাপারের মধ্যে দেবতার একটু চক্রান্ত রয়ে গিয়েছে···

আমাদের দেশে আবহমানকাল থেকে মানুষকে নিয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্ব চলে আসছে·· সরস্বতীর সেবা যারা করে, লক্ষ্মী তাদের ওপর বিরূপ, খনার বচনের মতন এই সিদ্ধান্ত আমরা অভ্রান্তভাবে মেনে এসেছি, ব্যতিক্রম সত্ত্বেও···

আজকে বাঙালী সাহিত্যিকের জীবনে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেবীর ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব মিটে যাবার উপক্রম হয়েছে বটে কিন্তু···

যে শর্তে এই মিটমাট হচ্ছে, প্রত্যেক আপোস-নিষ্পত্তির মত, তার ভেতর কোথায় যেন একটা সংগোপন গ্লানি থেকে যাচ্ছে।

দুঃখের দিনে সরস্বতীর উপাসক যে নিষ্ঠায় সরস্বতীর পুজো

করতো, আজ সুখের দিনে একসঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতীর পুজো করতে শুরু করায়—দেবী সরস্বতী আড়চোখে দেখছেন, তাঁর নৈবেদ্যের থালার চেয়ে লক্ষ্মীর নৈবেদ্যের থালায় উপকরণের আড়ম্বর বেশী। পূজারী তাঁর হাতের বীণা-যন্ত্রের দিকে চেয়ে আছে বটে কিন্তু মনে মনে লক্ষ্মীর সাদা প্যাঁচাটারই ধ্যান করছে।

পূজা-অন্তে অসন্তুষ্ট দেবী সরস্বতী ডিপ্‌লোম্যাটিক ভাষায় পূজারীকে আশীর্বাদ করলেন, লক্ষ্মীমান হও!

কথাটা অভিশাপের মতন মনে এসে লাগলো…

বাঙলাদেশে পাঠক-সংখ্যা বেড়েছে, কথাটার মানে হলো, বাঙলা-দেশে নভেল ও ছোটগল্পের পাঠক-সংখ্যা বেড়েছে…

এবং লেখক আর পাঠকের সঙ্গে একটা অলিখিত শর্ত হয়েছে, সাধারণ পাঠকের মনের চাহিদার ঊর্ধ্বে লেখক কোন লেখা লিখবেন না…

বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের সাধারণ পাঠকদের তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। তাঁদের দম্ভ ছিল, তাঁরা পাঠক তৈরি করবেন, তাঁদের স্তরে পাঠকদের টেনে তুলবেন, পাঠকদের স্তরে নিজেরা নেমে যাবেন না।

এই সাহিত্যিক-প্রতিভার দম্ভ বাঙলাদেশের পাঠক-সমাজ ধৈর্য-সহকারে সহ্য করে এসেছে…আজ তাঁদের ধৈর্যের ফল তাঁরা পাচ্ছেন।

আজকের লক্ষ্মীমন্ত সাহিত্যিকেরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাঠক-সমাজকে আশ্বাস দিয়েছেন, আমরা অকৃতজ্ঞ নই…তোমরা আমাদের আয় বাড়িয়েছ, আমরা তোমাদের আনন্দ বাড়াবো। তোমরা যা চাও,

যা পেলে খুশী হও, তোমাদের স্তরে নেমে গিয়ে আমরা তোমাদের তাই যোগান দিয়ে চলবো।

আজকের সাহিত্যিকদের অর্থাৎ নভেল-লেখকদের লেখার গতি ও পরিণতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তাঁরা সেই অলিখিত চুক্তি একাগ্রমনে পালন করে চলেছেন।

গোগ্রাসে তাঁদের লেখা গিলছে

পাঠক-সমাজও গোগ্রাসে তাঁদের লেখা গিলছে···

আমরা ভেবে আনন্দ পাচ্ছি, বাঙলা সাহিত্যে পাঠক-সংখ্যা বেড়েই চলেছে !

প্রত্যেক ছ'মাস অন্তর বাঙলা-কথা-সাহিত্যে যুগান্তর ঘটছে··· প্রত্যেক ছ'মাস অন্তর এক একজন করে নতুন যুগান্তকারী প্রতিভাধর স্রষ্টার আবির্ভাব ঘটছে···

অষ্টাবক্রের মতন মাতৃগর্ভ থেকেই তাঁরা সাহিত্যের শিক্ষানবীশী পর্ব শেষ করে আবির্ভূত হচ্ছেন।

শিক্ষানবীশীর অজ্ঞাতবাসকে ঢাকবার জন্যে অনেকেই ছদ্মনামের আশ্রয় নিচ্ছেন···

ছদ্মনাম নেওয়া আজ রীতিমত ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে···*

কিন্তু আজকের পাঠক-পাঠিকারা ছদ্মনামের আড়ালে থাকলেও তাঁদের চিহ্নিত লেখকদের এক-নজরেই চিনে নিতে পারেন···

তীর্থযাত্রাই হোক আর শ্মশানযাত্রাই হোক, হাইকোর্ট হোক অথবা বন-জঙ্গলই হোক···যেকোন বিষয় হোক···গল্পের নায়ক দেশ-নেতা, চোর অথবা পিক-পকেট হোক···

গল্পের পটভূমিকা দণ্ডকারণ্য হোক, আন্দামান হোক অথবা নদী-চরের নামহীন গ্রামই হোক···নভেল খুললেই তার ভেতর থেকে আঁষটে গন্ধ এমনভাবে বেরুবে যে পাঠক-পাঠিকাদের চিনে নিতে এতটুকু দেরি হয় না, তুমি আমাদের লেখক···সমস্ত ছদ্মনাম আর ছদ্ম-কৌশলের আড়ালে তুমি আসল যে-"মাল" পরিবেশন করেছ, তার জন্যেই আমরা তীর্থের কাকের মতন বসে আছি। আমাদের এই উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন আদর্শহীন বিস্বাদ জীবনে তোমার ওই আঁষটে-গন্ধ-লেখা থেকেই আমরা অস্তিত্বের আনন্দের স্বাদ পাই। পরিবর্তে, তোমার বই-এর কাটতি বাড়িয়ে তোমাকেও আনন্দ দেবো। দেখবে, সামনে পুজোয় সব কাগজের সম্পাদক তোমার দরজায় দৌড়বে···সিনেমার পরিচালকেরা সিনেমা-রাইটের জন্যে টাকার তোড়া নিয়ে তোমার পেছনে ছুটবে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের ভাঁওতায় ভুলো না। তাঁরা ভীরু···আজকের যুগে তাঁরা obsolete হয়ে গিয়েছেন। পেছনের দিকে চেয়ো না, আমাদের দিকে চাও···

* এর পেছনে কোন্ মনস্তত্ত্ব উঁকি মারছে?

আজকের কথা-সাহিত্যিকরা এই বর্ধিত-সংখ্যা পাঠক-সমাজকে অসন্তুষ্ট করতে চান না কারণ তাঁরা সাহিত্য-কর্মের ভেতর দিয়ে জীবিকা ও অর্থ-অর্জনের সম্ভাবনাকেই বড় করে দেখেছেন। বই লিখলাম, অথচ বই-এর কাটতি হলো না, এ ট্রাজেডি সহ্য করবার মতন মন ও মস্তিষ্ক তাঁদের নেই···

এবং আজ ইওরোপ আর আমেরিকার চলতি-বই-এর বাজার থেকে তাঁরা অধিক সংখ্যক পাঠক ধরবার ফরমুলা শিখে নিয়েছেন···

সে ফরমুলা হলো intellectualism-এর পাতলা সিলোফেন কাগজে মোড়া জীবনের যৌন-লীলা।

আভাস নয়, ইঙ্গিত নয়, যৌন-কর্মের কুণ্ঠাহীন বর্ণনা···আভাসে ইঙ্গিতে আজকের পাঠক-পাঠিকারা সন্তুষ্ট নন···

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা-দেখার একটা আনন্দ আছে··· কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজে সেই খেলার স-বিস্তার বর্ণনা পড়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে···তা ছাড়া সবাই তো খেলা দেখতে পায় না···

আজকের সাহিত্যিকেরা পাঠক-পাঠিকাদের সেই বাসী-খেলা নতুন করে উপভোগ করার মৌতাত যোগাচ্ছেন।

বই-এর কাটতি বেড়েই চলেছে···

সাহিত্য-প্রেরণা ও জীবনদর্শন ছাড়া আজকের সাহিত্যিকদের ওপর তিনটি জিনিসের প্রচণ্ড প্রভাব এসে পড়েছে···

একটি হলো, বই-এর কাটতির দিকে নজর, দু'নম্বর হলো, সিনেমা-লোলুপতা···তিন নম্বর হলো, এক সংখ্যায় তিন-চারটে পুরো উপন্যাস ছাপবার কাগজ-ওয়ালাদের নতুন রীতি···

এই তিনটি বিষয়ই লক্ষ্মীমন্ত সাহিত্যিকদের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করছে।

এবং পরম বেদনার বিষয়, বাঙলা কথা-সাহিত্যের নব-বিস্তারকে অধঃপতনের গহ্বরের দিকে দ্রুত নিয়ে চলেছে।

সরস্বতী অভিমানে আসন ছেড়ে গিয়েছেন···পরিবর্তে সরস্বতীর মেক-আপ নিয়ে দুষ্টু সরস্বতী আজ সাহিত্যিকদের নৈবেদ্য গ্রহণ করছেন।

চিনি-চিনি, চিনি-না

চ্যাঙ-কে মনে পড়ে ?

হংকং-এর চীনা-পল্লীর একধারে স্যাঁতসেতে একতলার একটা ছোট ঘরে একটা ছোট বেতের টুলে দিনের বেলা চুপটি করে বসে থাকতো ? সামনের রাস্তা দিয়ে যে কেউ যেতো, হাত তুলে নীরবে তাকে অভিবাদন জানাতো ? একান্ত নিরীহ, দরিদ্র, ভালমানুষ, পৃথিবীর কারুর কাছে তার চাইবার কিছু নেই···মশা থেকে মানুষ পর্যন্ত কারুর সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই···

সন্ধে হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তো।

তারপর···একটু রাত হলে,—

চ্যাঙ তার ভাঙা স্যাঁতসেতে ঘরের মেঝে থেকে পাতলা একটা তক্তা সরিয়ে একটা সুইচ টিপতো, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তক্তা আপনা থেকে সরে যেতো। টর্চ জেলে ছোট্ট সুড়ঙ্গ-সিঁড়ি দিয়ে চ্যাঙ, বেচারা চ্যাঙ আর এক জগতে নেমে যেতো, সেখানে···

হাজার বাতি জ্বালিয়ে, সাত-বন্দর-ঘোরা পৃথিবীর যত সেরা ক্রিমিন্যালরা নাচ-গান আর হই-হুল্লোড় করে আর তার ফাঁকে এমন জঘন্য সব হত্যাকাণ্ড হয় যার কোন হদিসই পুলিস পায় না···

সারা রাত ধরে চ্যাঙ এই পাপের ব্যবসার মুনাফা কুড়িয়ে বেড়ায় ···লাখে লাখে জাল-নোটের দিস্তে চ্যাঙের হাত দিয়ে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায়।

তার সামনে সাদা ইতালিয়ান মার্বেলের মতন অঙ্গ তরুণীরা

নগ্নদেহে নাচে। নাচতে নাচতে মানুষ মাটির তলার পাতকূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। চ্যাঙ নিস্পৃহ···তার মুখের একটা রেখাও বদলায় না···

আবার সকালে ছিন্ন মলিনবাসে সেই স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরে দরজার সামনে চুপটি করে বসে থাকে···সামনে দিয়ে যে যায় তাকেই নীরবে অভিবাদন জানায়···

মনে পড়ে ?

আজকের যুগের তরুণ-তরুণীদের মনে না পড়তে পারে, কারণ তাঁরা মোহন-সিরিজের আওতায় মানুষ হয়েছেন। স্বাধীন দেশে আমরা কেন বিদেশী ক্রিমিন্যালের রোমান্স পড়বো ? আমাদের দেশে কি ক্রিমিন্যাল হীরো নেই ?

আমরা কিন্তু দিনেন রায়ের ব্লেক-সিরিজের আওতায় মানুষ হয়েছিলাম! রায়মশাই তখন মাসে মাসে একখানা করে ব্লেক-সিরিজের বই আমাদের যুগিয়ে গিয়েছেন। এই সব বই যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা চ্যাঙ আর তার মতন বহু চীনাম্যানকে নিশ্চয়ই চিনবেন।

শুধু ব্লেক-সিরিজ কেন, সে-সময়ের বিলিতী ডিটেকটিভ উপন্যাস খুললেই দেখা যাবে চ্যাঙের মতন চুমুখ-ওলা একজন না একজন চীনাম্যান তাতে আছেই, পৃথিবীর যে কোন জঘন্যতম অন্যায় যারা সম্পূর্ণ নির্বিকার-চিত্তে করে যেতে পারে, যাদের মঙ্গোলিয়ান মুখে হাসি, কান্না, অনুতাপ বা অনুশোচনার কোন রেখাই পড়ে না।

অকালপক্ক হওয়ার দরুন অতি অল্পবয়সে এই সব ডিটেকটিভ উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হই এবং একান্ত দুঃখের বিষয়, এই সব বই পড়ার দরুন সেই অল্পবয়সে চীনেদের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে

যায় যে, জগতে বোধহয় এরকম হৃদয়হীন জাত আর নেই! এই একটা জাত, যার মুখে মনের কোন ছায়া পড়ে না···

পরে কলেজ-জীবনে ডিটেকটিভ উপন্যাস ছাড়া বহু খ্যাতনামা নভেল-লেখকের নভেলেও দেখেছি এই জাতীয় হাসে-না-কাঁদে-না চীনাম্যানদের চিত্র ও চরিত্র।

মাকড়সার হৃদ্‌যন্ত্র তার পেটের ভেতর থাকে···ভাবতাম চীনাম্যানদের হৃদ্‌যন্ত্রও বোধহয় দেহের ভেতর এমনভাবে লুকিয়ে আছে যে চীনারাও জানে না।

দোহাই পাঠক, চীনাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে আমি কোন তত্ত্ব-মূলক প্রবন্ধ লিখতে বসি নি। এই বিচিত্র জাত সম্বন্ধে আমার একান্ত ব্যক্তিগত মানসিক অভিজ্ঞতার ক্রম-বিবর্তন যেভাবে ঘটেছে, একান্ত সরলভালে তারই কথা বলছি।

আজও বিস্ময়ে খুঁজছি, এ জাতের হৃদ্-কেন্দ্র কোথায়?

এবং এই খুঁজতে গিয়ে একটা অভ্রান্ত সত্য জানতে পেরেছি, জগতের সেরা ক্রিমিন্যাল অথবা সেরা রাজনীতি হতে হলে চ্যাঙের মতন রেখাহীন নির্বিকার মঙ্গোলিয়ান মুখ থাকা একান্ত দরকার।

চ্যাঙ অথবা চৌ-এন-লাই সেদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান্···

'হিন্দী চিনি ভাই ভাই' বলে যেদিন ঘটা করে আমরা চৌ-এন-লাই-এর হাতে ভ্রাতৃত্বের রাখী বেঁধেছিলাম, সেদিন চৌ-এন-লাই-এর মুখের দিকে চেয়ে কোন দুঃসাহসিক লোকই কল্পনা করতে পারতো না, সেদিন সেই মুহূর্তে এই লোকটি ভারতকে চরম লাঞ্ছিত করার পরিকল্পনার কথাই ভাবছিল···

চৌ-এন-লাই যখন দিল্লীতে হাত বাড়িয়ে ভ্রাতৃত্বের রাখী

পরছিলেন, তখন চীনা সৈনিক-কুলিরা দুর্গম পাহাড় ভেঙে ভারত-সীমান্তে আসবার পথ তৈরি করছিল…চীনা-তরুণীরা যেচে সোহাগ জানিয়ে নেফায় পার্বত্য-জাতিদের ঘরে ঘর বাঁধছিল!

আমরা যেদিন চৌ-এন-লাই-এর হাতে হিন্দী-চিনির রাখী বেঁধেছিলাম, চৌ-এন-লাই নিশ্চয়ই হেসেছিলেন, কিন্তু ওই মঙ্গোলিয়ান মুখের দরুন সে-হাসি জগতে কেউই দেখতে পায় নি…

সেখানে আমাদের পণ্ডিতজীর ভীষণ অসুবিধা…আধকাঁচ্চা মতন রাগ তাঁর মনে জমা হলে, তখুনি তার খবর তাঁর মুখে মোটা মোটা হরফে ফুটে ওঠে…বার্লিন-কায়রো-মস্কোর লোকেরাও জানতে পারে।

যত বয়স বাড়তে লাগলো, ততই বুঝতে পারলাম, ক্রাইম-উপন্যাসের চীনাদের বাইরে, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের জুতোর দোকানের চীনাদের ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র এক চীনা জাত আছে…বিরাট, বিশাল, বিচিত্র…অনন্যসাধারণ।

সে চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের আড়াই হাজার বছরের অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা…হিমালয়ের প্রচণ্ড দুর্গমতা যাকে ম্লান করতে পারে নি।

আর এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে চীনারাই উপযাচক হয়ে প্রীতি দিয়ে শ্রদ্ধা দিয়ে, অতি-দুর্লভ আগ্রহ ও অনুরাগ দিয়ে ইতিহাসে অমর করে রেখে গিয়েছে।

চীন-ভারতবর্ষের এই সম্পর্কের সুগভীরতার কথা একটি ঐতিহাসিক ঘটনায় লেখকের মনে চির-জাগরূক হয়ে আছে…

…বছরের পর বছর পায়ে হেঁটে ভারতের পথে, প্রান্তরে, মঠে, মন্দিরে ঘুরে ঘুরে ফা-হিয়ান ভারতীয় পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। এই সব পুঁথিতে আছে ভারতের অন্তর-সম্পদ, যা

দিয়ে ফা-হিয়ান স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর দেশ চীনে নতুন জ্ঞানের আলো জ্বালবেন···

এই বিরাট পুঁথির বোঝা ঘাড়ে করে তিনি চীনে ফিরছেন··· পুঁথির ভারের জন্যে তিনি বাধ্য হয়ে জলপথে ফিরছেন···

চীন-সাগরে তাঁদের জাহাজ দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে পড়লো···

সেকালের সেই স্বল্পায়তন জাহাজ দুরন্ত ঢেউ আর ঝড়ে ডুবে যাবার মতন হলো···

জাহাজের এক কোণে বসে ফা-হিয়ান সেই পুঁথির বোঝা জড়িয়ে ধরে একমনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন···

সারাদিন সেই ঝড়ের সঙ্গে ব্যর্থ সংগ্রাম করে জাহাজের পরিচালক হুকুম দিলেন, যার সঙ্গে যা কিছু ভারী বোঝা আছে, জলে ফেলে দাও!

নাবিকরা জোর করে যাত্রীদের সব বোঝা জলে ফেলে দিতে লাগলো···

অন্ধকার জাহাজের খোলে এক কোণে ফা-হিয়ান তখনো সেই পুঁথির বোঝা আগলে বসে থাকেন···

হঠাৎ নাবিকদের নজরে পড়লো···ক্রুদ্ধকণ্ঠে তারা হেঁকে ওঠে,

—কি আগলে বসে আছ ওখানে? ফেলে দাও!

ফা-হিয়ানের চোখ ফেটে জল পড়ে···হাতজোড় করে মিনতি করেন···

—কত সোনা আছে ওতে?

ফা-হিয়ান বলেন, সোনা নয়, সোনার চেয়ে বহু বহু গুণ দামী···পুঁথি···ভারতের সম্পদ!

ঝঞ্ঝাক্লান্ত নাবিকেরা হেসে ওঠে···

ওই সামান্য কাগজের বোঝার জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করবে?

ফা-হিয়ান বলেন, ওই বোঝার বদলে তোমরা আমাকে জলে

ফেলে দাও…যদি ঝড়ে জাহাজ বাঁচে, ওই পুঁথির বোঝা তোমরা চীনে পৌঁছিয়ে দিও!

বৃদ্ধ ফা-হিয়ানের চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে…

সেই বিচিত্র বাতুলতার সামনে নাবিকরা ক্ষান্ত হয়।

ইতিহাস বলে, কিছুকাল পরে ঝড়ও শান্ত হয়…

আজকের চীন-ভারতবর্ষের সংঘর্ষের কথা খবরের কাগজে পড়তে পড়তে দূর-ইতিহাসের এই ঘটনা বারে বারে মনে পড়ে…

মনে প্রশ্ন জাগে, আজকে যাঁরা চীনের ভাগ্যপরিচালক, আজকে যে সব চীনা তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন, তাঁরা কি হুয়েন্‌থ্‌ শাঙ আর ফা-হিয়ানের দেশের লোক?

এ প্রশ্ন মনে জাগার আর এক নিকট কারণ ঘটলো…

চীনকে চিনলাম, যখন পার্ল বাক পড়লাম, যখন লিন য়ুটাঙের "The Importance of Living" পড়লাম—

পার্ল বাক আর লিন য়ুটাঙ বিংশ-শতাব্দীর কাছে নতুন করে চীনের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সেই দিক দিয়ে "The Good Earth" আর "The Importance of Living" আজকের শতাব্দীর দুখানি সেরা বই…বই নয়, আলো…যে আলো দিয়ে আমরা জীবনকে গভীরে দেখতে পাই।

একটা বিরাট বিচিত্র জাতকে এই দুখানি বই দুটি বিভিন্ন দিক থেকে আশ্চর্য সহানুভূতি ও গভীর বাস্তব-জ্ঞানে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

The Good Earth-এ দেখলাম, মঙ্গোলিয়ান মুখোশের

আড়ালে, চীনের আসল মুখ···দেখলাম, এই বিরাট বিপুল দেশের প্রতিদিনের মানুষদের···

দেখলাম, দুঃখে দৈন্যে দুর্ভিক্ষে, কাল-গত সংস্কারের বোঝার ভারে, মায়ায় মমতায়, সংসারের শত বন্ধনে আর পিতৃ-পুরুষদের শ্রদ্ধায় অতীত-মূল এই জাতির সঙ্গে আমাদের নিগূঢ় নিবিড় একাত্মিয়তা···

The Importance of Living-এ লিন য়ুটাঙ এই বহুপ্রাচীন জাতির দুর্জ্ঞেয়তার অপবাদ দূর করে তার জাতিগত চরিত্রের মূল-চেহারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন···

প্রত্যেক বিশিষ্ট জাতের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ছাঁচ আছে।

জাতিতে জাতিতে যেমন মিলের একটা ক্ষেত্র আছে, তেমনি অ-মিলেরও একটা ক্ষেত্র আছে। এই অমিলের ক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যেক জাতির সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য থাকে, যে সব সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সেই জাতির "ছাঁচ" বা Matrix—

লিন য়ুটাঙ চীনাজাতির সেই বিশিষ্ট ছাঁচটার চেহারা তার কাটি দিয়ে ভাত খাওয়া থেকে আরম্ভ করে বাঁশের পাতা অমন চিকন করে আঁকা পর্যন্ত প্রত্যেক কাজের ভেতর দিয়ে তুলে ধরে আমাদের অপূর্ব সততা আর সরসতার সঙ্গে দেখিয়েছেন।

চার হাজার বছর ধরে যে জাত টিকে আছে, লিন য়ুটাঙের বইতে তার সমস্ত ভেতরের চেহারাটা দেখতে পেলাম এবং আজ চীন ও ভারতের এই মর্মান্তিক বিরোধের মধ্যে থেকেও বলতে এতটুকু কুণ্ঠা নেই যে এই দেখা জীবনে এনে দিয়েছে একটা অবিস্মরণীয় আনন্দের অনুভূতি!

আশ্চর্যের কথা হলো, যেসব ব্যাপারে জাতিতে জাতিতে মিল, সেই মিলের ক্ষেত্রেই আসে জাতিতে জাতিতে বিরোধ।

যেখানে জাতিতে জাতিতে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য, যেখানে তার অমিলের ক্ষেত্র, সেখানে ঘটে না জাতিতে জাতিতে বিরোধ···

এই কথাই অন্যভাবে রবীন্দ্রনাথ বার বার বলে গিয়েছেন··· প্রত্যেক জাতের বৈচিত্র্যকে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পেষণ-যন্ত্রে ফেলে পিষে এক চেহারা করা বিশ্ব-মানবতা নয়, বিশ্ব-মানবতা বা বিশ্ব-মৈত্রী তখনই সম্ভব হবে যখন প্রত্যেক জাতি তার বৈচিত্র্যের স্বতন্ত্র প্রদীপটি আলোয় ভরিয়ে তুলবে।

কম্যুনিস্ট চীন আজ চীনের সেই জাতীয় ছাঁচকে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে ফেলে এক নতুন জাতের লোক তৈরি করেছে···তারা চীনা নয়, তারা শুধু কম্যুনিস্ট···

তাই এতদিনের এত সম্পর্ক সত্ত্বেও তাদের আমরা চিনি না··· তারাও আমাদের চেনে না···

এবং সবচেয়ে ভয়ংকর কথা হলো, কম্যুনিস্ট চীনের নায়কেরা স্বপ্ন দেখছেন, সারা দুনিয়া জুড়ে তাঁরা তাঁদের ফরমুলামাফিক এক চেহারার মানুষ গড়ে তুলবেন···

তাই আজ হিমালয়ের ওপার থেকে হুয়েন্থ্, শাঙ বা ফা-হিয়ান আর আসবেন না, কারণ তাঁদের বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আসবে মাও সে তুঙ আর চৌ-এন-লাই আর তাদের তৈরী কলের সৈনিক, হ্যানিবলের মতন শিশুকাল থেকে যাদের শেখানো হয়েছে একটিমাত্র মন্ত্র,—

যারা কম্যুনিস্ট নয়, তারা আমাদের কেউ নয়!

এবং যেকোন সময় তাদের রাজ্য আমরা অধিকার করতে পারি এবং সে অধিকারকে কেউ আক্রমণ বলবে না, কারণ আমাদের ব্রত হলো সারা পৃথিবীকে এক করে তোলা।

তাই হিমালয়ের দুর্গম পথে আজ যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, এ চীন আর ভারতের সীমান্ত-বন্টনের খণ্ডযুদ্ধ নয়।

এ হলো পৃথিবীর অনিবার্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা।

এ হলো সভ্য মানুষের শেষ ধর্ম-যুদ্ধ।

এক পক্ষে থাকবে তারা, যারা মনে করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেওয়া মানে মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেওয়া।

আর এক পক্ষে থাকবে তারা যারা মনে করে কোন ব্যক্তি নয়, কোন ব্যক্তিত্ব নয়, কোন স্বাতন্ত্র্য নয়, জগৎ জুড়ে থাকবে শুধু এক-শাসন যন্ত্র এবং সেই যন্ত্রের পরিচালক হবে শুধু একটি দল, সব দেশে তাদের এক-পরিচয়, তারা কম্যুনিস্ট !···

···এক পৃথিবী···এক মানব-গোষ্ঠী···এক অধিদেবতা, কার্ল মার্কস্ ···এই দুই বিরোধী মতবাদের মীমাংসা একদিন মানুষকে করতেই হবে।

লিন য়ুটাঙ তাঁর বইতে এক জায়গায় রসিকতা ক'রে লিখেছেন কেন চীনেরা বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পাশ্চাত্যের মতন এগিয়ে যেতে পারে নি !

সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, চীনেরা উদর সম্বন্ধে এত সচেতন যে, মাছ বা ছাগল সম্বন্ধে তারা নিস্পৃহভাবে গবেষণা করতে পারে না। কারণ মাছ দেখলেই তাদের মনে পড়ে মাছভাজা খাওয়ার কথা। সেইজন্যে কোন চীনা সার্জেনের কাছে আমি লিভার অপারেশন করে দেখাতে ভয় পাই। লিভার অপারেশন করে ভদ্রলোক হয়ত পাথর খুঁজে ঠিক বার করবেন কিন্তু আমার মনে হয়, পাথর বার করবার কথা ভুলে গিয়ে তিনি হয়ত ভাববেন, লিভারটা উনুনে চড়িয়ে ভেজে দেখলে কেমন হয় ?

কেন জানি না, আমাদেরও এই ভয় হয়…

চ্যাঙ হোক আর কম্যুনিস্ট চৌ-এন-লাই হোক, এত পড়ে শুনেও আজ চীনাম্যান দেখলে একটা অমানবীয় ভয় হয়।

আমাদের মধ্যে যাঁরা এখনও চীনাপন্থী তাঁরা ভয় পাবেন কিনা জানি না কিন্তু লিন য়ুটাঙের লিভার-ভাজার কথায় আমাদের ভয় হয় এবং ভয়টা যে নিতান্ত কাল্পনিক নয় তা তাঁর সাক্ষ্যে বুঝতে পারি।

———

'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে'

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কম্যুনিস্ট চীন যখন বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষের ভেতর ঢুকে পড়েছিল, ভারতবর্ষকে তখন আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যে প্রতিরোধ-যুদ্ধে নামতে হয়েছিল···

কম্যুনিস্ট চীনের মতন সমর-প্রস্তুতি ভারতবর্ষের ছিল না···এমন কি আধুনিক যুদ্ধের, বিশেষ করে পার্বত্য-যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রও ভারতের ছিল না···

তা ছাড়া, ভারতবর্ষে কোন যুদ্ধ-মানসিকতাও ছিল না···যার ফলে, ভারতীয় সৈন্যদের সমস্ত প্রতিরোধকে তুচ্ছ করে চীনাবাহিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের সমতলভূমির প্রবেশ দ্বারে এসে পড়ে···

এই শোচনীয় পরাজয়ে ভারতবাসীর চেতনা সং[illegible]ব্ধ হয়ে ওঠে, লজ্জিত হয়ে ওঠে···

আত্মরক্ষা করবার এই অক্ষমতার দৈন্য এই সুপ্রাচীন জাতির সযত্নে-গঠিত সমস্ত আত্মগরিমার চালচিত্রকে নিমেষে ভেঙে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দিল···

সমগ্র জাতি সহসা মর্মান্তিকভাবে, স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই প্রথম উপলব্ধি করলো, আমরা স্বাধীন হয়েছি বটে কিন্তু শক্তিশালী হই নি··

তিন হাজার বছরের ইতিহাসের ভাঁড়ার-ঘরের দরজা আগলে আমরা বসে আছি···

আজ প্রথম সেই ভাঁড়ার-ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখছি, সারি সারি সিন্দুক, সব সিন্দুক খালি…

হাজার হাজার বছরের ভিজে অন্ধকারের ভ্যাপসা গন্ধ মাকড়সার জাল হয়ে কোণে কোণে ঝুলছে…

এই অগঠিত জাতির দৈন্য আজ সহসা নিদারুণ লজ্জার মতন আমাদের পেয়ে বসেছে…

এই দৈন্য থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্যে আজ সকলের ডাক পড়েছে…

বহুদিন পরে আবার শাসকরা সাহিত্যিকদের ডেকে বলছেন, জাতিকে জাগাও !

কবিকে বলছেন, ছন্দেতে আনো প্রাণ-বহ্নি !

গায়ককে বলছেন, গাও সুপ্তি-ভাঙা অগ্নি-রাঙা গান !

পূর্ব-নির্দিষ্ট সব প্রোগ্রাম বদলে বেতারে উদয়াস্ত চলেছে জাতীয়-উদ্দীপনামূলক গান, বক্তৃতা, পাঠ, অভিনয়…

পথে, ঘাটে, পার্কে শিল্পীরা অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে নতুন-করে-লেখা নাটকের অভিনয় করছেন…

রাস্তা দিয়ে প্রখ্যাত গায়কেরা সমবেতকণ্ঠে জাতীয় সংগীত গেয়ে চলেছে…

মাসিক-পত্রিকায় গল্প-লেখক আর ঔপন্যাসিকেরা পর্যন্ত জাতীয় কবিতা লিখছেন…

সমগ্র জাতির চেতনা আজ অগ্নি-বাঙ্‌ময় হয়ে উঠতে চাইছে…

অচেতনার অসাড় অন্ধকারে সহসা চারদিকে নব-চেতনার প্রদীপ দিকে দিকে জ্বলে উঠছে…

কিন্তু···কেন জানি না, এই সব প্রদীপের শিখার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে প্রশ্ন জাগছে, এ শিখা কতক্ষণ জ্বলবে ?

এ যেন দরিদ্র-গৃহস্থের-ঘরে-জ্বালা কালীপুজোর সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক প্রদীপের শিখা···পলতেতেই শুধু তেল-মাখানো, প্রদীপের বুকে তেল নেই !

রাত-জোড়া অন্ধকারের সঙ্গে যোঝবার প্রদীপ-শিখা কই জ্বললো ?

কই সে-বাণী যা জাতির মর্মের গভীরে জাগাবে চেতনার শিখা ?

কই সে-বাণীর দহনজ্বালা যাতে ভেতরের জড়তা যাবে পুড়ে ? পাবক-শুদ্ধা হয়ে যাতে জাগবে জাতির নব-চেতনা ?

একদিন বাঙলাদেশে বাঙলাভাষায় আমরা দেখেছি বাণীর এই জ্বলৎ-প্রকাশ···দেখেছি নব-চেতনা-উদ্বোধনী বাণীর গঙ্গাবতরণ, যার স্পর্শে ভস্ম থেকে জেগে উঠেছে মৃত প্রাণ···শুনেছি মহা-সভা-উন্মাদিনী বাণী···মাত্র অর্ধ শতাব্দী আগে···

অন্ধকার তখন ছিল আরও গাঢ়···পদে পদে ছিল প্রাণঘাতিনী বাধা···পথ ছিল বন্ধুহীন বিজন···

সেদিন সাহিত্যিক-কবি-শিল্পীদের কোন শাসক নব-সৃষ্টির জন্যে ডাকে নি···ইতিহাসের আহ্বানে সেদিন তাঁরা নিজেরাই এগিয়ে এসেছিলেন···স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন নব-জাতি-সৃজনের অপরিসীম বেদনাকে···সেই স্বেচ্ছাবৃত বেদনা থেকেই তাঁদের কলমে, কণ্ঠে, কথায় জেগে ওঠে প্রাণদায়িনী শক্তিদায়িনী অসুরঘাতিনী বাণী ও সুর···

সেদিনকার বাঙলা সাহিত্যিক-শিল্পী এয়ার্-কন্‌ডিশন্‌ড্ ঘরে মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের আসনে বসে দহন-শিখার গান গান নি···

বেদনার পঞ্চ-অগ্নির মধ্যে বসে সেদিন বাণীসাধককে হতে হয়েছে অগ্নি-উপাসক…তাই সেদিন তাঁদের বাণীতে জেগে উঠেছিল বাঙলার বৈশাখী রোদের রুদ্র-দহন…তাই তাঁদের কথা হয়েছিল তলোয়ার…

সেদিনও নারীরা অঙ্গের আভরণ খুলে দান করেছিল কিন্তু কোন ফটোগ্রাফার সেখানে দাঁড়িয়েছিল না ফটো তোলবার জন্যে…

সেদিনও বাঙলার পথেঘাটে মুকুন্দ দাস আর নজরুলরা জাতীয় সংগীত গেয়ে গেয়ে বেড়িয়েছে…আজও চোখের সামনে ভাসে অগ্নি-সুর-বিদ্ধ সেই সব জনতার চেহারা…হাজার হাজার মুখ নিজেদের বিভিন্নতা হারিয়ে যেন একটা বিশাল মুখে পরিণত হয়েছে, আর সেই বিশাল ক্রুদ্ধ মুখে এসে পড়েছে তপ্ত আগুনের লালচে আভা…

আর সেদিন দেখলাম, আজকের জনতা…রাস্তা দিয়ে খ্যাতনামা সব সংগীত আর সিনেমা-শিল্পীরা জাতীয় সংগীত গেয়ে চলেছেন… জনতা শুনছে না, দেখছে…

—ওই দেখ্ সুচিত্রা সেন…

—ওই দেখ্ সেই নতুন হিরোইন্‌টা…

—ওই দেখ্ হেমন্তকুমার…

—ওই দেখ্…কুমার সেনের নিউ find…কি আঁট জামা পরেছে মেয়েটা মাইরি…

জাতীয় সংগীত গাওয়া হচ্ছে…ক্যামেরার ফ্ল্যাস্-লাইট দপ্ করে জ্বলে উঠছে…

কোথায় আগুন ?

কোথায় জনতার মুখে আগুনের আঁচ ?

পরিবর্তে দেখি, জ্বলন্ত সিগারেট থেকে সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে…

ওই দেখ্, সুচিত্রা সেন [পৃঃ ২৭৬

চারিদিকে এত বন্দে মাতরম্, চীনেদের এত গালি-গালাজ, এত কলরব, এত মাকড়ি-খোলা আর চেক দেওয়ার ছবি, এত জাতীয় সংগীত, এত উদ্দীপনাময়ী কবিতা···

তবু মন বিষণ্ন হয়ে ভাবে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে !

শক্তি-উদ্দীপনার এই বিরাট আয়োজনের মধ্যে একটি জিনিস বিশেষ করে চোখে পড়লো···অনেক গোলমালের অনেক ধুলোর ভেতর একটি সত্য হীরকখণ্ডের মতন জ্বলে উঠলো···তা হলো,—

বাঙলাভাষার ব্যাঙ্কে এখনও পর্যন্ত আমাদের অক্ষয় fixed deposit হলো রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ !

আধুনিক সাহিত্যের current account-এ এখনও পর্যন্ত

জমার ঘরে এমন কিছু পড়ে নি যা দিয়ে জাতির একবেলারও খরচ চলতে পারে!

অন্য প্রদেশের খবর ঠিক জানি না, বাঙলাদেশের বেতারে উদয়াস্ত জাতীয় প্রোগ্রামের মধ্যে সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন আমরা অধিকাংশ সময়ই শুনলুম রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দেরই বাণী...

জাতির এই প্রয়োজনের দিনে আমরা উপলব্ধি করছি, কি অক্ষয় ও অফুরন্ত শক্তিই না রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছেন!

ভারতবর্ষের মতন একটা বিপুল জাতির চেতনাকে জাগাবার মতন বৈদ্যুতিক শক্তি একমাত্র তাঁর বিরাট সাহিত্যেই আছে...

আর সেই সঙ্গে একান্ত বেদনায় আজ উপলব্ধি করছি, জাতির আত্মিক প্রয়োজনের উপযোগী একবেলারও খরচ আমাদের তথাকথিত আধুনিক ও প্রোগ্রেসিভ সাহিত্যের ভাঁড়ারে নেই...

আজকের মানুষকেই যে জাগাতে পারলো না, অনাগত কালে সে কাকে জাগাবে?

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

অন্যমনে পড়ছিলাম।

হঠাৎ কানে এলো কে যেন কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলছে, সামনের শুক্রবার বড়বাবুর প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী···আপনাকে আসতে হবে!

বড়-বাবু!···চমকে উঠলাম···

কোনদিন কোন অফিসে কাজ করিনি···অফিসের কোন বড়বাবুকেই চিনি না···

তবুও এই বিচিত্র শব্দটির সঙ্গে প্রথম যৌবনের একটা পুরো যুগ অতি-অন্তরঙ্গভাবে জড়ানো···নাট্যমন্দিরের প্রত্যেক নট, নটী, কর্মী ও ভৃত্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে বড়বাবু বলেই সম্বোধন করতো ···তাদের কাছে বড়বাবু বলতে সেই একজনকেই বোঝাতো···

ঘাড় তুলে চেয়ে দেখি, আষাঢ়ের তিক্ত রোদে সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত, অতি সাধারণ মলিন বেশে পুরানো নাট্যমন্দিরের একজন বৃদ্ধ কর্মচারী···

—আমাদের কোন ছাপানো কার্ড নেই, কিছু নেই, এমনি বলতে এসেছি···আপনি তাঁকে ভালবাসতেন, তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন···

বাধা দিয়ে বলি, ঠিক আছে···আমি যাবো।

বৃদ্ধ চলে যায়···

মনের সামনে ভেসে ওঠে আর একদিনের ছবি···

অধুনা বিলুপ্ত মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের প্রযোজনায় সীতার অভিনয় হবে···একটু পরেই যবনিকা উঠবে···

প্রেক্ষাগৃহের ভেতর একটা আসনও খালি নেই···

সমস্ত বক্‌স্ ভরতি···জার্মানির কন্‌সাল এসেছেন, নরওয়ের কন্‌সাল এসেছেন···হাইকোর্টের বিচারকেরা এসেছেন···চিত্তরঞ্জন দাশ এসেছেন···হাইকোর্টের সেরা ব্যারিস্টাররা এসেছেন···শহরের স্বনামখ্যাত ডাক্তাররা এসেছেন···বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারধারী অধ্যাপকেরা এসেছেন···

নীচে সামনের বিশেষ আসনে বাঙলার স্বনামখ্যাত রাজা মহা-রাজা, জমিদারেরা এসেছেন···

প্রেক্ষাগৃহে ভরতি ছাত্র, অধ্যাপক, বাঙলার শিক্ষিত-গোষ্ঠীর সব প্রতিনিধি···

প্রেক্ষাগৃহে আসনের অভাবে কবি আর সাহিত্যিকের দল মঞ্চের ভেতরে দু-ধারের উইঙ্‌স্-এ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন···

একদিনের ছুটি নিয়ে মফস্বল থেকে এসেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর জেলা বিচারকেরা···

আসন নেই···সম্প্রদায়ের কর্মীদের হাত ধরে অনুরোধ করছেন, আসন দরকার নেই, . প্রেক্ষাগৃহের একধারে শুধু দাঁড়িয়ে থাকবো···

যত লোক প্রেক্ষাগৃহের ভেতর···ঠিক তত লোক বাইরে দাঁড়িয়ে···দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে যেতে বাধ্য হন···

কেউ কেউ ফিরে যান না···

দেখেছি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁরা উৎকর্ণ হয়ে থাকেন···রুদ্ধ-দ্বার প্রেক্ষাগৃহের নিস্তব্ধতা ভেদ করে দূর রঙ্গমঞ্চ থেকে শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে সমুদ্র-তরঙ্গের দূর ধ্বনির মতন রাস্তায় আছড়ে পড়ে···তাই শোনবার জন্যে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন···

ছবি মিলিয়ে যায়···

মনে ধাক্কা দেয় বৃদ্ধ কর্মচারীর কথা, আমাদের কোন ছাপানো কার্ড নেই, কিছু নেই, এমনি বলতে এসেছি, যদি আসেন !

আনন্দের সন্ধানে মানুষ যত শিল্পকার্য আবিষ্কার করেছে, অভিনয়-শিল্পের মতন প্রত্যক্ষ প্রভাব আর কোন শিল্পের নেই···

এবং এই প্রভাব শুধু প্রত্যক্ষ নয়, বড় জীবন্ত···

কবির কাব্য পড়ে আনন্দ পেতে হলে, মনের একটা প্রস্তুতি দরকার···যার সে প্রস্তুতি নেই তার কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যেরও কোন সার্থকতা নেই···

চিত্রকরের ছবি বুঝে আনন্দ পেতে হলে রঙ আর রেখায় মন ও দৃষ্টিকে শিক্ষিত করতে হয়···

গায়কের সুরের মাধুর্য বুঝতে হলে সুরের কান দরকার···

কিন্তু অভিনেতা তাঁর অভিনয় দিয়ে নিমেষে প্রত্যক্ষভাবে, শিক্ষিত হোক, নিরক্ষর হোক, যে কোন লোককে হর্ষ-বেদনার দোলায় দুলিয়ে দেয়, বুকের ভেতর থেকে অশ্রুবাষ্পকে টেনে আনে, পাথরের চোখ ফেটে কান্নার ধারা গড়িয়ে পড়ে···অভিনয়ের সম্মোহনে অতি-সাবধানী গম্ভীর লোক স্থান কাল ভুলে শিশুর মতন হাত-পা ছুঁড়ে হেসে ওঠে···সেই মুহূর্তে সে আনন্দের ভেতর দিয়ে মুক্তির আস্বাদ পায়···

সভ্য মানুষ কান্না সম্বন্ধে বড় সচেতন···বিশেষতঃ পুরুষ··· অপরিচিতের সামনে কাঁদাকে সে দুর্বলতা মনে করে···কিন্তু একমাত্র অভিনেতা পারে তার সেই সচেতনতাকে ভেঙে দিতে···

শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার পূর্ণদীপ্তির যুগে দেখেছি, সীতার তৃতীয় অঙ্কে প্রেক্ষাগৃহ-ভরতি লোক, কেউ নীরবে, কেউ সরবে, সকলে একসঙ্গে কাঁদছেন !

বিদ্যাসাগরের মতন বুদ্ধি-সচেতন ব্যক্তিও অভিনয়ের প্রভাবে স্থান কাল ভুলে পায়ের চটি ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছিলেন···

তুলনা নেই অভিনয়-শিল্পের এই প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত প্রভাবের···

শিবাজীর অভ্যুদয়ের আগে মারাঠার গ্রাম্য অভিনেতারা অভি-

নয়ের ভেতর দিয়ে সমগ্র মারাঠায় নব-জাতীয়তার অভ্যুদয়ের বেদী রচনা করেছিল···

স্বদেশী যুগে বিদেশী শাসকের বাধা-নিষেধের ভেতর থেকে বাঙলার রঙ্গমঞ্চ অভিনয়ের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতার শিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছিল···

রঘুবীর নাটকে যেখানে রঘুবীর অন্যায়ের প্রতিবিধানে নব জীবনে জেগে উঠছে, সেখানে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ রঘুবীরের মুখে কথা দিয়েছিলেন,—

এই ডোর ধরি,
যাব কি শ্রীহরি,
এই পথে মিলিবে কি হারানিধি পুনরায় ?

কোন্ ডোর ধরি ? বিদেশী আইনের শাসনের ভয়ে নাট্যকার স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি কিন্তু শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে তাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে দর্শকদের বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না···

এই দৃশ্যে শিশিরকুমার একটা শাণিত ছোরা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করতে করতে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতেন এবং সেই উৎক্ষিপ্ত ছোরাকে লুফে নিয়ে বলতেন, এই ডোর ধরি যাব কি শ্রীহরি···

দর্শকদের মনে আগুন জ্বলে উঠতো···

কিন্তু যে কথা বলবার জন্যে এত কথার ভূমিকা করলাম,—

যে শিল্প মানুষের মনকে এতখানি প্রত্যক্ষভাবে দোলা দেয়, সে শিল্প তার শিল্পীর প্রতি তেমনি উদাসীন···

অভিনয়-শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কুমারী কুন্তী জননীর মতন তার শিল্পী-সন্তানকে বিস্মৃতির নদী-জলে এমন করে ভাসিয়ে ফেলে দেয় যে তার আত্মপরিচয়ের কিছু অবশেষ থাকে না !

অন্য সব শিল্পী তাঁদের সৃষ্ট শিল্পকার্যের ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকেন···সন্তানের ভেতর যেমন পিতা বেঁচে থাকে···অক্ষমতার দিনে সন্তানের কাছে ভরণ-পোষণের দাবি রাখে···

কিন্তু অভিনয়-শিল্পী নিঃসন্তান হয়ে শিল্পক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন…

তাঁর প্রতিভার কোন পরিচয় কোথাও পড়ে থাকে না…

এই মর্মান্তিক বেদনাকে স্মরণ করেই গিরীশচন্দ্র লিখেছিলেন, দেহ-পট সনে নট সকলি মিলায়……

কবির প্রতিভার সাক্ষ্য থাকে তাঁর সৃজিত কাব্য…কবি থেমে গেলেও তাঁর সৃজিত কাব্য তাঁর কীর্তিকে বহন করে চলে…কবির অক্ষমতার দিনে রয়েল্‌টি-রূপে কিছু অন্নও যোগাড় করে আনতে পারে…

চিত্রকরের থাকে চিত্র, লেখকের থাকে বই, ভাস্করের থাকে মূর্তি, গায়কের থাকে গানের রেকর্ড, সুরের স্বরলিপি…

কিন্তু অভিনেতার পেছনে কিছুই পড়ে থাকে না…

সে যখন চলে যায়, নিঃশেষে চলে যায়…

এ এক বিচিত্র ট্রাজেডি…

লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে যে অভিনেতা আনন্দের খণ্ড খণ্ড স্বর্গলোক রচনা করেছিল, সে যখন অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তার সামনে মাত্র দুটো পথ থাকে, একটা হলো ভিক্ষার পথ…দ্বিতীয় হলো, অক্ষম অভিনয়ের ভেতর দিয়ে সজ্ঞানে নিজের প্রতিভাকে হত্যা করা…সবচেয়ে বেদনাদায়ক আত্মহত্যা…

চার্লি চ্যাপলিন তাঁর অমর ছবি Limelight-এর অভিনয়-শিল্পীর মঞ্চহীন এই শেষ-জীবনের মর্মান্তিক ট্রাজেডিকে ফুটিয়ে তুলেছেন…

অনুরূপ মর্মান্তিক ট্রাজেডি আমাদের চোখের সামনে শিশির-কুমারের জীবনের শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি…

তিনি যত নাটক অভিনয় করেছেন তার মধ্যে সব চেয়ে যেটি বড় নাটক,—সে হলো তাঁর নিজের জীবন…

তিনি যত চরিত্র অভিনয়ে জীবন্ত করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে জটিল হলো, তাঁর নিজের চরিত্র…

একজন সত্যিকারের বড় নাট্যকারের লেখবার বিষয়বস্তু·

কাশীপুর শ্মশানে যেখানে তাঁকে দাহ করা হয়, তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সেখানে মুষ্টিমেয় জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মঞ্চহীন শেষজীবনের সেই নিদারুণ ট্রাজেডিকেই বার বার মনে পড়ে···

মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে নিওন-আলোয় সভ্যতার অগ্রগতির বিজ্ঞাপনের পাশেই ঝুলছে এক-একটি নরকঙ্কাল ···প্রতিভার অপমৃত্যুর এক-একটি মর্মান্তিক স্মরণ-চিহ্ন···

প্রতিভার অপমৃত্যুর জন্যে বারে বারে আমরা শোক করেছি··· সভা করে সেই কঙ্কালের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছি··· কঙ্কালের গলায় মালা পরাতে গিয়ে লজ্জিত বোধ করেছি কিন্তু তারপরই সব ভুলে গিয়েছি আবার···সেই লজ্জাকর অপমৃত্যু যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে তার কোন ব্যবস্থাই করি না···যুগের পর যুগ এই এক কাহিনী···

আজ শিশিরকুমারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আবার সেই কঙ্কালের গলায় সচন্দন মালা পরাতে এসেছি !

মানুষকে যে আনন্দ পরিবেশন করে, শোচনীয় নিরানন্দের মধ্যে কেন তাকে মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে ?

যদি পুরাকাল হতো, রাজার কাছে গিয়ে বলতাম, এ অপমৃত্যু তুমি রোধ করতে পারতে, কর নি, এ অপমৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী ! যে রাজার রাজ্যে শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে, সে রাজ্যে প্রজাদের বাস করা নিরাপদ নয় !

আজ রাজা নেই, আছে রাষ্ট্র···

আধুনিক রাষ্ট্র মস্তিষ্কহীন কবন্ধ···

কবন্ধের মস্তিষ্ক নেই…হৃদয়ও নেই…

কবন্ধের কাছে গরু-ছাগল-মানুষের কোন পার্থক্য নেই, কোন পার্থক্য নেই গাড়োয়ান-শিল্পীর…

সব তার কাছে সংখ্যা…

শিল্প সম্বন্ধে তার বাজেট আছে…কিন্তু একজন শিল্পী সম্বন্ধে সে নির্বিকার…

সেই একজনকে যদি কিছু পেতে হয়, বহুজনের সঙ্গে গিয়ে লাইন দিতে হবে…

বহুজনের সঙ্গে লাইন দিয়ে সবাই দাঁড়াতে পারে…একমাত্র পারে না, যে সত্যিকারের শিল্পী…

শিল্পী স্ব-তন্ত্র…

যে যন্ত্রে সব গুঁড়িয়ে তাল পাকিয়ে এক-সাইজের হয়ে যায়, সে যন্ত্রের সঙ্গে শিল্পীর চির-বিরোধ…

সে যন্ত্রও তাই শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যকে চরম ঔদ্ধত্য মনে করে…

শিশিরকুমারের গৌরব, শিল্পীর সেই চরম ঔদ্ধত্য নিয়েই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন…

মঞ্চের মাতৃ-কোল থেকে স্থানচ্যুত হয়ে শিশিরকুমার হতাশা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে মৃত্যুর দ্বারে এসে যখন পৌঁছেছেন, তখন রাষ্ট্র তার বার্ষিক উপাধি-বিতরণ তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে…

শিশিরকুমার সেই উপাধির দান প্রত্যাখ্যান করেন…

এই প্রত্যাখ্যানের ভেতর অনেকে শিশিরকুমারের দম্ভকেই দেখেছিলেন…

কিন্তু এই দম্ভের আড়ালে ছিল এক প্রচণ্ড অভিমান…

রাষ্ট্র অবশ্য কারুর ব্যক্তিগত অভিমানের কোন তোয়াক্কা রাখে না ···

কিন্তু এই অভিমান শিশিরকুমারের নিছক ব্যক্তিগত অভিমান ছিল না···

একটা সমগ্র জাতির অভিমানকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিবাদে রূপ দিতে চেয়েছিলেন···

যেদিন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে কোন নাট্য-আন্দোলন ছিল না, এমন কি একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ পর্যন্ত ছিল না, সেদিন দীর্ঘ একটা শতাব্দী ধরে এই বাঙলাদেশ, এই বাঙলাদেশের অভিনয়-শিল্পীরা সামাজিক নিন্দা ও অপাঙ্‌ক্তেয়তাকে তুচ্ছ করে বাঙলাদেশে আধুনিক রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য-সাহিত্যের জাতীয় ঐতিহ্যকে গড়ে তোলে এবং সে ঐতিহ্যের দান অভিনয়ের কৃতিত্বে এবং নাট্য-সাহিত্যের গৌরবে বিশ্বের যে কোন দেশের সঙ্গে সসম্মানে তুলনীয় হতে পারে···

একটা শতাব্দীর সেই বিরাট নাট্য-আন্দোলনকে শিশিরকুমার তাঁর নিজের একমুখী সাধনায় একটা সম্পূর্ণতায় এনেছিলেন···নিজের অভিনয়ে এবং অভিনয়-শিক্ষকতায় বাঙলাদেশে আধুনিক নাট্য-ধারার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজকের বাঙলাদেশের তাবৎ অভিনেতাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত···প্রতিভার দুরন্ত দুঃসাহসিকতায় তিনি বাঙলাদেশে নব-নাটক ও নব-অভিনয়-রীতির পথ তৈরি করে দিয়ে যান···

তাই প্রত্যেক বাঙালীর মনে আশা ছিল, স্বাধীন দেশ তাঁর এই অনন্যসাধারণ নাট্য-সাধনাকে জাতীয় সম্মান দিয়ে একটা সমগ্র জাতির শতাব্দীব্যাপী সাধনাকেই স্বীকার করবে।

শিশিরকুমারের মনেও সেই আশা ছিল, তাঁর ভেতর দিয়ে বাঙলাদেশের এই শতাব্দীব্যাপী শিল্প-সাধনা স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি পাবে···

দেশ স্বাধীন হবার দশ বছর পরে রাষ্ট্র বহু কৃতী শিল্পীর

মধ্যে শিশিরকুমারকে মাত্র একজন কৃতী শিল্পী হিসাবে স্বীকার করে…

শিশিরকুমারের বিরাট প্রতিভার এটা অবমাননা…একটা সমগ্র জাতির শতাব্দীব্যাপী শিল্প-সাধনার অবমাননা…

শিশিরকুমার শুধু একজন অভিনেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাই একটা আন্দোলন…একটা সমগ্র প্রতিষ্ঠান…একটা সমগ্র জাতির নাট্য-প্রতিভার উদ্বোধক ও ধারক…

বছরে বছরে উপাধি-বিতরণের তালিকায় এ জাতীয় প্রতিভার নাম পাওয়া যায় না…

একটা শতাব্দীতে একজনই এইরকম প্রতিভা নিয়ে আসে…

চলে গেলে, ইতিহাস আবার একশো বছর অপেক্ষা করে থাকে… কোন আকাদমী (academy) এই প্রতিভা তৈরি করতে পারে না…

আন্দোলন বলতে যে ধারাবাহিক চেষ্টা বোঝায় গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সেই রকম কোন নাট্য-আন্দোলন ছিল না…

একমাত্র ছিল বাঙলাদেশে…

গত শতাব্দীর ভারতের নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে হলে বাঙলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের কথাই লিখতে হবে…

এই বিরাট নাট্য-আন্দোলনে প্রতিভাবান্ অভিনেতারা ছিলেন, প্রতিভাবান্ নাট্যকারেরাও ছিলেন কিন্তু একটা পথ-কণ্টকের দরুন এই আন্দোলনের গতিবেগ বার বার ব্যাহত হয়েছে…

সেই পথ-কণ্টকের নাম হলো স্থায়ী মঞ্চের অভাব…

যে গুটিকতক স্থায়ী মঞ্চ অর্থাৎ থিয়েটার-গৃহ ছিল, তাদের মালিকরা ক্রমশঃ নিজেরা থিয়েটার না চালিয়ে নাট্য-সম্প্রদায়দের ভাড়া দিতে লাগলেন এবং শিশিরকুমার যখন এলেন তখন দেখতে দেখতে

এইসব থিয়েটার-বাড়ির ভাড়া এত অতিরিক্ত বেড়ে গেল যে সেই ভাড়া দিয়ে সম্প্রদায় রক্ষা করা রীতিমত দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠলো···

গত যুগের থিয়েটার-আন্দোলনের ভেতরের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাই জানেন নাট্য-পরিচালকদের সঙ্গে থিয়েটার-বাড়ির মালিকদের ঝগড়া ও মামলায় এই যুগটা কণ্টকিত হয়ে আছে···এবং এই নিত্য ঝগড়া ও মামলার ফলে নাট্য-সম্প্রদায়ের পরিচালককে বেদের মতন এক মঞ্চ থেকে অন্য মঞ্চে তাঁবু ফেলে বেড়াতে হয়েছে এবং অনেক সময় সম্প্রদায়ের সিন্-সিনারি, পোশাক-পত্র পর্যন্ত আটক পড়তো··· এই অবস্থায় মঞ্চ-শিল্পের কোন উন্নতি সম্ভব হয় নি···

শিশিরকুমারকে তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে প্রায় প্রত্যেক মঞ্চেই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে এবং তাঁর জীবনে বহুবার মঞ্চহীন হয়ে তাঁকে বিব্রত হতে হয়েছে এবং শেষকালে মঞ্চের অতিরিক্ত ভাড়া বৃদ্ধি হওয়ার ফলে মঞ্চ-দখল নিয়ে এক কুৎসিত রেষারেষি দেখা দেয় যার ফলে তিনি চির-জীবনের মতন মঞ্চচ্যুত হয়ে পড়েন···

যে সব অভিনেতা ও অভিনেত্রী গুরুজ্ঞানে তাঁকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন, একান্ত অর্থনৈতিক দুর্দশায় তাঁরাও একে একে তাঁকে ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন···গুরু ও শিষ্য উভয়ের পক্ষেই সে বিচ্ছেদ একান্ত বেদনাদায়ক ছিল। সেই নিদারুণ আর্থিক দুর্দৈবের মধ্যে নিজের-হাতের-তৈরী সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী একে একে যখন তাঁর পাশ থেকে সরে গেলেন, তখন একা যে প্রচণ্ড সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছে, সে সংগ্রাম যে দেখেছে সে জানে কি কঠিন ধাতু দিয়ে এই মানুষটি গঠিত ছিল।

সীতার ভূমিকা অভিনয় করবার জন্যে যখন প্রভাকে পেলেন না, সামান্য নাচের মেয়েকে নিয়ে আবার নতুন করে সীতার অভিনয় শেখাতে লাগলেন···এইভাবে তাঁর অভিনীত নাটকের প্রায় প্রত্যেকটি উপ-প্রধান ভূমিকা একেবারে অনভিজ্ঞ কাঁচা অভিনেতাদের নিয়ে

অসাধ্য পরিশ্রমে বার বার নতুন করে শিখিয়ে অভিনয় করতে হয়েছে।

এই দুঃসাধ্য চেষ্টার ফলে একদিকে যেমন একদল নতুন অভিনয় শিল্পী গড়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের তাগিদে অন্য মঞ্চে বা সিনেমায় সুযোগ পেলেই চলে গিয়েছেন··· অন্যদিকে অসহায় বেদনায় শিশিরকুমারকে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে উপযুক্ত নট-নটীর অভাবে তাঁর অভিনীত নাটকগুলির সামগ্রিক আবেদন ক্রমশঃ শিথিল থেকে শিথিলতর হয়ে উঠেছে···

বার বার এই ভাঙা-গড়ার ফলে অবশেষে তাঁর নিজের শরীর-মন এমন ভেঙে পড়লো যে আর নতুন কাউকে কোন ভূমিকা শেখাতে গেলে তাঁর অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠতো···একদিন অভিনয় শিক্ষকতায় তিনি জাদুকরের মতন অসাধ্য সাধন করেছেন, সে পরিশ্রম, সে কৌশল, সে শিক্ষকতার আগ্রহ ও পদ্ধতি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন অভিনেতা শিশিরকুমারের চেয়ে ঢের বড় ছিল অভিনয়-শিক্ষক শিশিরকুমার···

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম রিচার্ড যখন দেখলেন তাঁর ঘোড়া আহত হয়ে পড়ে গেল, তিনি আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, A horse, a horse, a kingdom for a horse !

সংগ্রাম যখন ঘনীভূত হয়ে এসেছে ঠিক সেই সময় মঞ্চচ্যুত হয়ে শিশিরকুমার তেমনি মর্মান্তিকভাবে আর্তনাদ করে ওঠেন, A stage, a stage for a life !

সে আর্তনাদে কেউ সাড়া দিল না···না জাতি···না জনতা···না রাষ্ট্র।

একটা অমূল্য প্রতিভাই শুধু ব্যর্থ হয়ে গেল না, ব্যর্থ হয়ে গেল ইতিহাসের একটা পরম লগ্ন···

সমসাময়িক কালে রাশিয়ায় শিশিরকুমারের মতন এক অসামান্য নাট্য-প্রতিভাধর জন্মগ্রহণ করেছিলেন···Stanislovsky···

রাশিয়ার সমস্ত বিক্ষিপ্ত নাট্য-চেষ্টাকে Stanislovsky পেশাদারী থিয়েটারের গতানুগতিকতা থেকে উদ্ধার করে নব-নাটকতার উদ্দীপনায় সমগ্র জাতিকে জাগিয়ে তোলেন···

শিশিরকুমারের জীবনের স্বপ্ন ছিল জাতীয় রঙ্গমঞ্চের সৃজনে পেশাদারী থিয়েটারের অনিশ্চয়তা ও বক্স্-অফিস-নির্ভরতা থেকে বাঙলার নাট্য-আন্দোলনকে উদ্ধার করে বাঙলায় নাটকীয়তার ঐতিহ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাবেন···

স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিনে কোন কোন রাজনৈতিক নেতা তাঁকে সে আশাও দিয়েছিলেন···স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে সেই আশ্বাস দিয়েছিলেন···

দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁর সেই আশা ফলবতী হবে, এই ছিল তাঁর সংগোপন লোভ···

শুনেছি, তাঁর কাছে নাকি প্রস্তাবও উত্থাপিত করা হয়···জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গঠিত হবে এবং তাঁর পরিচালনার ভার তাঁকেই দেওয়া হবে, কিন্তু সেই জাতীয় রঙ্গমঞ্চ হবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন···

শিশিরকুমার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন···

তার কারণ, তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, শিল্পের ওপর যেখানে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব করতে যায় সেখানে জড়-শিল্পের সৃষ্টি হয়···

রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্পে আয়োজন সব থাকে কিন্তু সে আয়োজনে প্রাণ থাকে না···সৃজনের উল্লাস থাকে না···রাষ্ট্রের স্পর্শে শিল্পের জাত মারা যায়···সেখানে শিল্পীর বদলে তৈরী হয় শিল্প-বিভাগের কেরাণী···

রাষ্ট্রের বেতনভোগী ফাইল-দুরস্ত পরিচালক হবার মতন মন, মেধা ও প্রবৃত্তি শিশিরকুমারের ছিল না···

তিনি রয়ে গেলেন চিরকালের দুর্বিনীত শিল্পী, রাষ্ট্রের আধিপত্যের সঙ্গে যাদের চির-বিরোধ···

———

মম্ ও মহর্ষি

নামটার একটু টীকা দরকার···

এখানে মম্ মানে হলো সমারসেট মম্···বর্তমান পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, ইওরোপের বুদ্ধিদৃপ্ত বিদগ্ধমনের যোগ্যতম প্রতিনিধি···

মহর্ষি মানে হলো মহর্ষি রমণ···ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের শেষতম প্রতিনিধি···

মম্ জাত-সাহিত্যিক, মহর্ষি চেতনার প্রথম দিন থেকেই সন্ন্যাসী ···যে সন্ন্যাসীকে ইওরোপ চেনে না, জানে না, চিনতেও চায় না···

জাতে ইংরেজ হলেও, মম্ মানুষ হয়েছেন ফ্রান্সে, প্যারিসে··· লেখাপড়া সম্পূর্ণ করেছেন জার্মানীতে···

তাই মানসিক গঠনের দিক দিয়ে তিনি পুরো ইওরোপীয়ান···

যদিও ইংরেজী ভাষায় তিনি লিখেছেন, কিন্তু ফরাসী রস-সাধনার ঐতিহ্যে তাঁর চেতনা পরিপুষ্ট···

ডিকেন্সের উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মোপাসাঁর নিকটতর আত্মীয়···

মোপাসাঁর মতনই তাঁর সাহিত্যের হৃদ্‌কেন্দ্রে বসে আছে নারী··· জীবনের রহস্য-লোকের সম্রাজ্ঞী···

মোপাসাঁর মতনই তাঁর সমস্ত সাহিত্যকে পরিব্যাপ্ত করে আছে ক্ষুরধার intellect-এর স্বচ্ছ নীল আলো···

এহেন মম্-এর সঙ্গে একদা দেখা হয় মহর্ষি রমণের···তখন মম্

বিশ্বের-স্বীকৃতিতে-ধন্য আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক...

অবশ্য মহর্ষি রমণের সঙ্গে তার আগে বহু ইংরেজ ও ইওরোপীয়ানের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে...তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মহর্ষির শিষ্য ও ভক্ত হয়েছেন...পল্ ব্রনটন ইতিমধ্যে ইংরেজী ভাষায় মহর্ষি সম্বন্ধে বহু লেখাও লিখেছেন...

কিন্তু সে সব রচনা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভক্ত-মানুষের অর্ঘ্য নিবেদন...ভক্ত-মানুষের দৃষ্টিকে সাধারণ মানুষ অভিভূতের দৃষ্টি বলে সন্দেহ করে...ভক্তির ভেতর দিয়ে ভক্ত তার দেবতাকেই একমাত্র পরম-দেবতা মনে করে—এবং দেবতার কাঠের পা থাকলেও দেখতে পায় না...

জাত-সাহিত্যিকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র...

রসের বিচার সাধারণ মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় বিচার... কারণ, এই রস-বিচারের আসরে বারবনিতা আর দেবতা, সাধারণ মানুষ আর অতি-মানুষ, সকলকেই একই সম্ভ্রমের আসন দেওয়া হয়...

বাইরের খোলস ভেদ করে অনায়াসে অন্তরে প্রবেশ করবার স্বতন্ত্র চাবি সাহিত্যিকের, জাত-সাহিত্যিকের থাকে...

এবং অন্তরে প্রবেশ করে জাত-সাহিত্যিক তাঁর রসের দৃষ্টিতে তৃপ্ত না হলে, দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করে বারবনিতাকে গ্রহণ করতে পারেন...অতি-মানুষকে ফেলে সাধারণ মানুষকে বন্দনা করতে পারেন...

এই চরম দুঃসাহসিকতা একমাত্র জাত-সাহিত্যিকদেরই থাকে...

কারণ, সাহিত্যিকের সাধনা হলো সেই চরম দুঃসাহসিকেরই সাধনা...

মম্ হলেন সেই দুঃসাহসিক সাহিত্যিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি...

এবং মম্-এর জীবন ও অভিজ্ঞতা এমন একটা পরিবেশে বর্ধিত হয়েছে, যেখানে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজীবনের নিগূঢ় অলৌকিকতার কোন স্থান ছিল না...

তাই যখন প্রথম শুনি, মম্-এর সঙ্গে মহর্ষি রমণের সাক্ষাৎ দেখাশোনা হয়েছিল, মহর্ষি সম্বন্ধে মম্-এর কি ধারণা হয় জানবার জন্যে মনে একটা তীব্র কৌতূহল জাগে...

অবশ্য The Razor's Edge উপন্যাসে মম্ তাঁর উপন্যাসের নায়কের চরিত্রে ভারত-সন্ন্যাসীর বৈদান্তিক প্রভাবের কথা লিখেছেন কিন্তু তা পড়ে মহর্ষি সম্বন্ধে মম্-এর প্রত্যক্ষ ধারণার কথা কিছু জানা যায় না...

সম্প্রতি কিছুদিন হলো মম্-এর প্রকাশিত শেষতম প্রবন্ধ-গ্রন্থের ভেতর মম্ এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে লিখেছেন...

মম্ বলেছেন, এই তাঁর শেষ লেখা...তিনি আর লিখবেন না...লিখলেও সে লেখা আর প্রকাশিত হবে না...

প্রসঙ্গতঃ, জগতের প্রথম থাকের সাহিত্যিকদের মতন, হাক্স্লি, রবীন্দ্রনাথ, রোলাঁ, টলস্টয়ের মতন মম্ একজন সেরা প্রবন্ধ-রচয়িতাও...

হাক্স্লির প্রবন্ধের মতন মম্-এর প্রবন্ধেরও একটা আলাদা স্বাদ আছে...

কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা...

মহর্ষি রমণ সম্বন্ধে মম্-এর এই লেখাটি যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকবেন, মম্ অত্যন্ত সযত্নে চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে পাঠক ভুলক্রমেও না সন্দেহ করতে পারেন যে তিনি সেই ভারত-সন্ন্যাসীর প্রভাবে বিন্দুমাত্র অভিভূত

হয়েছেন কিংবা তাঁর ইওরোপীয় যুক্তিবাদী বুদ্ধির বর্মে কোথাও সামান্যতম আঘাত লেগেছে !

কিন্তু মজার কথা হলো, তাঁর এই ইওরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে বজায় রাখতে গিয়ে তিনি এমন অতিরিক্ত ভাবে সতর্ক হয়েছেন যে সেই অতিরিক্ত সতর্কতার আড়ালে সুচতুর পাঠক তাঁর দ্রবীভূত অন্তরের স্পর্শ পেতে পারেন···

জনশ্রুতি আছে, কেশব সেন নাকি তাঁর ব্রাহ্মভক্তদের সামনে প্রকাশ্যভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে পারেন নি, অর্গলবদ্ধ ঘরের নির্জনতায় তিনি নাকি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন···

বিশ্বের প্রকাশ্য দৃষ্টির সামনে মম্-ও তেমনি এই ভারত সন্ন্যাসীকে নত হয়ে প্রণাম করতে পারেন নি কিন্তু তাঁর অর্গলবদ্ধ ভাষায সতর্কতার বদ্ধঘরে সেই প্রণাম নিবেদিত হয়ে আছে মনে হয়···

মম্ অসাধারণ ভাষা-শিল্পী···অন্তর-দ্রবীভূত প্রণামকে এই শিল্প-কর্মের আড়ালে পরম কৌশলে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন···

এইটুকু আড়াল তাঁর যুক্তিবাদী ইওরোপীয় মন আর ভাঙতে পারে নি···

মহর্ষি রমণ সম্বন্ধে তাঁর এই প্রবন্ধের তিনি নামকরণ করেছেন, The Saint···

এই প্রবন্ধটির দুটি অংশ আছে···একটি অংশে তিনি মহর্ষি রমণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবৃতি দিয়েছেন···অপর অংশে মহর্ষি রমণের জীবন ও সাধনার তিনি তাঁর মতন করে একটা বিবরণ দিয়েছেন···

এই দুটি অংশেই তিনি খুব সতর্কভাবে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়াকে লুকোবার চেষ্টা করেছেন…

এই সাক্ষাৎকারের ফলে মম্-এর ওপর মহর্ষির প্রভাব সম্পর্কে অনেক কাহিনী লোকমুখে সেই সময় প্রচারিত হয়…মম্ তাঁর প্রবন্ধের প্রথম অংশে সেই সব কাহিনীকে কল্পিত গুজব বলে ঘোষণা করেছেন এবং যেখানে কাহিনীর ঘটনা সত্য সেখানে তাঁর বুদ্ধিসম্মত অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন…

দ্বিতীয় অংশে, যেখানে তিনি মহর্ষির জীবনের কাহিনী বলেছেন, সেখানে তিনি চেষ্টা করেছেন নির্লিপ্ত সংবাদদাতার মতন মহর্ষি সম্বন্ধে যা দেখেছেন বা শুনেছেন তারই বুদ্ধিগ্রাহ্য একটা রিপোর্ট দিতে…

কিন্তু নির্লিপ্ত থাকবার এই সযত্ন চেষ্টার ঊর্ধ্বে তাঁর রচনার ভেতর থেকে অদৃশ্য দক্ষিণা বাতাসের মতন একটা অপূর্ব সুরভিত শ্রদ্ধার হাওয়া পাঠকের অন্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়…

বাণীহীন স্পর্শে জানিয়ে যায়, বুঝি আর নাই বুঝি, তোমাকে ভালবাসি…তুমি আছ বলে পৃথিবী সুন্দরতর…আকাশ নিত্য আলোয় ভরা…মধুময় এই পার্থিব রজঃ…

মহর্ষির সঙ্গে মম্-এর সাক্ষাৎকার মম্-এর নিজের জবানবন্দিতেই এখানে দিচ্ছি…

১৯৩৬ সালে যখন ভারতবর্ষে যাই, সঙ্গে করে নিয়ে আসি বন্ধুবর আগা খাঁর পরিচয়পত্র…

ভারতবর্ষের নেটিভ স্টেটের বড় বড় রাজা-মহারাজাদের কাছে আগা খাঁ ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে আমার

সমাদরের কোন ত্রুটি না হয়···ভারতবর্ষের যা কিছু দেখবার যোগ্য তা যেন আমি দেখতে পাই···

সমাদরের কোন ত্রুটিই হয় নি···কিন্তু তাঁরা যখন শুনলেন, আমি বাঘ শিকার করতে আসি নি, অজন্তা গুহায় যেতে চাই না, এমন কি তাজমহল দেখতেও আসি নি···আমি এসেছি ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণী, লেখক ও শিল্পী এবং ধর্মগুরুদের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁরা বিস্মিত হলেন কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্টও হলেন···এ রকম বাসনা নিয়ে তাঁদের প্রাসাদে নাকি ইওরোপ থেকে আর কেউ আসেন নি !

তাই রাজকীয় ভব্যতায় নির্দিষ্ট আয়োজন পরিহার করে তাঁরা আমার বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে আন্তরিকভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন···যার ফলে কতকগুলি অপূর্ব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার ঘটে গেল···

আমার লাইব্রেরিতে নানাজাতের বই-এর মধ্যে বারিঙ-গুল্‌ড্‌-এর লেখা, পনেরো খণ্ডে সম্পূর্ণ Lives of Saints বইটা আছে··· কাজের ভারে মন যখনই বিরাম চাইতো লাইব্রেরিতে এসে এই বই-এর যে কোন একটা খণ্ড টেনে নিয়ে পড়তে বসতাম···

প্রতিদিনের সংসারের মানুষদের সম্পূর্ণ বিপরীত এই সব সেণ্টদের অলৌকিক জীবন আমাকে নিগূঢ়ভাবে আকর্ষণ করতো··· কিন্তু সে সব মুহূর্তে কোনওদিন মনে হয় নি যে, এই জাতীয় কোন সেণ্টকে কোনদিন সশরীরে প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটবে···

ঠিক সেই সৌভাগ্যই ভারতবর্ষে এসে ঘটে গেল···

তখন মাদ্রাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি···একদল লোকের সঙ্গে নতুন পরিচিত হয়েছি···তাঁরা কৌতূহলী হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের খোঁজে আমি ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছি !

বললাম, বহু সেণ্টের জীবনকাহিনী পড়েছি কিন্তু আজও পর্যন্ত জ্যান্ত কোন সত্যিকারের সেণ্টকে দেখি নি!

—তাহলে আপনি মহর্ষির আশ্রমে গিয়ে মহর্ষিকে দেখে আসুন!

তাঁদের কাছ থেকেই মহর্ষির আশ্রমে যাবার পথের হদিসও পেলাম…

মাদ্রাজ থেকে মোটরে কয়েক ঘণ্টা গেলেই তিরুভান্নামালাই …সেখানে অরুণাচল নামে এক পুণ্য পাহাড় আছে…এখানকার লোকে সেই পাহাড়কে পুণ্য বলে জানে, কারণ তাদের বিশ্বাস গোটা পাহাড়টাই শিব-দেবতার বিগ্রহ…বছরে একদিন এই শিব-মূর্তি পাহাড় সারা ভারতবর্ষ থেকে অগণিত পুণ্য-যাত্রীদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসে…

তিরুভান্নামালাই-এ এই অরুণাচল পাহাড়ের পাদদেশেই মহর্ষির আশ্রম…

পর্যাপ্ত ধুলো আর খর রৌদ্র ভোগ করে আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলাম…

লোকমুখে শুনেছিলাম, রিক্ত-হাতে সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শনে যেতে নেই…প্রথাটা ভালই লাগলো…তাই মহর্ষিকে দেবার ন্যে এক ঝুড়ি ফল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম…

আমার আগমন-সংবাদ মহর্ষির কাছে যেতেই এক শিষ্য এসে জানালেন, আমি যেন একটু অপেক্ষা করি, মহর্ষি শিগগিরই দর্শন দিতে আসবেন…

নিজের খাবার জন্যে কিছু খাদ্যও সঙ্গে করে এনেছিলাম…সেটা মোটরেই রাখা ছিল…

ক্ষুধার্ত বোধ হওয়ায় মোটরে গিয়ে .া খাদ্য এনেছিলাম, তা খাবার জন্যে বার করলাম…

খেতে যাবো, এমন সময় হঠাৎ আমার সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেল…নিমেষের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য হয়ে ঢলে পড়লাম…

কতক্ষণ সেইরকম সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলাম, সে-সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না…যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখলাম আশ্রমের ভেতর এক কুঁড়ে ঘরে সামান্য খড়ের বিছানায় আমি শুয়ে আছি… এত দুর্বলতা বোধ করতে লাগলাম যে উঠে দাঁড়াতে পারলাম না…

মহর্ষির কাছে খবর গেল, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি এত দুর্বল হয়ে গিয়েছি যে যে-ঘরে বসে তিনি দর্শন দেন, সেখানে হেঁটে যাবার আমার শক্তি নেই…

তখুনি শিষ্যকে দিয়ে মহর্ষি বলে পাঠালেন, আমার আসবার কোন প্রয়োজন নেই…মহর্ষি নিজেই সেই কুঁড়ে ঘরে এসে আমাকে দর্শন দেবেন…

কিছুক্ষণ পরেই মহর্ষি এলেন…

দেখলাম, সাধারণ ভারতবাসীর মতন নাতিদীর্ঘ দেহ…গায়ে কোন আচ্ছাদনই ছিল না…মাথার চুল, দাড়ি একেবারে সাদা, খুব ছোট ছোট করে কাটা…গায়ের রঙ ঘন মধুর রঙের মতন…পরনে একটা খুব ছোট সাদা কাপড়…অঙ্গে আমাদের মতন কোন পোশাক বা প্রসাধন নেই বটে কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, তাঁর সর্বাঙ্গ আবৃত করে রয়েছে একটা আশ্চর্য অমলিন পরিচ্ছন্নতা…

একটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে ধীর ছন্দে ঘরে এসে ঢুকলেন…

একান্ত সহজ ভঙ্গী কিন্তু তার ভেতরই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সহজাত আভিজাত্য…

মুখে সব সময় একটা ভদ্র সহজ হাসি…

চোখের মণির সাদা অংশ রক্তের মতন লাল…

ঘরে ঢুকেই আমার দিকে চেয়ে আশীর্বাদের মতন স্বল্পভাষায় কিছু বললেন…তারপর, আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম, তার কাছেই মাটিতে বসে পড়লেন…স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিতে কয়েক মিনিট আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর আমার মনে হলো তিনি যেন আমার দিকে আর দেখছেন না…আমাকে ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি যেন

বহুদূরে চলে গেল…এ-রকম স্থির অচপল দৃষ্টি আমি আর কখনও দেখি নি…

কিছুক্ষণ পরে দেখি, তাঁর সমস্ত শরীর যেন সম্পূর্ণভাবে স্থির হয়ে গেল…

প্রায় পনেরো মিনিট মহর্ষি তেমনি নিশ্চল আমার দিকে চেয়ে বসে রইলেন…

তারপর স্নিগ্ধ হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কাছে আমার কোন বক্তব্য বা জিজ্ঞাসা আছে কি না!

উত্তরে আমি জানালাম, এত দুর্বল বোধ করছি যে আলাপ করা সম্ভব নয়!

হেসে তিনি বললেন, নীরবতাও একরকম আলাপ…

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার আগেকার মতন স্থির নিশ্চল হয়ে গেলেন…

দরজার কাছে অন্য যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরাও মহর্ষির দিকে চেয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকেন…

পরিপূর্ণ নির্বাক নীরবতার মধ্যে আরও প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেল…

তারপর মহর্ষি ধীরে উঠে দাঁড়ালেন…আমার দিকে চেয়ে হেসে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন…একটা ছোট লাঠির ওপর ভর দিয়ে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন…

মহর্ষির সেই ধ্যানসমাহিত দৃষ্টির ফলে হোক কিংবা এতক্ষণ বিশ্রাম নেবার দরুনই হোক, আমি কিন্তু রীতিমত সুস্থ বোধ করতে লাগলাম…

আশ্রমের ভেতর আর একটা ঘর আছে শুনলাম, যেখানে মহর্ষি

দিনের বেলায় বসে আলাপ-আলোচনা করেন, রাত্রিবেলা সেখানেই আবার শুয়ে থাকেন···ঠিক করলাম, সেখানে গিয়েই মহর্ষির সঙ্গে আলাপ করবো···স্বচ্ছন্দ এবং সুস্থ ভাবেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম···

সম্পূর্ণ নিরাভরণ একটা ঘর···মনে হলো, লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট হবে, চওড়ায় প্রায় তার অর্ধেক···নীচু চালের জন্যে সারা ঘরটার মধ্যে একটা আবছা-আবছা অন্ধকার ভাব···

স্বামীজী যেখানে বসে আছেন, সেখানটা একটু উঁচু-করা হয়েছে ···একটা বাঘের চামড়ার আসনে তিনি বসে···সামনে ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে···একটা ধূপ নিবে এলে, নিঃশব্দে কোন শিষ্য এসে আর একটা ধূপ জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছেন···ধূপের সে গন্ধ ভালই লাগছিল···

সামনেই মেঝের ওপর আশ্রমবাসী শিষ্যরা পা মুড়ে বসে আছেন ···কেউ কেউ দেখলাম, পুঁথি থেকে পড়ছেন, কেউ কেউ নীরবে চোখ বুঁজে ধ্যান করছেন···

বাইরে থেকে দুজন অভ্যাগত এলেন, হাতে নানারকমের ফলের ছোট টুকরি···মাটিতে নত হয়ে শুয়ে পড়ে ফলের টুকরি দুটো স্বামীজীর সামনে রাখলেন···

ঈষৎ মাথা নত করে স্বামীজী সেই উপহার স্বীকার করলেন··· নীরবে একজন শিষ্যকে ইঙ্গিত করলেন···শিষ্য ফলের টুকরি দুটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন···

তারপর মহর্ষি কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন···আলাপের পর স্নিগ্ধ হেসে তিনি নিজেই ইঙ্গিতে জানালেন যে এবার বিরতি···

নীরবে স্বামীজীকে অভিবাদন জানিয়ে অভ্যাগত দুজন ঘরের কোণে যেখানে একদল শিষ্য বসে ছিলেন, সেখানে গিয়ে বসলেন···

স্বামীজী ধীরে সমাধিস্থ হলেন…

ঘরে যাঁরা ছিলেন, প্রত্যেকেই যেন একটা স্নিগ্ধ শিহরন অনুভব করলেন…সুগভীর স্তব্ধতায় ঘরটা ভরে উঠলো…একটা বিচিত্র অনুভূতি স্পষ্ট মনের মধ্যে জেগে ওঠে, যেন সেই নিস্তব্ধ ঘরে সেই মুহূর্তে একটা বিস্ময়কর কিছু ঘটবে,—যার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকতে হয়…

কিছুক্ষণ এইভাবে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর আমি উঠে পড়লাম…পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘরের বাইরে চলে এলাম…

পরে শুনলাম, সেদিন আমার সেই সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নানা রকমের অদ্ভুত সব গল্প-কথার সৃষ্টি হয়…আমার সেই সাময়িক সংজ্ঞাহীনতার ব্যাখ্যা হিসাবে কোন গল্পে বলা হয় যে, সেই মহাপুরুষের দর্শন-আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে এত তীব্র হয় যে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি…কোন কোন গল্পে ব্যাখ্যা করা হয় যে, দর্শনের আগেই মহর্ষির শক্তির প্রভাবে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি…ইত্যাদি…ইত্যাদি…

ভারতবর্ষে থাকবার সময় বহু হিন্দু কৌতূহলী হয়ে আমাকে এই সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করেছেন…কিন্তু আমি কোন উত্তর দিই নি…শুধু হেসে ঘাড় নাড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছি…

আসল কথা হলো, এরকমভাবে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়া, সেই আমার প্রথম বা শেষ অভিজ্ঞতা নয়…ডাক্তারেরা বলেন, আমার solor plexus-ক্ষেত্রে* কোন অজ্ঞেয় কারণে অকস্মাৎ চাঞ্চল্য জেগে

* পেটের ভেতরদিকের স্নায়ু-ক্ষেত্র

ওঠে যার ফলে আমার হার্টে এসে এমন চাপ পড়ে যে বহুক্ষণের মতন আমার সব চেতনা চলে যায়···তারপর আবার আপনা থেকে জেগে উঠি···একদিন এই অচেতন-অবস্থা আরও দীর্ঘতর হবে···সেদিন আর জেগে উঠবো না···

কিন্তু মহর্ষির শিষ্যরা আমার এই ব্যাখ্যাকে সত্য বলে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না···তাঁদের ধারণায়, আমি মহাভাগ্যবান, কারণ মহর্ষির কৃপায় সেই অচেতন অবস্থার ভেতর দিয়ে নাকি আমার ব্রহ্ম-সান্নিধ্য ঘটেছিল !

তাঁরা আহত ও ক্ষুণ্ন হবেন বলে তাঁদের সামনে আর কিছু বলি নি কিন্তু মনে মনে সেদিন বলেছিলাম, এই যদি ব্রহ্ম-সান্নিধ্য হয়, তবে ব্রহ্মের সান্নিধ্যে গিয়ে তো কোন লাভ নেই !

তবে এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন আমি ভারতীয় ধ্যান-তত্ত্বে আত্মার ব্রহ্মে লীন হওয়া সম্বন্ধে কোন কটাক্ষ করছি···

আমি শুধু বলতে চাইছি, সেদিন মহর্ষির আশ্রমে আমার সেই আকস্মিক অচেতন অবস্থা নিছক একটা দৈহিক পাগলামির ব্যাপার···

কিন্তু এই ঘটনার ফলে আর এক দিক দিয়ে আমি লাভবান হলাম ···আমি মহর্ষির আশীর্বাদ-চিহ্নিত ব্যক্তি, এই ধারণায় বহু ভারতীয় বন্ধু আমার কাছে মহর্ষির জীবন ও সাধনা সংক্রান্ত নানা জাতীয় বই আর ছাপানো লেখা পাঠাতে লাগলেন···মহর্ষি সম্বন্ধে রাশীকৃত দলিল সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে আমার টেবিলে এসে জমা হলো···

তার অধিকাংশই আমি নিষ্ঠাসহকারে পড়লাম···

তার ফলে এই অ-সাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জেগে ওঠে যার জন্যে আমি আজ মহর্ষি সম্বন্ধে এই লেখা লিখতে বসেছি···

নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের এই কাহিনী বিচিত্র এবং মনকে রীতি-মত দোলা দেয়···তবে আমি যথাসম্ভব সহজভাবেই তা বলবার চেষ্টা

করেছি…এবং এই বলার মধ্যে আমার নিজস্ব কোন মন্তব্য, ব্যাখ্যা বা সমালোচনা নেই…এমন বহু ঘটনা এর মধ্যে আছে যা আমার ইওরোপীয় পাঠকদের কাছে অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে…বিশেষ করে, একটা শব্দ আমাকে বার বার হয়তো ব্যবহার করতে হবে, যার অর্থ না বুঝলে তাঁদের অসুবিধা হতে পারে…সে শব্দটি হলো, সমাধি …তাই মহর্ষির জীবনের কথা বলবার আগে, আমার ইওরোপীয় পাঠকদের জন্যে সংক্ষেপে এবং সহজে সমাধি কথাটার একটা ব্যাখ্যা দিতে চাই…

দীর্ঘকাল ধরে একটা পদ্ধতি অনুসারে ধ্যান অভ্যাস করার ফলে সমাধির অবস্থা পাওয়া যায়…

কিন্তু ধ্যান ও সমাধি এক জিনিস নয়…কোন একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ করার অভ্যাসের নাম ধ্যান…

ধ্যান আয়ত্ত হলে পর সমাধির অবস্থা আসে…এই অবস্থায় বাইরের জগৎ সম্বন্ধে মন একেবারে নিশ্চেতন হয়ে যায়…এবং এই নিশ্চেতন অবস্থায় মন বাইরের জগতের নানা বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বভাবতঃই ব্রহ্ম বা অনাদি চিরন্তন সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়…এই সংযুক্তির ফলে সমাধিস্থ ব্যক্তি জ্ঞান ও অস্তিত্বের চরম আনন্দের স্বাদ পান। ধ্যান যাঁর আয়ত্ত হয়ে যায়, তিনি ইচ্ছামাত্র এই সমাধির অবস্থায় অবস্থান করতে পারেন এবং তখন পারিপার্শ্বিক জগতের কোন বোধই তাঁর থাকে না।

কিন্তু ধ্যানের অবস্থায় ধ্যানসিদ্ধ ইচ্ছা করলে অবচেতন অবস্থার ভেতর দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ রাখতে পারেন। মহর্ষির আশ্রমে আমি দেখেছি, মহর্ষি ধ্যানস্থ বসে আছেন…তাঁর সামনে বসে তাঁর কোন শিষ্য হয়তো শাস্ত্র পড়ছেন…পড়ার মধ্যে কোন অশুদ্ধতা বা উচ্চারণের মধ্যে কোন অশুদ্ধতা ঘটলো, গভীর ধ্যানের ভেতর থেকে মহর্ষি সবাকভাবে তা শুদ্ধ করে দেখিয়ে দিতেন,—প্রত্যেক বড় সংগীত-শিল্পীর ভেতর এই ধ্যানসিদ্ধতা থাকে বলেই সহস্র বাজনার সংগতির

ভেতর থেকে একটা ছোট false noteও তাঁকে তৎক্ষণাৎ ভেতর থেকে সজাগ করে তোলে…'

ভারত-পরিভ্রমণের সময় আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, নাম-করা একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে, তিনি biologist ছিলেন, আমার আলাপ হয়…তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিদুষী আমেরিকান মহিলা। একদিন এই মহিলার সঙ্গে ধ্যান ও সমাধির বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, মাত্র দু'দিন আগে একটা ঘটনা ঘটে, আপনাকে বলছি…

…বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও আমার স্বামী প্রতিদিন নিয়মিত ধ্যানে বসেন এবং তিনি রীতিমত ধ্যানসিদ্ধ। দু'দিন আগে রেলে করে কলকাতার বাইরে কিছু দূরে আমাদের দুজনকে যেতে হয়, একটা বৈজ্ঞানিক কন্‌ফারেন্সে যোগ দেবার জন্যে…

স্টেশনে এসে দেখলাম, গাড়িতে এত ভিড় যে লোকে দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে…সারারাত এইভাবে ভিড়ে দাঁড়িয়ে যদি যেতে হয়, বৈজ্ঞানিকের বিশেষ কষ্ট হবে কারণ সকালে গাড়ি থেকে নেমেই সারাদিন কন্‌ফারেন্সের কাজে ও বক্তৃতায় তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হবে… মহা দুশ্চিন্তায় পড়লাম…

কোনরকমে একটা থার্ডক্লাস কামরায় বসবার জায়গা পেলাম… কাঠের সরু বেঞ্চি, একটু নড়বার-চড়বার জায়গা নেই…বৈজ্ঞানিক দেখি, তাতেই খুশী…

ট্রেন ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেখি বৈজ্ঞানিক একেবারে নিশ্চল হয়ে গেলেন…বুঝলাম তিনি গভীর ধ্যানের মধ্যে চলে গিয়েছেন… সারারাত আমি ছটফট করলাম কিন্তু আমার স্বামীর বিন্দুমাত্র কোন বিক্ষোভ দেখলাম না…

ভোরবেলা গন্তব্য স্টেশনে যখন গাড়ি এসে থামলো, তিনি যেন সুখ-নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন…তাঁর দেহে বা মনে কোথাও এতটুকু ক্লান্তি বা অবসাদ দেখলাম না…সারাদিন আমি অবসন্ন দেহে বিছানা

আঁকড়ে রইলাম, তিনি যথানির্দিষ্টভাবে সারাদিন ধরে কন্ফারেন্সের সমস্ত কাজের বোঝা সানন্দে বয়ে বেড়ালেন।

মাদুরা থেকে প্রায় মাইল ত্রিশ দূরে সামান্য এক গ্রামে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন···শৈশবে তাঁর নাম ছিল ভেঙ্কট-রমণ···

তাঁর বাবা সুন্দরম্ আয়ার স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ওকালতি করতেন, যদিও তিনি ওকালতি পাস করেন নি···কতকটা ইংলণ্ডের গ্রাম্য সালিসিটরদের মতন···

গ্রামে সেইজন্যে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল···তাঁদের বাড়ি থেকে কখনও কোন অতিথি বিমুখ হয়ে ফিরে যেতো না···

অতীতকালে কোন একদিন এক সন্ন্যাসী নাকি তাঁদের বাড়িতে এসে ভিক্ষা চান কিন্তু ভিক্ষার বদলে বিরূপ বচন শুনে তাঁকে ফিরে যেতে হয়···ফিরে যাবার সময় সেই সন্ন্যাসী অভিশাপ দিয়ে যান, প্রত্যেক বংশে এই বাড়ি থেকে একজন লোক সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর মতন ভিক্ষা করে বেড়াবে!

সুন্দরম্-এর আগের বংশে তাঁর এক কাকা সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন···তাঁর সময়ও তাঁর বড়ভাই সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান···তাঁরা কেউ আর ফিরে আসেন নি···

ভেঙ্কটরমণের যখন বারো বছর বয়স সেই সময় তাঁর পিতা হঠাৎ দেহরক্ষা করলেন···তাঁরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়লেন···

বিধবা জননী তিনটি বালক পুত্র ও একটি কন্যাকে নিয়ে মাদুরায় ভেঙ্কটরমণের এক কাকার আশ্রয়ে এসে উঠলেন···

সেখানে ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা হলো কিন্তু দেখা গেল ভেঙ্কটরমণের পড়ার দিকে কোন ঝোঁকই নেই···রীতিমত

অলস···রাতদিন খেলে বেড়াতে পারলেই ভাল···বিধবা জননী এই অলস ছেলেটির জন্যে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন···

ষোল বছর বয়সে হঠাৎ একদিন ভেঙ্কটরমণের চরিত্রে একটা নতুন অভিব্যক্তি দেখা গেল···কিছুদিনের জন্যে তাঁদের আত্মীয় এক ভদ্রলোক সেই বাড়িতে এসে উঠলেন···বালকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলে বালক কৌতূহলবশে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তাঁর বাড়ি কোথায় ?

ভদ্রলোক উত্তরে বললেন, অরুণাচলে ! অরুণাচল পুণ্য তীর্থ-ক্ষেত্র···পাহাড়ের নামেই জায়গার নাম···এই অরুণাচল পাহাড় শিবেরই বিগ্রহ···

হঠাৎ অরুণাচলের নাম শুনে বালকের দেহে ও মনে এক বিস্ময়কর আনন্দ জেগে উঠলো···যেন ভুলে-যাওয়া কোন প্রিয় স্মৃতি অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল···সেই একটি শব্দ বালকের চেতনার মর্মমূলে এক বিচিত্র স্পন্দন জাগিয়ে তুললো···

কিন্তু সে স্পন্দন স্থায়ী হলো না···কিছুদিন পরেই দেখা গেল অভ্যস্ত খেলাধুলার মধ্যে সে নাম আর তার আবেশ হারিয়ে গেল···

সাধারণতঃ বই পড়ার দিকে বালকের বিশেষ কোন আকর্ষণই ছিল না কিন্তু এই সময় তাঁর কাকা লাইব্রেরি থেকে বাড়িতে একটা বই নিয়ে আসেন, তামিল সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনী···এই বইটি বালকের এত ভাল লেগে গেল যে আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করে ফেললো···কিন্তু ফুটবল, কুস্তি, হাডুডুর হট্টগোলে এই বইটির কথাও বালক ভুলে গেল···

সংকটের লগ্ন এলো কয়েক মাস পরে···

ভেঙ্কটরমণের তখন সতেরো বছর বয়স···

এই ব্যাপার সম্বন্ধে মহর্ষি নিজে যা বলেছেন, তা হলো, "একদিন কাকার বাড়িতে দোতলায় একা বসে আছি···পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য তখন ···শরীরে কোন গোলমাল নেই···কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুভয় তীব্রভাবে

আমাকে পেয়ে বসলো···স্পষ্ট মনে হতে লাগলো, কিছুক্ষণ পরেই যেন মরে যাব···কেন যে মৃত্যুভয় সেদিন আমাকে সেইভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, আজও পর্যন্ত তার কোন ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই নি···এই মৃত্যুভয়ের পেছনে সত্যিকারের কোন কারণ আছে কি নেই, তা নিয়েও সেদিন বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই নি···অভ্রান্তভাবে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে কিছুক্ষণ বাদেই আমি মরে যাব···এবং মরেই যখন যাব তখন আর আমার কি করবার আছে বা করা উচিত তাই ভাবতে লাগলাম···

এ অবস্থায় ডাক্তার দেখানো অথবা আত্মীয়-স্বজনদের জানানোর কোন তাগিদই বোধ করলাম না···যা কিছু করবার আমাকে নিজেকেই করতে হবে ঠিক করলাম···

হঠাৎ সেই সময় মনে হলো, এই যে আমি মরে যাচ্ছি, একথাটার মানে কি? মানের সন্ধান করতে গিয়ে মনে এক অদ্ভুত খেয়াল হলো···মৃত্যুর অভিনয় করতে শুরু করলাম···হাত পা কাঠ হয়ে এলো···নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম···মনে হতে লাগলো, সারা দেহ হিম হয়ে আসছে···এখুনি সব স্পন্দন থেমে যাবে···তারপর? তারপর এই স্পন্দনহীন প্রাণহীন দেহটাকে আত্মীয়-স্বজনেরা শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে···আমার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে··· কিন্তু সেই সঙ্গে "আমি"ও কি পুড়ে যাব? আমি কি আমার দেহটা? এই তো আমার দেহ স্পন্দনহীন কাঠ হয়ে গিয়েছে অথচ তার ভেতর থেকে স্বচ্ছন্দে কে ভাবছে তার অমিত অস্তিত্বের স্পন্দন···ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করছি···তার বোধহয় ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই!

এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, সমস্ত মৃত্যুভয় চলে গেল··· একটা বিচিত্র আনন্দময় বোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো··· আমি ক্ষয়হীন, আমি মৃত্যুহীন!"

.কোন বই-পড়ার দরুন বালকের অবচেতন মনে যে এই চিন্তার

ধারা জেগে উঠেছিল, তা নয়···সে সময় বালক কোন বই-ই ছুঁতো না···এমন কি তার স্কুলের পাঠ্য বইও না···

সেদিনকার সেই মানসিক অভিজ্ঞতার ফলে বালকের কাছে তার স্কুলের বই আরও তিক্ত হয়ে উঠলো···আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গও আর ভাল লাগতো না···যখনই সুযোগ পেতো নির্জনে চুপটি করে ধ্যানের আসনে বসে থাকতো···

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতো···দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিচিত্র ভাবের তরঙ্গে বালকের সারা দেহমন দুলে দুলে উঠতো···অকারণে চোখ দিয়ে দরধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তো···

সম্মোহিত অবস্থায় যখন বাড়ি ফিরে আসতো, দেখতো বাড়ির অন্য ছেলেরা যথারীতি পড়াশোনা করছে···আত্মীয়-স্বজনদের শত ভর্ৎসনাতেও সে আর বই নিয়ে পড়তে বসতে পারতো না···

স্কুলেও তার জন্যে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতো···শিক্ষকদের অনুরোধ, ভর্ৎসনা, কোন কিছুতেই কিছু হলো না···ভেঙ্কট-রমণের অবাধ্যতা ও পাঠবিমুখতায় তাঁর ভাই পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো···

একদিন, তার তারিখ পর্যন্ত মহর্ষির স্মরণে আছে···১৮৯৬ সালের ২৯ অগস্ট, শনিবার···স্কুলে পড়া বলতে না পারার দরুন শিক্ষক রেগে বেঈনের ইংরেজী ব্যাকরণ থেকে একটা সমগ্র পাঠ তিনবার করে লিখে আনবার জন্যে আদেশ করলেন···

বাড়ির ছাদের এক কোণে বসে ভেঙ্কটরমণ কোন রকমে দুবার লিখলেন, তৃতীয়বারের বেলা খাতা কলম বই ফেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে বসে গেলেন···

আড়াল থেকে তাঁর ভাই তাঁর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলেন··· বইপত্র ফেলে দিয়ে তিনি যখন চোখ বন্ধ করে বসলেন, ভাই সামনে

বেরিয়ে এসে রেগে চিৎকার করে উঠলেন, ধ্যান করতেই যদি হয় তবে বাড়িতে থেকে লোক জ্বালিয়ে কি লাভ? বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেই তো হয়!

এই জাতীয় ভৎ‍্সনা এর আগে তিনি বহুবার শুনেছেন কিন্তু সেদিন সেই কথা শুনে তাঁর মন তীব্রভাবে বিচলিত হয়ে উঠলো··· সত্যিই তো, বাড়ির প্রত্যেকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে তিনি কেন প্রতিদিন এই আত্ম-প্রতারণা করে চলেছেন? বাড়িতে থাকার তাঁর কি প্রয়োজন?

একদিন অরুণাচলের নাম শুনেই তাঁর দেহমন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল···বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সংকল্প করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অরুণাচলের কথাই আবার মনে জেগে উঠলো···স্পষ্ট মনে হলো, অরুণাচল তাঁকে ডাকছে···সেই ভগবানের ডাক···

সেই মুহূর্তেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সংকল্প করলেন···কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন সেকথা বাড়ির লোকদের কাছে গোপন করতে হবে, নইলে তাঁরা হয়তো আবার তাঁকে বাড়িতে টেনে নিয়ে আসবেন···

খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন···

ভাই জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছো?

উত্তর দেন, একটা স্পেশাল ক্লাস আছে, স্কুলে যাচ্ছি!

সন্তুষ্ট হয়ে ভাই বলে, নীচে থেকে আমার নাম করে পাঁচটা টাকা নিয়ে যাও···স্কুলের মাইনেটা দিয়ে এসো!

ঠিক তখন ভেঙ্কটরমণ মনে মনে ভাবছিলেন, অরুণাচলে যাবার রেল-ভাড়াটা যদি থাকতো! মনে হলো, ঠিক এই সময় এই পাঁচ-টাকার সন্ধান যেন ভাগ্য-বিধাতারই ইঙ্গিত···

পুরানো টাইম-টেবল খুঁজে দেখলেন, তিরুভান্নামালাই-এর টিকেটের ভাড়া কত এবং কোথা দিয়ে কি ভাবে যেতে হয়···

নীচে এসে কাকীমার কাছ থেকে স্কুলের মাইনের দরুন পাঁচ টাকা নিলেন···কিন্তু পাঁচ টাকা তো তাঁর লাগবে না! তিনটে

টাকা নিয়ে বাকী দুটো টাকা একটা খামে রাখলেন···টাকার সঙ্গে খামের ভেতর ভাইকে একটা চিঠি লিখলেন,

"পিতার সন্ধানে আজ বাড়ি ছেড়ে চললাম···এটা হলো ধর্ম-অভিযান···এই ব্যাপার নিয়ে সেইজন্যে কারুরই দুঃখ করবার কিছু নেই···আমাকে খোঁজবার জন্যে যেন কোন চেষ্টা না করা হয়··· তোমার স্কুলের মাইনে দেওয়া হয় নি···মাইনের পাঁচ টাকা থেকে তিন টাকা আমি নিয়েছি, বাকী দুটো টাকা এই খামেই রইলো। ইতি···"

নাম সই-এর জায়গায় নামের বদলে শুধু গোটাকতক ফুটকি···

এই থেকে তিনি বলতে চেয়েছিলেন. আজ হতে আমার আর কোন স্বতন্ত্র নাম-সত্তা নেই···আমি নামহীন অনন্ত প্রাণ-সত্তারই একটা কণা মাত্র···

এইভাবে সেইদিনই একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনে গিয়ে টিকেট কেটে গাড়িতে উঠলেন···

সন্ধ্যার সময় গাড়ি ত্রিচিনাপল্লী স্টেশনে এসে থামলো···মনে হলো, ভীষণ খিদে পেয়েছে···খাবার জন্যে ফিরিওলাদের কাছ থেকে সামান্য কিছু ফল কিনলেন কিন্তু এক কামড় খাবার পরই মনে হলো তাঁর পেট ভরে গিয়েছে···খিদে যখন মিটে গিয়েছে, তখন আর খাবার দরকার কি ?

বাকী ফল রেখে দিলেন বটে কিন্তু মনে মনে ভাবতে থাকেন, এ কি করে সম্ভব হলো ? বাড়িতে তো রোজ দু'বেলা পেট ভরে ভাত খেতেন, তা ছাড়া সকালে বিকেলে যা হোক কিছু জলখাবার খেতেন !

ভোর তিনটে পর্যন্ত সেইভাবে ট্রেনে কেটে গেল…গাড়ি তখন ভিলুপুরম্ স্টেশনে এসে থেমেছে…এইখানে গাড়ি বদল করতে হবে…

স্টেশন থেকে বেরিয়ে তিনি অন্ধকারে বহুক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন…সকাল হতে আবার ক্ষুধা-বোধ হলো…খুঁজতে খুঁজতে একটা সরাই-খানাতে এসে ভাত খেতে চাইলেন…

হোটেলের মালিক জানালো, রান্না হতে এখন অনেক দেরি…খেতে হলে তাঁকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে !

ভেঙ্কটরমণ সরাইখানার এক কোণে নীরবে অপেক্ষা করে রইলেন…অপেক্ষা করে থাকতে থাকতে গভীর ধ্যানে সমাহিত হয়ে গেলেন…

ধ্যান যখন ভাঙলো তখন দুপুর হয়ে গিয়েছে…সরাইওলা ভাত এনে দিল…

ভাত খেয়ে উঠে দেখলেন, পকেটে মাত্র দশটা পয়সা আছে—তা থেকে দু'আনা সরাইখানাওলাকে দিতে গেলেন…

সরাইখানাওলা হেসে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কাছে আর কত পয়সা আছে ?

বালক জানালো, আর মাত্র দুটো পয়সা আছে !

—পয়সা তুমি রেখে দাও, দাম তোমাকে দিতে হবে না।

বালক অবশিষ্ট সেই দশটি পয়সা নিয়ে আবার স্টেশনে ফিরে এলো…এবং দশ পয়সায় যতদূর যাওয়া যায়, সেই পর্যন্ত একটা টিকেট কিনে আবার রেলে চড়ে বসলো…

দু'এক স্টেশন পরেই টিকেট অনু··খী বালককে নেমে পড়তে হলো…

কাছে আর একটাও পয়সা নেই…বালক রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলো…

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে বালক এক মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হলো···মন্দিরের দরজা তখনও খোলে নি···রুদ্ধ-দ্বার মন্দিরের সামনে বালক অপেক্ষায় বসে রইলো···

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের পুরোহিত এসে দরজা খুললো···পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে বালকও মন্দিরের ভেতর গিয়ে এক নির্জন কোণে বসে পড়লো···বসে থাকতে থাকতে গভীর ধ্যানের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল···

কিছুক্ষণ সেইভাবে ধ্যানস্থ থাকার পর বালকের মনে হলো সমস্ত মন্দির-চত্বর যেন আলোয় ভরে উঠেছে···চোখ খুলে চেয়ে দেখতেই সে-আলো মিলিয়ে গেল···

পূজা-পাঠ শেষ করে পুরোহিত দেখে, বালক তেমনি চোখ বন্ধ করে নিশ্চল বসে আছে···মন্দিরের দরজা বন্ধ করে পুরোহিতকে তখুনি আর এক মন্দিরে পূজার জন্যে যেতে হবে, তাই ডাকাডাকি করে বালককে জাগিয়ে তুললো···

—ওঠো, চলো, মন্দিরের দরজা বন্ধ করতে হবে !

বালক জানায়, খিদে পেয়েছে, যদি কিছু খেতে দিতে পারেন !

—খেতে দেবার মতন কোন কিছু এখানে নেই !

—তাহলে এখানে আমাকে থাকতে দিন !

—সে সম্ভব নয়, কারণ মন্দিরের দরজা বন্ধ করে যেতে হবে···এখুনি আর এক মন্দিরে গিয়ে আমাকে পুজো সারতে হবে···অতএব পথ দেখো···

বালক নিঃশব্দে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে···

দ্বিতীয় মন্দিরে পূজা-পাঠ সেরে উঠে পুরোহিত দেখে, বালক সেখানেও তাকে অনুসরণ করে এসেছে···

পুরোহিত খেপে ওঠে, আমরা খেতে পাই না, তোমাকে খেতে দেবো কোথা থেকে ? ভাল চাও তো বিদেয় হও !

কিন্তু সেই মন্দিরে যে লোকটা ঘণ্টা বাজাতো, বালকের দিকে চেয়ে তার দয়া হলো···বললে, আমার ভাত আছে, তুমি খেতে পার ! এসো আমার সঙ্গে···

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এক থালা ভাত দিল···শুধু ভাত আর এক ভাঁড় জল···তাই খেয়ে বালক সেখানেই এক ধারে শুয়ে পড়লো এবং শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল···

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন ভোর হয়ে এসেছে···বালক আবার হাঁটতে শুরু করে কিন্তু বেশী দূর যেতে পারে না···খিদেয় শরীর অবসন্ন হয়ে আসে···

হঠাৎ মনে পড়লো, তার কানে একটা সোনার মাকড়ি আছে তো ! সেটা বেচে তো কিছু পয়সা পেতে পারে ! কিন্তু কোথায় বেচবে ?

সাহসে ভর করে বালক একটা বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো··· বাড়ির কর্তার হাতে কানের মাকড়িটা খুলে দিয়ে বললো, সে তিরুভান্নামালাই যাবে, সঙ্গে একটাও পয়সা নেই ·এই মাকড়ির বদলে যদি তিনি কিছু দেন !

ভদ্রলোক মাকড়িটা নিয়ে দেখলেন, তাতে একটা দামী পাথরও বসানো আছে···দাম অন্ততঃ টাকা কুড়ি হবে···কিন্তু বালককে ঠকাতে ভদ্রলোকের মন চাইলো না···বললেন, তোমাকে আমি চারটে টাকা দিচ্ছি আর এই মাকড়িটার দরুন একটা রসিদ দিচ্ছি···রসিদটা নিয়ে এলেই মাকড়ি ফেরত দিয়ে দেবো !

তাতে সন্তুষ্ট হয়ে বালক মাকড়ির বদলে চারটে টাকা আর রসিদ নিয়ে সোজা স্টেশনের দিকে চললো···পথে রসিদটা ছিঁড়ে ফেলে দিল···মাকড়ি ফিরিয়ে নিতে কে আর আসবে ?

স্টেশনের কাছে কোন হোটেলে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে বালক

টিকেট কিনে তিরুভান্নামালাই-এর গাড়িতে চেপে বসলো···আর কোন ভয় নেই, এবার সে নিশ্চয়ই অরুণাচলে গিয়ে পৌঁছবে··· অরুণাচল-শিবের সামনে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবে!

তিরুভান্নামালাই স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াতেই বালকের নজরে পড়ে, অদূরে অরুণাচল পাহাড়···

জয় অরুণাচল-শিব!

বালকের সারা দেহে এক বিচিত্র আনন্দের স্পন্দন জেগে ওঠে··· বালক দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করে···

অরুণাচল-শিবের মন্দিরের সামনে এসে দেখে, মন্দিরের দরজা খোলা···নিঃশঙ্কচিত্তে বালক ভেতরে ঢোকে···চারদিক নিস্তব্ধ··· কোথাও কোন সাড়া নেই···মন্দিরের ভেতর পূজারী বা দর্শক কেউই নেই···

চত্বর পেরিয়ে, নাটমন্দির পেরিয়ে বালক মন্দিরের গর্ভগৃহে একেবারে অরুণাচল শিবের লিঙ্গমূর্তির সামনে এসে দাঁড়ায়···মাটিতে লুটিয়ে শিবের কাছে আত্মনিবেদন করে, তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি না, হে শিব, তুমি আমাকে গ্রহণ কর!

নিজেকে নিবেদন করে বালক মন্দির ছেড়ে শহরের দিকে চললো ···পথে এক পুষ্করিণী দেখে কাপড়-জামা খুলে জলে ভাসিয়ে দিল··· কাপড়টা ছিঁড়ে মাত্র এক টুকরো নিয়ে কোন রকমে নগ্নতাকে ঢাকলো···

হাঁটতে যাবে, দেখে একজন লোক তাকে লক্ষ্য করছে···লোকটি কাছে এসে বলে, মাথা মুড়াবে না?

বালক আনন্দে সম্মতি জানায়···পকেট থেকে ক্ষুর বার করে লোকটি মাথা নেড়া করে দিল···

হঠাৎ বালকের নজরে পড়ে, ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন-স্বরূপ তখনও গলায় যজ্ঞোপবীত রয়েছে···কিসের জন্যে এই ব্রাহ্মণত্বের স্বাতন্ত্র্য? যজ্ঞোপবীত খুলে জলে ফেলে দেয়···

নাপিত বলে, মাথা নেড়া করলে, স্নান করবে না ?

কি হবে এই দেহকে স্নান করিয়ে ?

মুণ্ডিতমস্তক কৌপীনবস্ত বালক আবার অরুণাচল মন্দিরের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে…মন্দিরে ঢুকতে যাবে এক পসলা বৃষ্টি এসে বালকের সর্বাঙ্গ ধুয়ে দিয়ে গেল…

অরুণাচল-শিবের দিকে মুখ করে বালক সেই জনহীন মন্দিরের বারান্দার একধারে নিস্তব্ধ হয়ে ধ্যানে বসলো…বাক্যহীন, মৌনী…

পরের দিন একজন স্ত্রীলোক পুজো দিতে এসে দেখে, জনহীন মন্দিরের বারান্দায় অপূর্ব-দর্শন এক কিশোর নিশ্চল ধ্যানে বসে আছে…

অনেক ডাকাডাকির পর তরুণ তপস্বী চোখ মেলে চেয়ে দেখলো …কিন্তু কোন কথা বললো না…

স্ত্রীলোকটি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে কিন্তু কোন উত্তরই পায় না… বুঝলো, তরুণ তপস্বী মৌন-ব্রত নিয়েছেন…

স্ত্রীলোকটির কি মনে হলো, সামান্য কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে এনে তরুণ তপস্বীর সামনে রেখে গেল…

পরের দিন স্ত্রীলোকটি আবার এলো…দেখলো, তার-দেওয়া খাদ্য তপস্বী গ্রহণ করেছে…

প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্ত্রীলোকটি কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে রেখে যায়…তাতেই তপস্বীর ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটে…

কিন্তু বিপত্তি হলো, ব্যাপারটা একদল দুষ্ট ছেলের নজরে পড়লো …প্রতিদিন খাবার হাতে মন্দিরে যেতে দেখে কৌতূহলী বালকের দল স্ত্রীলোকটির অনুসরণ করে মন্দিরে এসে দেখলো, তাদেরই সমবয়সী একটি ছেলে জনহীন মন্দিরে চোখ বন্ধ করে বসে আছে…

এ দৃশ্য তারা সহ্য করতে পারলো না…চিৎকার করে, নানা-রকমের শব্দ করে কিশোর তপস্বীর ধ্যান ভাঙবার চেষ্টা করতে

লাগলো···যখন তাতেও কোন সুবিধা হলো না, তখন তারা ঢিল-পাটকেল, ধুলো-কাদা ছুঁড়তে আরম্ভ করলো···

এই প্রেত-উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে মৌনী কিশোর খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলো, সেই মন্দিরের ভেতর একটা অন্ধকার গর্ভগৃহ রয়েছে···ভুলেও সেখানে এক কণা আলো কখনও ঢোকে না···ভিজে স্যাতসেতে ঘন অন্ধকার···সেই আলোহীন বায়ুহীন ঘন অন্ধকারের গর্তে বালক আবার ধ্যানস্থ হয়ে বসলো···নিশ্চিন্ত··· এখানে আর কেউ খাবার দিতেও আসবে না···কেউ ঢিল ছুঁড়তেও আসবে না···

কিন্তু উপদ্রবকারী বালকদের উৎসাহ তাতে কমে না···তাদের শিকার এই মন্দিরের ভেতরই কোথাও লুকিয়ে আছে, এই ধারণায় তারা রোজ এসে একবার করে সরবে খুঁজে যায়···

ব্যাপারটা একজন বৃদ্ধ সাধুর নজরে পড়লো···কিছুদিন হলো তিনি সেই মন্দিরেই বসবাস করছিলেন···চেলাদের বললেন, খুঁজে দেখ তো, মন্দিরের ভেতর কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কি না!

চেলারা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন সেই অন্ধকার গর্ভগৃহের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে···গর্তের ভেতর থেকে একটা পচা ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধ আসছে!

আলো নিয়ে এসে তারা দেখে, সেই অন্ধকার গর্তের ভেতর অসাড় পড়ে আছে এক কিশোর···কিশোরের সর্ব অঙ্গ ভরে গিয়েছে রক্তস্রাবী ক্ষতে···অন্ধকারের যাবতীয় সরীসৃপ নিশ্চিন্ত মনে সেই সব ক্ষতস্থানে বসে পরমানন্দে রক্ত আর গলিত-মাংস লেহন করে চলেছে···যার দেহকে নিয়ে এই ভোজ-সভা বসেছে, তার মুখে কোন কথা নেই···কোন বেদনার অভিব্যক্তি নেই···বিন্দুমাত্র অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রতিবাদ নেই!

সেই অসাড় দেহকে একটা ঝুড়ির ভেতর বসিয়ে তারা এক

নিরাপদ মন্দিরে নিয়ে এলো···সেখানে এক সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ বালকের তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন···

যেখানে এনে বালককে বসিয়ে দেওয়া হলো, বালক সেইখানেই বসে রইলো···কোন কথা বলে না, কিছু চায় না···মাঝে মাঝে ধ্যান ভেঙে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে যায়···সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে জোর করে মুখের মধ্যে খাবার পুরে দেন ···ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অধিকাংশ খাদ্যই পড়ে পড়ে যায়···ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দেন···যার দেহ সে অসাড় বসে থাকে···

এই ভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবার পর বালক একদিন নিঃশব্দে সেখান থেকে উঠে কাছেই এক বনের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নিল যাতে কেউ আর তার সন্ধান না পায়···যার জন্যে কিশোর ঘর ছেড়ে, সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, সে যদি বিভু নারায়ণ হয়, যদি সর্বত্রই তার অস্তিত্ব থাকে, তবে নির্জনতা কোথায়? কি ভয় নির্জনতাকে?

গভীর বনাঞ্চলে, যেখানে মানুষ আসবার কোন সম্ভাবনাই নেই, কিশোর তপস্বী সংগোপনে সেই জনহীন নির্জন বনের গভীরে গিয়ে আশ্রয় নেয়···মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে-পড়া শিশুর মতন পদ্মাসনে ধ্যানের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয় আবার···

এই বনে ভেঙ্কটরমণ প্রায় ছ' মাস নির্জনবাস করলেন। পলনীস্বামী শহরের লাইব্রেরি থেকে তামিল ভাষায় লেখা বেদান্তের বই সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। সেই সব বই পড়ে তাঁর কোথাও দুরূহ বোধ হতো না। অপরাহ্ণে যাঁরা তাঁর কাছে এসে বসতেন, তিনি তাঁদের বেদান্তের তত্ত্ব সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলতেন। তাঁরা প্রশ্ন করতেন, তিনি উত্তর দিতেন। প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে অনেক সময় অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত থাকতেন, কিন্তু ভেঙ্কটরমণের সহজ ব্যাখ্যা ও উত্তরে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। কোথা থেকে কি ভাবে তিনি

সেই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারতেন না···

ভক্তদের দল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী ঠিক করলেন, এই ভিড়ের সংস্রব ত্যাগ করতে হবে। একদিন সংগোপনে সেই বন ত্যাগ করে তিনি কাছেই আর এক বনের ভেতর এক পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। তিনি সংকল্প করলেন, তিনি দেখবেন তিনি একাকী, সম্পূর্ণ একাকী বাস করতে পারেন কি না···

এই বন ত্যাগ করবার পর একদিন পলমীস্বামীকে তাঁর সংকল্পের কথা জানিয়ে আবেদন করলেন, চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে আপনার ওপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে, সেটা ভাল নয়। আপনি আপনার পথ দেখুন। আমাকে আমার নিজের পথে চলতে দিন। প্রতিদিন আমাদের দেখাশোনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

একান্ত মর্মাহত হয়ে পলমীস্বামী বন ছেড়ে চলে গেলেন কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই প্রবীণ ভক্ত তরুণ গুরুর সামনে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন,···

—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? আমি জানি তোমার কাছে আছে জীবনের বাণী···তা থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না!

তরুণ সন্ন্যাসী সেই কাতর আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তাঁর কাছে থাকবার যে অনুমতি দিয়েছিলেন সেদিন, পলমী-স্বামী যতদিন বেঁচে ছিলেন সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পলমীস্বামী রমণস্বামীর পুণ্য সঙ্গ ত্যাগ করেন নি···

কিন্তু পুণ্যার্থীরা তাঁকে সহজে রেহাই দেয় নি···পাহাড়ের ভেতর যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতেন সেখানেই তারা গিয়ে জড়ো হতো। তাদের এই দৃষ্টি-লালসা থেকে স্বামীজীকে রক্ষা করবার জন্যে পলমীস্বামীকে সদাসর্বদা জাগ্রত থাকতে হতো। অবশেষে স্বামীজী অরুণাচল পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় আত্মসংগোপনের

একটা সুন্দর জায়গা পেলেন…প্রকৃতি স্বামীজীর জন্যে জায়গাটিকে যেন সাজিয়ে রেখেছিল…পাহাড়ের গায়ে একটা লুকানো গুহা… গুহার বাইরে বহমান একটা ঝরনা…নিভৃত এক কোণে ঈশ্বরের এক উপাসনা বেদী…

ভেঙ্কটরমণ রোজ এক সময় এই পর্বতচূড়া থেকে নেমে গ্রামাঞ্চলে ভিক্ষা করতে বেরুতেন…দিনের মতন ভিক্ষা জুটে গেলে আবার পর্বতচূড়ায় ফিরে আসতেন…

ভেঙ্কটরমণ যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যান, বাড়ির লোকেরা ব্যাকুল হয়ে চারদিকে তাঁকে খুঁজে বেড়ান, কিন্তু দু'বছরের মধ্যে কোন নির্ভরযোগ্য খবরই পান নি…

বছর দুই পরে একদিন এক তরুণ আত্মীয়ের মুখে তাঁরা খবর পেলেন যে তিরুভান্নামালাই-এ নাকি একজন তরুণ সন্ন্যাসী থাকে যার কথা প্রবীণ সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে উচ্চারণ করে থাকেন… অনুসন্ধান নিয়ে তাঁরা জানতে পারলেন, সেই তরুণ সন্ন্যাসী গৃহ-পলাতক তাঁদের আত্মীয়…

কালবিলম্ব না করে স্বামীজীর কাকা তিরুভান্নামালাই-এ এলেন কিন্তু কোথাও সেই তরুণ সন্ন্যাসীকে খুজে বার করতে পারলেন না…অবশেষে সেই পাহাড়ের গায়ে এক আমবাগানে খবর পেলেন, ভেতরে একজন তরুণ সন্ন্যাসী আছেন কিন্তু কারুর সঙ্গেই দেখা করেন না। বহু সাধ্য-সাধনার পর তিনি ভেঙ্কটরমণ স্বামীর কাছে একটা চিঠি পৌঁছে দিতে একজনকে রাজী করালেন…উত্তরে সাধু এসে যখন তাঁকে বাগানের ভেতর নিয়ে চললো, আনন্দে তাঁর মন উথলে উঠলো…ভেঙ্কটরমণ তাহলে তাঁদের ভোলে নি!

তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখেই তিনি চিনতে পারলেন এবং বহু কাতর অনুনয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরে যাবার অনুরোধ করলেন… বাড়ির কাছেই কোন যোগ্য জায়গায় তাঁরা তাঁর সাধনার উপযুক্ত

জায়গা ঠিক করে দেবেন এবং তাঁর উপাসনা কার্যে কোন ব্যাঘাত হবে না···

বহুক্ষণ একান্ত অনুরোধ করার পর তিনি উত্তরের জন্যে ভেঙ্কটরমণের দিকে চেয়ে রইলেন···কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসী না কথায়, না মুখের ভঙ্গীতে কোন জবাবই দিলেন না···যেন তিনি কোন কথাই শুনতে পান নি !

রেখাহীন সেই নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে তিনি উঠে পড়লেন···

মাদুরায় ফিরে এসে তিনি তরুণ সন্ন্যাসীর জননী আলাগাম্মালের কাছে তাঁর অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা সব জানালেন··· কিন্তু আলাগাম্মালের মাতৃহৃদয় পরাজয় মানতে রাজী হলো না··· তাঁর বিশ্বাস হলো, প্রত্যেক মা যে ভাবে বিশ্বাস করেন···তিনি যদি একবার পুত্রের সামনে গিয়ে আবেদন করতে পারেন, পুত্র কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না···

বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আলাগাম্মাল তিরুভান্নামালাই-এ এসে উপস্থিত হলেন···

তাঁর সৌভাগ্য সন্ন্যাসীপুত্রকে পাড়াময় খুঁজে বেড়াতে হলো না···

পাহাড়ের চূড়ার দিকে যাবার সময় দেখেন, তাঁর নাবালক পুত্র পথের ধারে একটা পাথরের ওপর ধ্যানস্থ বসে আছে···

পরনে নেংটি···সারা গা ধুলোয় ভরা···মাথায় জটা···জীর্ণশীর্ণ দেহ···ছেলেকে দেখে মার অন্তর হাহাকার করে উঠলো···

—ফিরে চল্ বাছা আমার সঙ্গে !

কিন্তু সন্ন্যাসী পুত্রের মুখে কোন রেখা পর্যন্ত ফুটে উঠলো না···

ঘণ্টার পর ঘণ্টা জননী আবেদন করে চলেন কিন্তু যাকে আবেদন করছেন সে যেন পাথরের মূর্তি···নিঃশব্দে উঠে চলে যায়···

এই রকম ভাবে দিনের পর দিন আলাগাম্মাল আবেদন করে চলেন কিন্তু সে মহানীরবতায় একটা তরঙ্গও জাগল না···

বড় ছেলের ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে আসে···আলাগাম্মালকে আজ ফিরে যেতে হবে···নিরুপায় হয়ে তিনি ভেঙ্কটরমণের ভক্তশিষ্যদের কাছে করজোড়ে নিবেদন করেন, অন্ততঃ হাঁ কিংবা না একটা কথা তিনি ছেলের মুখ থেকে শুনতে চান···যদি তাঁর হয়ে কোন শিষ্য গুরুকে আবেদন করেন !

ভক্তদের মধ্যে শুধু একজন তরুণ সন্ন্যাসী মার হয়ে আবেদন জানালো···

তরুণ গুরু নীরবে সব শুনলেন, তারপর একটা কাগজ নিয়ে তামিল ভাষায় লিখলেন, অতীত জীবনের কর্ম অনুসারে ভাগ্য-বিধাতা প্রত্যেকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেন। যা ঘটবার নয়, তা কিছুতেই ঘটবে না, যত কেন চেস্টা তুমি কর। যা ঘটবে তা পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে এবং তা ঘটবেই, তুমি যত প্রতিরোধ করবার চেষ্টা কর না কেন। অতএব একমাত্র পথ হলো, নীরবে সব স্বীকার করে নেওয়া।

ব্যর্থ হয়ে আলাগাম্মাল ফিরে এলেন···

কিন্তু ভক্তদের ভিড় আবার বাড়তে লাগলো···ভেঙ্কটরমণ এক গুহা থেকে আর এক গুহায় ঘুরে বেড়ান···ভক্তরাও তাঁকে ঠিক খুঁজে বার করে···প্রথা-অনুযায়ী তারা ফলমূল, মিষ্টান্ন নিয়ে সাধু-দর্শনে আসে···এই একতরফা দান গ্রহণ করতে সাধুর অন্তর সায় দেয় না···তাই প্রতিদানে ভক্ত-অতিথিদের কিছু দেবার জন্যে তিনি শিষ্যদের শহরে ভিক্ষায় পাঠান···ভিক্ষা করে তারা যা সংগ্রহ করে আনে তাই থেকে অতিথিদের প্রতিদানে কিছু-না-কিছু দেওয়া হয়···ভক্তরা প্রতিবাদ করেন, কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্টও হন··· তাঁদের মুখে মুখে এই বিচিত্র মৌন সাধুর কথা ও খ্যাতি ক্রমশঃ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে···

ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ধনী ছিলেন এবং সাধু-বাবার জন্যে তাঁরা রীতিমত খরচ করতে রাজী ছিলেন···টাকার তোড়া এনে

তাঁর পায়ের কাছে প্রণামীস্বরূপ রাখতেন কিন্তু স্বামীজী সে টাকা স্পর্শ করতেন না এবং তুলে না-নেওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত অশ্বস্তি বোধ করতেন, বিরক্ত হতেন···

কেউ কেউ দুরূহ কোন শাস্ত্রের বই নিয়ে আসতেন···স্বামীজীর বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে স্বামীজীকে ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করতেন···স্বামীজী অবলীলাক্রমে সেই সব দুরূহ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করে শোনাতেন এবং অনর্গল সেই শাস্ত্র থেকে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করতেন যেন সমগ্র শাস্ত্রটি তাঁর কণ্ঠস্থ···লোকে মহাবিস্মিত হয়ে ফিরে যেতো···

আগেই বলেছি স্বামীজী স্কুলে তেমন কিছুই পড়াশোনা করেন নি কিন্তু সাধন-পথে আসার সময় তাঁর ভেতর এক অসাধারণ স্মৃতিশক্তি বিকশিত হয়ে ওঠে···যে কোন বই একবারমাত্র পড়লেই তিনি অনায়াসে তা আবৃত্তি করে বলতে পারতেন···এই ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-সম্পদ আয়ত্ত করে ফেলেন···

প্রতিদিন নানা ধরনের লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো··· কেউ আসতো ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্যের জন্যে, কেউ আসতো সাংসারিক বিপদ-আপদ থেকে সহজে মুক্তি পাবার আশায়, মহাপুরুষ ইচ্ছা করলে স্পর্শমাত্র সব বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারেন এই ধারণায়··· কেউ কেউ আবার আসতো আত্মিক সমস্যা সমাধানের জন্যে··· কারুর কারুর বিচিত্র দর্শন ও অভিজ্ঞতা হতো···

মাদ্রাজ সরকারের রেভিন্যু ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন পিল্লাই ···শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত এবং দায়িত্বশীল বলা চলে···

একদিন স্বামীজীর কাছে বসে থাকতে থাকতে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, একটা জ্বলৎ জ্যোতির্মণ্ডল স্বামীজীকে ঘিরে রয়েছে···প্রভাত সূর্যের রক্তচ্ছটায় স্বামীজীর সর্বাঙ্গ ঝলমল করছে···

ইছাম্মল···হতভাগিনী···প্রথম যৌবনেই স্বামী ও একমাত্র

সন্তানকে হারিয়েছে···অন্তরকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবা করে বেড়ায়···তাঁদের কাছে অন্তরের বেদনা নিবেদন করে কিন্তু কেউই ইছাম্মলের অন্তরের দাবাগ্নি প্রশমিত করতে পারে না···

অবশেষে একদিন ইছাম্মল শুনলো, অরুণাচল পাহাড়ে এক তরুণ সন্ন্যাসী থাকেন···মৌনী···বিশ্বাস নিয়ে যাঁরা তাঁর কাছে যান, তাঁরা সে বিশ্বাসের যোগ্য মূল্য পান···

ইছাম্মল অরুণাচলে গিয়ে তরুণ সন্ন্যাসীর কাছে অন্তরের রিক্ততার কথা নিবেদন করবার জন্যে উপস্থিত হলো···তরুণ সন্ন্যাসীর সামনে অকপট চিত্তে নিজের জীবনের অসহায় রিক্ততার কথা অনর্গল বলে চলে···কিন্তু সন্ন্যাসীর মুখ থেকে হাঁ কিংবা না কোন কথাই বেরোয় না···মুখের রেখায় সামান্য কুঞ্চনও দেখা যায় না···

হঠাৎ ইছাম্মলের মনে হলো মনের ভেতর এতদিন যে গুরু ভার বহন করেছিল, যেন সহসা তা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে···যেন বিশেষভাবে তার কোন শোক নেই, দুঃখ নেই···

সেই বিচিত্র অনুভূতিতে ইছাম্মল অভিভূত হয়ে পড়ে···সেই দিন থেকে তাকে আশ্রমের রান্নাঘরের ভার দেওয়া হয় এবং বহু বহু বৎসর ধরে আনন্দে সে দায়িত্ব সে পালন করে চলে···

তখনও পর্যন্ত আশ্রমিকাদের জন্যে স্থায়ী কুটীর তৈরী হয় নি··· কাজ সেরে ইছাম্মল পাহাড়ের নীচে তার কুটীরে চলে যেতো আবার প্রভাতে কাজ করবার জন্যে পাহাড়ে উঠে আসতো···

একদিন সকাল বেলা যথারীতি রান্না করবার জন্যে অরুণাচলের চূড়ার দিকে এগিয়ে আসছে, হঠাৎ কানে এলো পাশে গুহায় দুজন কথা বলছে, এখানেই যদি তাকে পাওয়া যায়, পাহাড়ের চূড়ায় যাবার কি দরকার ?

কৌতূহলী হয়ে ইছাম্মল গুহার কাছে এসে দেখে স্বয়ং স্বামীজী এই কথাগুলো একজন নতুন সন্ন্যাসীকে বলছেন···

সেখানে আর না দাঁড়িয়ে ইছাম্মল পাহাড়ের চূড়ায় তার নির্দিষ্ট রান্নাঘরে চলে এলো…দেখে, রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীজী পূর্ব-দৃষ্ট সন্ন্যাসীকে সেই একই কথা বলছেন, এখানেই যদি তাকে (মানে আমাকে) পাওয়া যায়, কষ্ট করে পাহাড়ের চূড়ায় আসবার কি দরকার ?

কৌতূহলী হয়ে ইছাম্মল পাহাড়ের নীচের দিকে চায়, কাউকে দেখতে পায় না…ঘাড় ফিরে সামনের রান্নাঘরের দিকে চায়…দেখে, কেউ কোথাও নেই !

স্বামীজীর প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে বহু পণ্ডিত ও গুণী লোক নিঃশেষে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন…তাঁদের মধ্যে স্বনামখ্যাত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য…সে যুগে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেক কাব্য ও টীকা গ্রন্থ রচনা করেন…

তীর্থ থেকে তীর্থ সারা ভারতবর্ষ তিনি ঘুরে বেড়ান…যেখানেই যান বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কিন্তু কোথাও তিনি অন্তরের শান্তি পান না…অবশেষে অরুণাচলে এসে সেই তরুণ সন্ন্যাসীকে গুরু বলে স্বীকার করে নিলেন…বৃদ্ধ শিষ্য, তরুণ মৌনী গুরু…অন্তর এমন আনন্দ-রসে ভরে গেল যে তীর্থ-পরিক্রমা ভুলে, মনোরম তীর্থ দেবতাদের ভুলে একাদিক্রমে সাত বছর তাঁর কাছে থেকে গেলেন…

প্রসঙ্গতঃ তিনি স্বামীজীকে নিয়ে বহু কবিতা রচনা করেন এবং এই সব কবিতার ভেতর দিয়ে তিনিই প্রথম ভেঙ্কটরমণ নামের পরিবর্তে রমণ মহারাজ নামের প্রবর্তন করেন এবং তাঁরই প্রেরণায় আশ্রম-ভক্তরা তাঁকে ভগবান মহর্ষি রমণ নামে অভিহিত করতে থাকেন।

শাস্ত্রীর নিজের অনেক শিষ্য ছিল কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনে কোন্

শান্তি ছিল না। একদিন শিষ্যসমেত তিনি অরুণাচলে মহর্ষি রমণের সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হন এবং তাঁকে দেখে তাঁর অন্তরে বিচিত্র এক আনন্দরসের উদ্বেল হয়···মাটিতে লুটিয়ে তিনি মহর্ষি রমণকে প্রণাম করেন এবং সেই দিন থেকে তিনি সাত বছর ধরে অরুণাচল আশ্রমে বাস করেন।

এক সময় একদিন তিনি তিরুভোণ্ডুয়ুর নামে এক পাহাড়ে পরিত্যক্ত গণেশ মন্দিরে প্রায়শ্চিত্ত সাধনার জন্যে যান। তিনি আঠারো দিনের মৌন ব্রত অবলম্বন করেন। আঠারো দিনের দিন তিনি দেখেন যখন গণেশ বিগ্রহের সামনে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করছেন তাঁর পাশে রমণ মহারাজ এসে বসলেন এবং তাঁর মাথা বুকের কাছে টেনে নিয়ে ঘন আশীর্বাদ করলেন···

মহর্ষি রমণ তিরুভান্নামালাই-এ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবার পর কোনদিন ওই স্থান ত্যাগ করে কোথাও আর যান নি···কোন দিন তিনি তিরুভোণ্ডুয়ুরের পরিত্যক্ত গণেশ গুহাতেও যান নি। একদিন গণপতি শাস্ত্রী গণেশ মন্দিরে তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনের গল্প বলছিলেন··· তাঁর কথা শুনে মহর্ষি বললেন, কয়েক বছর আগে আমি এখানে গুহায় শুয়েছিলাম···কোন রকম সমাধিস্থ ছিলাম না···হঠাৎ মনে হলো আমার দেহ ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে···চারদিকে শুধু বস্তুর স্তূপ ···আলোর পুঞ্জ···ক্রমশঃ দেহ নীচের দিকে অবতরণ করতে লাগলো ···একটু আধটু করে চারদিকের জিনিসপত্রের রেখা ফুটে উঠতে লাগলো···মনে হলো আমি তিরুভোণ্ডুয়ুয়ের গণেশ মন্দিরে নেমেছি··· সোজা মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়লাম এবং লোকজন দেখে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলাম···তবে কি সব কথা বলেছি তা মনে নেই···

মহর্ষির বর্ণনা শুনে গণপতি শাস্ত্রী স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, ব্রত-উদ্‌যাপনের দিন তিনি গণেশ মন্দিরে সেদিন প্রত্যক্ষ ভাবে মহর্ষির আশীর্বাদ ও সঙ্গ পেয়েছিলেন···

কালক্রমে, মহর্ষিকে কেন্দ্র করে একটা আশ্রম গড়ে উঠলো। মহর্ষি নিজে কারুর কাছ থেকে কোন অর্থ-সাহায্য নিতেন না···মহর্ষির মা আলাগাম্মাল শেষ বয়সে অসহায় অবস্থায় পুত্রের কাছে বাস করতে এলেন···একজন ধনী ভক্ত তাঁর জন্যে একটা কুঁড়ে ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন···এই ভাবে ধনী ভক্তদের দানে গোটাকতক কুঁড়ে ঘর ইতস্ততঃ গড়ে উঠলো···দেখতে দেখতে আলাগাম্মালের সমাধিকে বেষ্টন করে একটা মনোরম আশ্রম গড়ে উঠলো। বহু ধনী ভক্ত নিয়মিত আশ্রমে যাতায়াত করতেন। তাতে এক শ্রেণী লোকের মনে ধারণা হয়ে গেল যে মহর্ষির হাতে আশ্রমের তরফে যথেষ্ট টাকা আছে।

সেদিন মধ্যরাত্রিতে স্বামীজী তাঁর কুটীরে বসে ধ্যানধারণা করছিলেন···চারজন ডাকাত নিঃশব্দে প্রবেশ করে প্রচণ্ডভাবে তাঁকে প্রহার করতে শুরু করে এবং একটা পা একেবারে ভেঙে দেয়···

এদিক ওদিক চারদিক খুঁজে তারা কোথাও টাকা-পয়সা বার করতে পারলো না:··অন্য ঘরে খোঁজবার জন্যে যখন তারা মহর্ষিকে বেঁধে রাখতে যাচ্ছিল, শান্তকণ্ঠে মহর্ষি বললেন, বাকী পা-টাও তোমরা ভেঙে দিয়ে যাও, নিশ্চিন্ত মনে টাকা-পয়সা খোঁজ করতে পারবে।

ইতিমধ্যে একজন শিষ্য ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অন্ধকারে ছুটে শহরে গিয়ে পুলিসকে খবর দেয়। লোকজন নিয়ে পুলিস যখন এলো, দেখে গভীর ধ্যানের মধ্যে মহর্ষি রমণ তন্ময় হয়ে আছেন··· সারা উঠোনময় ডাকাতেরা পায়ের ছাপ ফেলে গিয়েছে কিন্তু মহর্ষির মনে কোথাও এতটুকু ছাপ পড়ে নি···

মহর্ষির বহু জীবন-চরিতে তাঁর আশ্রম-বাসের দৈনন্দিন বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতিদিন রাত তিনটে আর চারটের মধ্যে তিনি শয্যা থেকে

উঠতেন এবং সেই উষাকালেই স্নান শেষ করে তাঁর আসনে গিয়ে বসতেন···ইতিমধ্যে তাঁর আশ্রমিক শিষ্যরা প্রস্তুত হয়ে তাঁর আসনের চারদিক ঘিরে বসতো···কখনো তাঁর নাম স্তব গাইতো কখনো বা তাঁর লেখা ভগবান অরুণাচলের স্তব গাইতো···তার পর প্রত্যেকে নিজের মতন করে কিছুক্ষণ ধরে সাধন-ভজন করতো···এই ভাবে সকাল হয়ে আসতো এবং আশ্রমবাসী প্রত্যেকে এসে মহর্ষিকে প্রণাম জানিয়ে যে-যার নিজের কাজে চলে যেতো···কাজে লিপ্ত হবার আগে প্রাতরাশ হতো, গরম ভাত কিংবা ফ্যানে ভাতে···

তখন মহর্ষি আশ্রমের হলঘরে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসতেন, আশ্রমিক শিষ্যরা নানারকম কাজ শুরু করে দিত···কেউ ফুল সংগ্রহ করে আনতো, কেউ মালা গাঁথতে বসতো, কেউ মহর্ষির জননীর সমাধির কাছে গিয়ে ধ্যানে বসে পড়তো, কেউ কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসতো···মহর্ষি এই সময় যে সব জিনিস লিখতেন, এই সব শিষ্য সেগুলো অন্য ভাষায় অনুবাদ করতো, প্রয়োজন হলে ভাষার সংস্কার করতো···কেউ কেউ রান্নাঘরে গিয়ে দিনের রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তো, আশ্রমবাসীদের জন্যে দৈনন্দিন রান্না করতে হতো···তা ছাড়া প্রতিদিন আশ্রমে যে সব অতিথি আসতেন, তাঁদের জন্যেও খাবারের যোগাড় করে রাখতে হতো। মহর্ষি অনেক সময় এই সব কাজে শিষ্যদের সাহায্য করতেন···শুধু লেখাপড়া ধ্যান-ধারণার কাজে নয়, রান্নাঘরের ব্যাপার নিয়ে কুটনো কুটতেন, কি তরকারি হবে নিজের হাতে তার ব্যবস্থা করে দিতেন। লেখার কাজ যখন কিছু থাকতো না, তখন পুরানো লাঠি বা ছড়িগুলো পালিশ করতেন, ঘটি-বাটি যে সব ফুটো হয়ে যেতো সেগুলো মেরামত করতেন··· থালার ওপর নকশা আঁকতেন···পুরানো পুঁথি থেকে নিজের হাতে বিশিষ্ট সব রচনার পুনর্লিখন করতেন···যে সব পুঁথি ছিঁড়ে যেতো সেগুলো দফতরীর মতন মেরামত করতেন···যে সব চিঠি আসতো, সেগুলো পড়তেন, কেরানীর মতন তার জবাব তৈরি করতেন···

এই ভাবে বেলা এগারোটা-বারোটা বেজে যেতো···দৈনন্দিন দিবা-ভোজ শুরু হতো···খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যেকেই অল্প কিছু সময়ের জন্যে বিশ্রাম করতো···ক্ষণ বিশ্রামান্তে আবার কাজের পালা শুরু হতো···

তিনটে নাগাদ সামান্য কিছু জলযোগের পর, দিনের অতিথিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শুরু হতো···এই ভাবে অপরাহ্নের শেষ আলো নামার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত প্রার্থনা শুরু হতো···তারপর শুরু হতো নৈশ-ভোজ···রাত ন'টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া, দিনের অপরাপর কাজ সব শেষ হয়ে যেতো এবং প্রত্যেকে দিনের কাজ থেকে নিতো বিরতি কিন্তু কখন কখন বিরতি-বিহীন চলতো দিনের কাজ···আশ্রমিকরা সকলে মিলে মহর্ষি-রচিত স্তব সারারাত ধরে গাইতো···

এই সময় আশ্রমিকরা তাঁকে 'ভগবান্' বলে উল্লেখ করতো এবং তিনি নিজেও স্বচ্ছন্দে নিজের সম্বন্ধে এই উক্তিই ব্যবহার করতেন··· নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'আমি' ব্যবহার করতেন না, বলতেন, ভগবান্ রমণ বলছেন। আশ্রমিকরা যে সব স্তব-স্তুতি রচনা করে শোনাত, তাতেও নির্বিচারে 'ভগবান্' বিশেষণই ব্যবহার করা হতো, তিনি নির্বিকার চিত্তে তা স্বীকার করে নিতেন।···

পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টির কাছে এইভাবে ভগবান্-শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত দুর্বিনয়ের লক্ষণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এখানে একটু পুনর্বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, মহর্ষি তাঁর বর্তমান দেহ ও নামরূপকে কোন ব্যক্তি হিসাবে দেখতেন না। এই দেহ শুধু একটা আবরণমাত্র, তলোয়ার নয় তলোয়ারের কোষ মাত্র, এই জীব-জন্মের কর্মভার বহন করা ছাড়া যার আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই···শিষ্যরা যে দেহীর সামনে প্রণত হতো এবং যাঁর স্তব গাইতো তাঁর অহং-এর সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না···তাঁকে উপলক্ষ্য করে তারা স্বয়ং ব্রহ্মেরই সামনে প্রণত হতো, তাঁকে উপলক্ষ্য করে অনাদি ব্রহ্মেরই স্তুতি গাইতো, যে ব্রহ্মের সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে পেরেছিলেন···তাই তাঁর

নামে যে নৈবেদ্য তিনি শুধু নির্বিকার ভাবে বহন করে ব্রহ্মকেই পৌঁছে দিতেন···মাঝখানে রমণ-দেহধারীটি শুধু ভারবাহক মাত্র···

মহর্ষি জীব-জন্তুদের বিশেষভাবে ভালবাসতেন এবং জীব-জন্তুরাও তা সহজে বুঝতে পারতো। ব্রাহ্মণরা কুকুরদের একান্ত অপবিত্র ও তাদের সংসর্গকে অশুচি মনে করেন এবং তাদের ছায়া পর্যন্ত এড়িয়ে চলেন। কিন্তু মহর্ষি তাদের সন্ন্যাস-সাথী মনে করতেন···গত জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে তারা তাঁর নৈকট্যকে পেয়েছে। আশ্রমের পালিত বহু কুকুর ছিল···তাদের দৈহিক শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল···তাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট ও অস্বচ্ছন্দতা হতে দিতেন না···আদর করে তাদের আশ্রমসন্তান বলে ডাকতেন···তাদের ডেকে কথা বলতেন, নানারকমের আদেশ-উপদেশ দিতেন···আশ্চর্যের ব্যাপার তারা সেই সব নির্দেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারতো এবং সুপুত্রের মতন পালন করবার চেষ্টা করতো···

আশ্রমে একটা বাছুর ছিল···আশ্রমের প্রত্যেকেরই অতি প্রিয় ···মহর্ষি তাকে গোবৎস-হিসাবে দেখতেন না। যেদিন প্রথম তিনি এই পাহাড়ে-জঙ্গলে কৃচ্ছ্র সাধন করে বেড়াতেন, সেদিন এক বৃদ্ধা তাঁর জন্যে বনের শাক সংগ্রহ করে রেঁধে খাওয়াতো···মহর্ষির বিশ্বাস, সেই বৃদ্ধা নর-দেহ ত্যাগ করে তার সেবার প্রতিদানের আশায় গো-বৎসের দেহ ধারণ করেছে···তাই মহর্ষি অসীম কৃতজ্ঞতাভরে সেই গো-বৎসকে লালন-পালন করতেন···

আশ্রমের চারদিকে নানা রকমের সাপ ছিল··· মহর্ষির আদেশে কেউ তাদের আঘাত করতে পারতো না···যে সব পাহাড়ের গুহায় গুহায় দিনের পর দিন ধ্যানস্থ থাকতেন, নানা জাতীয় সাপে সে সব গুহা ভরতি ছিল···তারা কোন দিন মহর্ষিকে আঘাত করে নি··· সেই কৃতজ্ঞতায় তিনি বলতেন, তাদের রাজ্যে আমরা জোর করে

আশ্রম পেতে বসেছি, একথা যেন আমরা কখনো না ভুলি…তাদের ঘর-বাড়ি আমরা দখল করে বসেছি, উলটে তাদের আঘাত করবার কোন অধিকার আমাদের নেই…

কাঠবেড়ালীরা মানুষের ত্রিসীমানায় আসে না…কিন্তু তারা নির্বিকারচিত্তে মহর্ষির হাত থেকে খাবার নিয়ে মহর্ষির গা বেয়ে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতো…

অরুণাচল পাহাড় বানরে ভরতি…মহর্ষি তাদের ভাষা আর চিৎকারের অর্থ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারতেন…

এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতো, দু'দল বানরে তুমুল ঝগড়া বেধে যেতো …নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় মহর্ষিকে দেখতে পেয়ে, তারা দু'দলই মীমাংসার জন্যে মহর্ষির কাছে আসতো…দু' পক্ষের কথা শুনে মহর্ষি যে মীমাংসা করে দিতেন, তাই মেনে নিয়ে বানরের দল ক্ষান্ত-বিবাদ চলে যেতো…

এক বা দু'দল বানরের তুমুল ঝগড়ার ফলে এক দলের দলপতি এতদূর আহত হয় যে তার বাঁচবার আর আশা ছিল না…সেই অবস্থায় তার দলের বানরেরা তাকে মহর্ষির কাছে নিয়ে আসে… শেষ অবস্থা বুঝতে পেরে মহর্ষি যথাসাধ্য তার সেবা করেন…মহর্ষি তার মুখে মন্ত্রপূত উদক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মহর্ষির কোলে চির-নিদ্রায় ঢলে পড়ে…আশ্রমে সন্ন্যাসীদের যেভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেওয়া হয় মহর্ষি ঠিক সেইভাবে বানর-দলপতির শেষ-ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন…

মাঝে মাঝে মহর্ষি আশ্রমের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে সমস্ত অরুণাচল পাহাড়টা পরিক্রমা করতেন…দু'ধারে ছায়াভরা গাছ, সারা পথটা দৃষ্টি-মনোহর…কখনও সান্ধ্যভোজের পর বেরিয়ে পড়তেন… সারা পথ পায়ে হেঁটে পরিক্রমা করে আবার উষাকালে আশ্রমে ফিরে আসতেন…কখনও বা উষাকালে বেরিয়ে একদিন কি দু'দিন ঘুরে বেড়াতেন…

সারা পথটার দৈর্ঘ্য মাত্র আট মাইল···ইচ্ছা করলে দু'চার ঘণ্টার মধ্যেই হেঁটে ফিরে আসা যায়···কিন্তু শিব-আশীর্বাদপুষ্ট সেই অরুণাচলের পথে বেরিয়েই সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন এবং সেই অবস্থায় তিনি সারা পথ পরিক্রমণ করতেন···কার্যতঃ তাই মাইলখানেক যেতে না যেতে তাঁদের থামতে হতো···কখনও কখনও গ্রীষ্মের খর রোদে একান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়তেন···তখন দেখা যেতো একদল বানর মহর্ষির দলের সঙ্গে সঙ্গে এসে সামনের বড় বড় কালোজামের গাছের ওপর উঠে গাছের ডাল নাড়া দিয়ে অসংখ্য জাম ফেলে দিয়ে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে যেতো···একটা ফলও নিজেরা কুড়িয়ে খেতো না···সন্ন্যাসীর দল পরমানন্দে সেই কালোজাম খেয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর করতো···

কিন্তু দু'একবার বনবাসী প্রাণীদের কাছ থেকে বিরূপ ব্যবহারও পেতেন···একবার অর্ধবাহ্যদশায় মহর্ষি এক ঝাঁক বোলতার ওপর গিয়ে পড়েন···অনিচ্ছাকৃত মহর্ষির এই অপরাধ তারা ক্ষমা করতে পারলো না···আশে-পাশের সমস্ত গাছ থেকে দলে দলে বোলতা তাঁকে আক্রমণ করলো এবং একটা উরুর ওপর সকলে মিলে দংশন করতে লাগলো···

ম্লান হেসে মহর্ষি উরুটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, এই পা-টাই অপরাধী ···এর শাস্তি পাওয়া দরকার! একটা বোলতাকেও তিনি হাত দিয়ে সরাবার চেষ্টা করলেন না···নিজেও এক-পা নড়লেন না—নিঃশব্দে সেই প্রচণ্ড নির্যাতন নিজের কর্মফল বিধায় সহ্য করলেন···

ক্রমশঃ মহর্ষি বৃদ্ধ হয়ে এলেন···অধিকাংশ সময়ই নীরব হয়ে থাকতেন···

তবু দেশ-দেশান্তর থেকে নানা জাতের, নানা ধর্মের লোক দুঃখহর তাঁর আশীর্বাদের জন্যে আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন···

মুখ ফুটে তিনি অনেকের সঙ্গে বাচনিক আলাপ করতেন না কারণ অধিকাংশ সময়ই তিনি ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতেন…কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের দেহে-মনে এক বিচিত্র স্পন্দন জেগে উঠতো …সমস্ত ব্যথা-বেদনা যেন মলিন বস্ত্রের মতন ঝরে পড়ে যেতো…এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ ও শান্তিতে তাঁদের চিত্ত ভরে উঠতো…

কেউ কেউ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এক দিব্যজ্যোতির মণ্ডল দেখতে পেতো…তিনি যখন মুগ্ধ দর্শকদের কাছ থেকে এই সব কথা শুনতেন, অবান্তর তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করতেন…

কেউ কেউ প্রশ্ন করতেন…অবান্তর প্রশ্ন হলে তিনি কোন জবাব দিতেন না…যখন বুঝতেন প্রশ্নের সঙ্গে প্রশ্নকর্তার অন্তরের সত্যি-কারের হাহাকার জড়িয়ে আছে, কল্যাণ-উপদেশে তখন প্রশ্নকর্তার অন্তরের অন্ধকার বিমোচন করতেন…এমন কি যে সব প্রশ্ন অনুচ্চারিত থাকতো, তারও যথাযথ উত্তর দিতেন…যেন প্রশ্নকর্তার দিকে চেয়ে তিনি তার সমগ্র মনটিকে দেখতে পেতেন…

প্রায়ই তাঁর কাছে লোক আসতো, সংসারে তারা বীতরাগ, তাই মহর্ষির শিষ্যরূপে আশ্রমে যোগদান করতে ইচ্ছুক…

কিন্তু মহর্ষি যখন জানতেন যে সংসারের দায়িত্ব ত্যাগ করে তারা আশ্রমে থাকতে চায়…স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের দায় এড়াতে চায়…তিনি তাদের আশ্রমে স্থান দিতেন না…সংসারে থেকে সংসারের দায়িত্ব পালন করতেই উপদেশ দিতেন…

একবার মহাত্মা গান্ধী তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে একজন দূতকে পাঠান। দেখাশোনার পর ভদ্রলোক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করেন, ফিরে গিয়ে গান্ধীজীকে তিনি কি বলবেন ? মহর্ষি উত্তরে বলেন, হৃদয় যেখানে হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলতে চায়, সেখানে কোন বার্তা বা কোন বাণীর প্রয়োজন আছে কি ?

তখন মহর্ষির সত্তর বছর বয়স···দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাতে ভুগছিলেন···বহুদিন গুহায় গুহায় নিশ্চল বসে থাকার দরুন এই ব্যাধি বার্ধক্যে তাঁকে পেয়ে বসে। এই সময় হঠাৎ চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে এলো। ১৯৪৮-এর শেষের দিকে দেখা গেল যে তাঁর বাঁ হাতের কনুই-এর ওপর একটা জায়গায় ফোড়ার মতন ফুলে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা···ভক্ত শিষ্যরা ডাক্তার নিয়ে এলেন ···মহর্ষি বাধা দিলেন, যা স্বাভাবিক ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, তার জন্যে এত দুর্ভাবনা কিসের ?

অবশেষে শিষ্যদের অনুরোধে তিনি অপারেশন করাতে রাজী হলেন। কিন্তু অপারেশন শুকোতে না শুকোতে আগেকার টিউমারের পাশে আর একটা টিউমার দেখা দিল···আবার অপারেশন করা হলো। এবার মহর্ষি আর ডাক্তারি করাতে রাজী হলেন না··· যে শালপাতায় মানুষ খায়, খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সে এঁটো শাল-পাতার কিসের এত দরদ ?

দৈহিক যন্ত্রণার কারণ তীব্রতর হয়ে উঠলো···শিষ্যদের ডেকে বললেন, এই দেহের বাঁধন থেকে যে জানে সে আশু মুক্তি পাবে, তার তো আনন্দ করাই উচিত···প্রভুর কাজ নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন করে আজ সে ছুটি পাবে, ভৃত্য তার নিজের ঘরে ফিরে যাবে···এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি আছে ?

মহর্ষির একাত্তর জন্মদিনে অরুণাচলের মন্দিরের হাতি এসে নত হয়ে শুঁড় দিয়ে মহর্ষির পায়ে শেষ প্রণাম রেখে গেল। এরপর থেকে মহর্ষি চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন···

কনজেস্‌শন অফ লাংস-এ শয্যাশায়ী হলেন···শিষ্যরা ডাক্তার আনবার জন্যে মহর্ষিকে মিনতি জানালো কিন্তু এবার আর তিনি রাজী হলেন না···

একদিন সান্ধ্য-ভজনার পর তিনি শিষ্যদের আদেশ করলেন, কেউ যেন আর তাঁর ঘরে না আসে ! তিনি একা থাকতে চান !

প্রভাতে আবার উপাসনার আসর বসলো কিন্তু স্বাভাবিক চেষ্টায় বসবার আর কোন ক্ষমতা ছিল না…তাঁর অনুরোধে শিষ্যরা তাঁকে ধ্যানের আসনে বসিয়ে দিল…চারদিক থেকে উঠলো ভগবান অরুণাচলের স্তব…তাঁরই রচনা…

মহর্ষির দু'চোখ দিয়ে আনন্দ-অশ্রু গড়িয়ে পড়ে…সেই তাঁর শেষ উপাসনার আসর…

সেই সন্ধ্যায় সজ্ঞানে তিনি মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেন…

অনেকে দেখলেন একটা জ্যোতিষ্মান উল্কা অরুণাচলের চূড়া স্পর্শ করে মিলিয়ে গেল…

সমাপ্ত

দেব সাহিত্য কুটীর